ধর্ম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা কিনা-একটি সমীক্ষা

মোছাঃ গুলশান আরা বেগম

Dhaka University Library
499280
499280 GIFT

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অভিসন্দর্ভ

উৎসর্গ

মা ও বাবাকে

তহুরা বেগম ও মোঃ আব্দুল গফুর সরকার

যাদের অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদে এ গবেষণাকর্ম

439280

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি সানন্দে প্রত্যয়ন করছি যে, ধর্ম রাজনৈতিক উন্নয়নে বাধা কিনা-একটি সমীক্ষা এ শিরোনামের অভিসন্দর্ভটি মোছাঃ গুলশান আরা বেগম এর একক ও নিজস্ব গবেষণার ফলশ্রুতি।

আমি আরও প্রত্যয়ন করছি যে, এ অভিসন্দর্ভটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি তত্ত্বাবধান করেছি এবং আদ্যোপান্ত পড়েছি। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য জমা দেয়ার সুপারিশ করছি।

৪৭৭২৪০

অধ্যাপক ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এ গবেষণা কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হওয়ার জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ আমার শিক্ষক, এ গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক "অধ্যাপক ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীনের প্রতি। তিনি তার কর্মব্যস্ত সময়ের মধ্যেও এ গবেষণার কাজের মূল বিষয়বস্তুর জন্য যেমন, তেমনি সুক্ষ্ম বিষয়গুলোতে একটি নির্দিষ্ট মানদন্ডে পৌছানোর ব্যাপারে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমার প্রয়াত শিক্ষক এ গবেষণা কর্মের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. ইউ এ.বি. রাজিয়া আকতার বানুর প্রতি। রাজনৈতিক ও আর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামের সম্পৃক্ততা বিষয়ে দীর্ঘ কর্ম-অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তার সক্রিয় তত্ত্বাবধান এ গবেষণাকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছে।

আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ড. রফিকুল ইসলামের প্রতি তিনি প্রতিনিয়ত এই গবেষণা সম্পৃক্ত সকল বিষয়ে আমাকে সর্বোতভাবে সহায়তা করেছেন। থিসিস রচনার মৌলিক নিয়ম অনুসরণ এবং তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন যা আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমার শিক্ষক ড. শওকত আরা হোসেনের প্রতি তার স্নেহাস্পদ আর্শীবাদ এবং তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে লাইব্রেরী ব্যবহারের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ আমাকে অত্যন্ত উপকৃত করেছে।

কর্মজীবনের পাশাপাশি এ গবেষণা কাজ সম্পাদনে সহায়তা জন্য আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার কর্মস্থল সিদ্ধেশ্বরী গালর্স কলেজ কর্তৃপক্ষকে এবং আমার সহকর্মীদের, বিশেষ করে সহযোগী অধ্যাপক মনিরা বেগম, প্রভাষক ফাহিমার প্রতি যারা আমাকে তথ্য সংগ্রহ ও কম্পিউটার সংক্রান্ত কাজে সকল ধরনের সহযোগীতা প্রদান করেছেন। আমার একান্ত ধন্যবাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন ফর উইমেন, বি.আই.আই.টি কর্তৃপক্ষকে-এ গবেষণার অধিকাংশ মৌলিক গ্রন্থ এবং তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য।

ধন্যবাদ একাধারে আমার স্বামী এবং বন্ধু গোলজার রহমান-কে যার আন্তরিক আগ্রহ আমাকে উৎসাহিত করেছে সব সময়। তিনি ছিলেন এ গবেষণা কাজে আমার নিত্যসঙ্গি এবং আমার সকল কাজের একান্ত উৎসাহদাতা।

সর্বশেষ গভীর কৃতজ্ঞতা আমার পরিবারের প্রতি। বাবা, মা ও আমার শিশু সন্তানদের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত যাদের উৎসাহ আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে-বড় ভাই ও ভাবী, মেঝ ভাই ও ভাবী, ছোট ভাই ও ভাবী, চাচা-চাচীদের আগ্রহ ছিল বড় অনুপ্রেরণা।

ফেব্রুয়ারী ২০১৪
মোছাঃ গুলশান আরা বেগম

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ও চিত্র তালিকা

চিত্র ২.১ ইসলামী উন্নয়নের উপাদানসমূহ

সারণী ২.২ ৩০টি মুসলিম দেশের আর্থসামাজিক সংক্ষিপ্তসার সুষ্ঠু প্রশাসন ও সুস্থ সমাজ গঠনের মৌল নীতিমালা

সারণী ২.৩ ৩০টি মুসলিম দেশের আর্থসামাজিক সংক্ষিপ্তসার মৌলিক নির্দেশক

সারণী ২.৪ ৩০টি মুসলিম দেশের আর্থসামাজিক সংক্ষিপ্তসার উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি (১৯৮০-৮৮)

সারণী ২.৫ ৩০টি মুসলিম দেশের আর্থসামাজিক সংক্ষিপ্তসার উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি (১৯৮৬-৮৮)

সারণী ২.৬ ৩০টি মুসলিম দেশের আর্থসামাজিক সংক্ষিপ্তসার পণ্য দ্রব্যের ব্যবসা

সারণী ২.৭ ৩০টি মুসলিম দেশের আর্থসামাজিক সংক্ষিপ্তসার গৃহীত উন্নয়ন অনুদান এবং বহিঃঋণ

সারণী ২.৮ ৩০টি মুসলিম দেশের আর্থসামাজিক সংক্ষিপ্তসার কেন্দ্রীয় সরকারের খরচ

সারণী ৬.১ ইসলামী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি

সারণী ৬.২ মানুষের জীবন বিকাশের পর্যায়ক্রম

সারণী ৬.৩ ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার ভূমিকা

সারণী ৬.৪ বিশ্বের জাতিসমূহের তুলনায় মুসলমানদের শিক্ষার হার

সারণী ৬.৫ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বের অপরাপর জাতিসমূহের তুলনায় মুসলমানদের অবস্থান চিত্র।

সারণী ৭.১ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সচিবালয় ও সম্মানিত সচিবগণ

সারণী ৭.২ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা : জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত নির্বাহী বিভাগ

সারণী ৭.৩ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা : পরোক্ষভাবে নির্বাচিত নির্বাহী বিভাগ

সারণী ৭.৪ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা

চিত্র ৭.৫ ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি আদর্শ মডেল চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

UNO	=	United Nations Organization
OIC	=	Organization of Islamic Conference
IBRD	=	International Bank for Reconstruction and Development
IMF	=	International Monetary Fund
USA	=	United States of America
UK	=	United Kingdom
BIIT	=	Bangladesh Institute of Islamic Thought
EU	=	European Union
EEC	=	European Economic Community
WB	=	World Bank
GATT	=	General Agreement on Tariff and Trade.
WTO	=	World Trade Organization
ILO	=	International Labour Organization
FAO	=	Food and Agricultural Organization
UNIDO	=	United Nations Industrial Development organization
UNESCO	=	United Nations Education Science and Children Organization.
IIIT	=	International Institute of Islamic Thought
IBID	=	Ibidem
OP.CIT	=	Open cito

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

এই গবেষণায় মূলত: ধর্ম, উন্নয়ন, রাজনৈতিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ইসলামের উন্নয়ন এবং ধর্ম উন্নয়নে বাধা কিনা তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ধর্ম বলতে বিশেষভাবে ইসলাম ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তবে অন্যান্য ধর্মকেও মূল্যায়ন করা হয়েছে। ইসলামকে অধিক গুরুত্ব দেয়ার কারণ হচ্ছে ইসলাম এমন এক জীবন ব্যবস্থা যা মানব জাতির তথা মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছে এবং এ সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা ও সমাধান দিয়েছে।

ইসলাম অর্থ শান্তি ও আত্মসমর্পণ। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত আদম (আ.) এবং এর পরিপূর্ণতাদানকারী হলেন মুহাম্মদ (সা.) যিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রসূল (সা.) ।

মধ্যযুগে ইউরোপ বা পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের বাড়াবাড়ি ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করতে বাধ্য করে। তারা ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি মেনে চলে অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে। এর প্রভাব পড়ে অন্যান্য মহাদেশের দেশগুলোতে এমনকি এক সময়ে ইসলামী সোনালী অতীতের অধিকারী তুরস্কে এর প্রভাব পড়ে। শুরু হয় ইসলামী শাসনের পরিবর্তে ধর্ম নিরপেক্ষ মুসলিম শাসন। পরবর্তী সময়ে অধিকাংশ মুসলিম দেশ অমুসলিমদের কলোনীতে পরিণত হয় এবং অর্থনীতিও ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম থেকে পৃথক হয়ে যায়–এর প্রকাশ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে পৃথিবী ব্যাপী মুসলিম দেশসমূহে প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকিং সিষ্টেম থেকে। অথচ আল-কুরআনে সুদকে হারাম আর ব্যবসাকে হালাল করা হয়েছে। সুদ সম্পদ বৃদ্ধি করে না। সুদ হচ্ছে Money for money আর যাকাত সম্পদ বৃদ্ধি করে যার প্রমাণ পবিত্র আল-কুরআন, হাদীস ও ইসলামী ব্যক্তিত্বদের ইজতিহাদমূলক (গবেষণা) সাহিত্যকর্মে পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানব জাতির জন্য অতীব জরুরী বিষয়। কিন্তু এগুলিই মানব জীবনের জন্য সব নয়। মানব জীবনের সংশ্লিষ্ট সকল দিকের উন্নয়নই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যে বিষয়টির প্রতি ইসলাম গুরুত্ব দেয় তা হল নৈতিক উন্নয়ন। নৈতিক উন্নয়ন যদি সম্ভব হয় তবে পৃথিবীতে এত অশান্তি থাকতে পারে না। মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হল জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। নৈতিক উন্নয়ন ছাড়া শান্তি সম্ভব নয় যদিও অর্থনৈতিক প্রাচুর্য পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পরিণামে সবকিছু ব্যর্থ হতে বাধ্য।

রাজনৈতিক উন্নয়নকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে উল্লেখ করে লুসিয়ান ডব্লিউ পাই রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে বেশ কিছু সংজ্ঞা বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনীতি বিশেষজ্ঞ রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে তাদের সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কেও বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। বিশেষ করে নবীন রাষ্ট্রগুলিতে সরকারসমূহ অর্থনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নকে তাদের প্রধান দায়িত্ব বলে গণ্য করেন। এক্ষেত্রে তারা যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেন তা হল জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি প্রভৃতি।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে আধুনিক কিংবা Traditional রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ এবং ক্লাসিক্যাল কিংবা নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের ধারণার সাথে ইসলামের কিছু মিল থাকলেও অনেক বিষয়ে অমিল রয়েছে।

ইসলামী কাঠামোতে উন্নয়ন প্রচেষ্টা পরিচালিত হয় আল্লাহ্ সচেতন মানুষ তৈরির লক্ষ্যে যারা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, মানবজাতির প্রতি সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে কাজ করতে সমর্থ, ইনসাফপূর্ণ সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং অন্যদের বঞ্চিত বা অন্যের অধিকার হরণ না করে মানুষ ও সমাজের প্রকৃত প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। ইসলামী কাঠামোতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল মানুষকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করানো ও সকল দিকে মানবীয় সর্বোচ্চ কল্যাণ পরিচালনার মাধ্যমে গন্তব্যবিমূখী ও মূল্যবোধ কেন্দ্রিক কার্যক্রম।

ইসলাম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা নয় বরং অন্যতম সহায়ক হিসেবে কাজ করে। আর ইসলামের উন্নয়নই হল প্রকৃত উন্নয়ন। ইসলাম সব কিছুকে বিবেচনা করে সামগ্রিক কল্যাণের ভিত্তিতে মুষ্টিমেয় কল্যাণের ভিত্তিতে নয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠানম্বর
প্রত্যয়ন পত্র	i
উৎসর্গ	ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iii
সারণী ও চিত্র তালিকা	iv
শব্দ সংক্ষেপ	v
সারসংক্ষেপ	vi

প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা

১.১	গবেষণার বিষয়বস্তু	২
১.২	গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি	৩
১.৩	গবেষণা প্রতিপাদ্য	৪
১.৪	গবেষণা পদ্ধতি	৪
১.৫	প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা	৭
১.৬	অধ্যায় পরিকল্পনা	১০

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ধর্ম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ

২.১ ইসলাম ধর্ম	১৪
২.২ ইসলাম ও বাংলাদেশ	১৭
২.৩ উন্নয়ন	১৯
২.৪ রাজনৈতিক উন্নয়ন	২১
২.৫ অর্থনৈতিক উন্নয়ন	২৭
২.৬ উন্নয়নের ইসলামী ধারণা	৩১
২.৬.১ ইসলামী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য	৩৮
২.৭ উন্নয়নের ইসলামিক কলাকৌশল	৪০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ঃ পুঁজিবাদী, সমাজতন্ত্রী ও ইসলামী অর্থব্যবস্থা

৩.১ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ৬৩

৩.২ পুঁজিবাদে ধনী দারিদ্রের বৈষম্য ৬৬

৩.২.১ পুঁজিবাদের বর্তমান অবস্থা ৬৭

৩.৩ সমাজ তন্ত্র ৬৯

৩.৪ সমাজতন্ত্রের সমস্যা ও বর্তমান অবস্থা ৭১

৩.৫ ইসলামী অর্থব্যবস্থা ৭৩

৩.৬ ইসলামী অর্থব্যবস্থার রূপরেখা ৭৫

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাতের ভূমিকা

৪.১ যাকাত কী? ৮২

৪.২ যাকাত দাতা ৮৩

৪.৩ যাকাত ব্যয়ের খাত ৮৬

৪.৪ যাকাত দান ও গ্রহণ সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ৮৭

৪.৫ সামাজিক নিরাপত্তায় যাকাত ৯০

৪.৬ শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধিতে যাকাত ৯৬

৪.৬.১ বাংলাদেশে যাকাত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন ৯৭

পঞ্চম অধ্যায় ঃ নারী ও উন্নয়ন

৫.১ বিভিন্ন সভ্যতায় নারী ১০৩

৫.২ বিভিন্ন ধর্মে নারী ১০৬

৫.৩ নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন ঃ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের আলোকে ১০৬

৫.৪ ইসলামে নারী ১১২

৫.৫ ইসলামী অর্থনীতি ও রাজনীতিতে নারী স্বাধীনতা এবং নারী উন্নয়নে বাধা নয় বরং সহায়ক প্রমাণে ইসলাম ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমস্যা এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

৬.১ বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক সঙ্কট, অস্থিরতা ও সহিংসতা ১৬১

৬.২ বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক সঙ্কট ও নিরাপত্তাহীনতা ১৬৬

৬.৩ সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ১৭৫

৬.৪ তথ্য সন্ত্রাস ও এর মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক প্রয়াস ১৭৫

সপ্তম অধ্যায় ঃ সমস্যা সমাধানে ইসলাম - প্রেক্ষিত মদীনা সনদ, মদীনা রাষ্ট্র ও খলিফাদের শাসনামল

৭.১ বর্তমান সমস্যার প্রকৃতি ১৭৯

৭.২ মদীনা সনদের পটভূমি ও প্রকৃতি ১৮৬

৭.৩ মদীনা সনদে তৎকালীন সমস্যার সমাধান ও বর্তমান প্রেক্ষিত ১৮৮

৭.৪ মদীনা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃতি ১৮৯

৭.৫ খিলাফত - ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা ১৯৪

৭.৬ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা ১৯৬

৭.৭ ইসলামে রাজনৈতিক উন্নয়নের তাত্ত্বিক নির্দেশাবলী প্রসঙ্গত হযরত আলীর চিঠি ১৯৮

৭.৮ বর্তমান বিশ্ব সমস্যা সমাধানে মদীনা সনদ ২০০

অষ্টম অধ্যায় ঃ

উপসংহার ২০৮

পরিশিষ্ট ২১১

তথ্যপঞ্জী ২২৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা

১.১ গবেষণার বিষয়বস্তু

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

১.৩ গবেষণা প্রতিপাদ্য

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

১.৫ প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

১.৬ অধ্যায় পরিকল্পনা

Dhaka University Institutional Repository

১.১ গবেষণার বিষয়বস্তু

উন্নয়ন একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয়। কিংবা বলা যায়, উন্নয়ন এমনই একটি বিষয় যা সামগ্রিকতার ধারণা দেয়। উন্নয়নে অংশগ্রহণ, উন্নয়নে অবদান এবং উন্নয়নের ফলে প্রাপ্তি প্রতিটি বিষয়ই উন্নয়ন ধারণার অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। উন্নয়ন অর্থ একদিকে যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের উন্নয়ন, তেমনি মানুষের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বস্তুগত সম্পদের এবং শারীরিক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশসহ সামগ্রিক উন্নয়ন।[১]

উন্নয়নের পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হচ্ছে রাজনৈতিক শক্তি। উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কতৃর্ত্বের ভূমিকার কথা সুস্পষ্টভাবে বলা আছে ডেভিড ইষ্টনের সিষ্টেম তত্ত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যায়। তার মতে, যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল কাজ হচ্ছে "সমাজে উপযোগ বা জীবন ধারণের মূল্যবান উপকরণগুলোর প্রভূত্বব্যাঞ্জক বরাদ্দ"। অন্য কথায়, রাজনৈতিক ব্যবস্থাই সমাজে অবশ্য পালনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আর তা কার্যকর করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার এ মূল কাজই এই ব্যবস্থাকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে এবং অন্যান্য ব্যবস্থা থেকে তাকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। উপযোগ হলো জাগতিক সম্পদ এবং বরাদ্দ হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থার গৃহীত ঐসব সিদ্ধান্ত অথবা কার্যকলাপ যা মূল্যবান উপযোগের বিতরণ করে অথবা অস্বীকার করে।

এই উপযোগ বরাদ্দের সঙ্গে উন্নয়নের ঘনিষ্ট সম্পর্ক বর্তমান। উন্নয়ন যেহেতু একটি সামগ্রিক প্রত্যয় তাই উন্নয়ন বলতে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থার অগ্রসরতা বোঝায় তেমনি উন্নয়ন পরিমাপের আরেকটি মাপকাঠি হলো সার্বিক মানব উন্নয়ন। এ মানব উন্নয়নের নির্দিষ্ট অর্থ হলো ধনী-দরিদ্রের সমতা ভিত্তিক উন্নয়ন। অর্থাৎ উন্নয়নের পূর্নাঙ্গ মাত্রা অর্জনের জন্য ধনী-নির্ধন, নারী পুরুষ সকলের সমতা ভিত্তিক উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় এ বক্তব্যে "উত্তর ও দক্ষিণ উভয়ের জন্য এখন আমাদের প্রয়োজন আরেকটি উন্নয়ন। নারীদের স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে তাদের পূর্ণ প্রতিনিধিত্বের সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। শুধুমাত্র তখনই উন্নয়ন কেবল অর্থনৈতিক বিষয় (Economic term) হিসেবে বিবেচ্য হবে না, বরং মানবিক বিষয় হিসেবে বিবেচ্য হবে।"[৪] এ মত আরো স্পষ্ট হয় এ বক্তব্যে "চলমান অর্থনৈতিক রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় যেখানে সম্পদ, ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ জনগণের এক ক্ষুদ্র অংশের জন্য সংরক্ষিত সেখানে নারীর জন্য সাম্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। কিন্তু বৃহত্তর ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা এবং নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়।"[৫] বর্তমান বিশ্ব ন্যায়পরায়নতাকে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করছে। তবে এক্ষেত্রে তারা নৈতিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। অথচ নৈতিক উন্নয়ন ব্যতীত ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।[৬] মানব জীবনের জন্য উন্নয়ন অপরিহার্য- তা রাজনৈতিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা অন্য যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন। বিশ্বের এক অংশের জনগোষ্ঠীর হাতে অর্থের পাহাড় জমা। অপর পক্ষে অপর অংশের জনগোষ্ঠীর দু'বেলা দু'মুঠো খাবার যোগাড় করতে প্রাণান্তকর শ্রম দেয়া প্রকৃত উন্নয়নের লক্ষণ নয়। আর একারণেই উন্নয়ন হতে

Dhaka University Institutional Repository

হবে সমতাভিত্তিক। এ ধরনের উন্নয়ন ইসলামের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। কারণ ইসলাম মানব জাতির জন্য এমন এক শাশ্বত জীবন বিধান উপহার দিয়েছে যেখানে মানব জাতির উন্নয়নের সকল দিকই দিক নির্দেশনা পাবে। একমাত্র ইসলামই পারে মানব জাতির জন্য ন্যায়ভিত্তিক সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে।

ইসলাম একটি শাশ্বত জীবন বিধান হিসেবে মানব জীবনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ই আলোচনা করে। এখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, এর সাথে নারীর সংশ্লিষ্টতা অর্থাৎ নারী উন্নয়নে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারে কিংবা ইসলাম নারীর উন্নয়নে কতটুকু ভূমিকা পালন করছে সবই উল্লেখ আছে। যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এবং যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি চালু রাখার মধ্যদিয়ে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র মদীনা রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার উদাহরণ ইসলামের গ্রহণ যোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া রাজনৈতিক ব্যবস্থা সর্ম্পকেও সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। যার মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বের কাঙ্খিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন সম্ভব। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের অনুসরণে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হবে না। এর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করাই এ গবেষণার মূল বিষয়।

১.২ গর্বেষনার উদ্দেশ্য ও পরিধি

- **গবেষণার উদ্দেশ্য**

গবেষণায় ইসলাম ধর্ম এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এ দুটো বিষয়ের সম্পৃক্তিকে কেন্দ্র করে আলোচনা করা হয়েছে। ইতোপূর্বে গবেষণার বিষয় বস্তু আলোচনায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন সবার অংশ গ্রহণ ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুষম ও ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়ন বিষয়টিতে জোর দেয়া হয়েছে। ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য নৈতিক উন্নয়নকে পূর্বশর্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নৈতিক উন্নয়ন এর ক্ষেত্রে ধর্ম ভিত্তিক জীবন অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম সঠিক ভাবে অনুসরণের উপর জোর দেয়া হয়েছে। গবেষণার অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছানের জন্য তাই শুরুতেই গবেষণার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য স্থির করা একান্ত প্রয়োজন। উন্নয়ন যেহেতু বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যাপক এবং রাজনীতি ও অর্থনীতি যেহেতু উন্নয়নের অভীষ্টতা অর্জনের অন্যতম নির্ধারক শক্তি তাই উভয়ের পারস্পারিক সম্পর্কের বিষয়টিকে বিবেচনা করে গবেষণার মূল উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছে। সে সাথে ইসলাম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা এ গবেষণার উদ্দেশ্য। বর্তমান বিশ্বে যে উন্নয়ন হচ্ছে তাকে যথার্থ উন্নয়ন বলা যায় কি না? বর্তমান ব্যবস্থায় উন্নয়ন সুষম হচ্ছে কি না? এসব এ গবেষণার আওতায় পড়বে। যাহোক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য নিম্নোক্তভাবে স্থির করা যায়-

i) ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ব্যাখ্যা।

ii) ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা ও বিশ্লেষণ

iv) প্রচলিত অর্থে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

v) ইসলামে উন্নয়নের ধারণা বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

vi) প্রকৃত ইসলামী নিয়মনীতি অনুসারে সফল রাষ্ট্রের প্রকৃতি তুলে ধরে বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রকৃত উন্নয়ন লাভের সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করা।

- **গবেষণার পরিধি**

গবেষণার উদ্দেশ্য আলোচনায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং এক্ষেত্রে ইসলামে উন্নয়ন ধারণার উপর জোর দেয়া হয়েছে। যেহেতু উন্নয়ন, রাজনীতি, অর্থনীতি এক একটি ব্যাপক বিষয় তাই গবেষণার পরিধি এসব দিকে খেয়াল রেখেই করা হয়েছে। সেসাথে ইসলামও শাশ্বত জীবন বিধান হিসেবে আরো ব্যাপক বিষয়। তাই গবেষণার পরিধি এসব দিক লক্ষ্য করেই স্থির করা হয়েছে।

১.৩ গবেষণা প্রতিপাদ্য

গবেষণা শিরোণাম "ধর্ম রাজনৈতিক ও অথনৈতিক উন্নয়নে বাধা কিনা একটি সমীক্ষা"-এর মাধ্যমে একটি বৃহৎ পরিধিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে । ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ের সম্পৃক্ততা এবং এসব বিষয়ে ইসলামের অনুসরণের বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়কে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। উন্নয়নে ইসলামের অনুসরণের বিষয়টিকে দেখা হয়েছে এভাবে,

প্রথমঃ উন্নয়ন মানব জীবনের জন্য জরুরী বিষয়, দ্বিতীয়তঃ বিশ্বে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উন্নয়ন মডেলের অবক্ষয়ে ইসলামের উন্নয়ন মডেলের প্রাসঙ্গিতা কতটুকু? বর্তমান বিশ্বে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য যেহারে বাড়ছে তাতে ইসলামের সঠিক অনুসরণই পারে এ অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে। কারণ ইসলামী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঠিক অনুসরণের মাধ্যমে ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র মদীনা রাষ্ট্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিদর্শন হয়ে আছে। এছাড়া খেলাফতের শাসন বিশেষ করে চার খলীফার (হযরত আবু বকর (রাঃ) হতে হযরত আলী (রাঃ)) শাসনও এক্ষেত্রে প্রকৃত উদাহরণ হয়ে আছে। ইসলামের সোনালী যুগের রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিলে এর গ্রহণযোগ্যতা পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

যে কোন বিষয়ে বিশ্লেষণ ও সংযুক্তি ঘটানোর ক্ষেত্রে নিয়মানুগ পথে অগ্রসর হতে হয়। ভিত্তিহীন বক্তব্য নয়, বরং সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব ও পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। এই গবেষণার ক্ষেত্রে সিস্টেম পদ্ধতি অনুসরণ করে অগ্রসর হবার চেষ্টা করা হয়েছে। সিস্টেম তত্ত্বের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কোন ব্যবস্থার সামগ্রিক পর্যালোচনা। আনাতোল র‍্যাপপোর্ট বলেছেন, একটি সমগ্র ব্যবস্থা যখন বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর ভিত্তি করে কার্যকর থাকে তখন তাই হয় সিস্টেম। এই গবেষণার মূল বক্তব্য এখানে গ্রথিত আছে। রাজনীতি ও উন্নয়ন প্রত্যয় দুটি পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। সিষ্টেম তত্ত্ব সম্পর্কে আরেকটু দৃকপাত করা হচ্ছে গবেষণার সঙ্গে সম্পৃক্তি স্পষ্ট করার জন্য। এ শতাব্দীর পাঁচ দশকে সিষ্টেম তত্ত্বের সমধিক অগ্রগতি সাধিত হয়। এর অগ্রগতির সাথে জড়িত আছেন কাল ডয়েচ, মরটন ক্যাপলার, রিচার্ড রোজক্রান্স, হার্বার্ট স্পিরো,

Dhaka University Institutional Repository

ওরান ইয়ং, লাভউইগ, বার্টা ল্যানকি, গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড, রশ অ্যাশবি প্রমুখ গবেষক। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নাম ডেভিড ইষ্টন। তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করেছেন পূর্ণাঙ্গরূপে। ডেভিড ইষ্টনের মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে, 'লক্ষ্য স্থির করার, নিজেকে রূপান্তরিত করার এবং পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার সৃজনমূলক ক্ষমতাসম্পন্ন এক ব্যবস্থা।

প্রত্যেক সিস্টেমের থাকে কিছু ইনপুট ও কিছু আউটপুট। ইনপুট সিস্টেমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ও সিস্টেমকে প্রভাবিত করে। আউটপুট সিস্টেম থেকে বের হয় ও পরিবেশকে প্রভাবিত করে। সিষ্টেমের তিনটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে

(এক) সিষ্টেম হচ্ছে বিশেষ কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ, নির্বাচন ও সংগঠন করবার এক তত্ত্বগত কাঠামো,

(দুই) পারস্পরিক সর্ম্পকের ভিত্তিতে সংগঠিত করার এক সামগ্রিক ব্যবস্থা, (তিন) বিভিন্ন উপাদান বা অংশ পরস্পরকে প্রভাবিত করে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় রত। নিয়ত পরিবর্তনশীল পরিবেশে কিভাবে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা টিকে থাকে তার বিশ্লেষণই সিস্টেম তত্ত্বের মূল লক্ষ্য।

জটিল রাজনৈতিক জীবন সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকারণ বিশ্লেষণ করতে হবে সমাজের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, শিক্ষার হার তথা সামাজিক জীবনের প্রেক্ষিতে। আর এ ক্ষেত্রেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে গবেষণায় সিষ্টেম তত্ত্বের কার্যকারিতা।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে চলার দক্ষতাসম্পন্ন। পরিবেশে কোন পরিবর্তন সূচীত হলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন সূচীত হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার জন্য যে সব পরিবর্তন পরিবেশ থেকে সূচীত হয় ইষ্টনের মতে তাই হলো ইনপুট। আবার রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার আউটপুট কার্যাবলীর মাধ্যমেও পরিবেশকে প্রভাবিত করে। পরিবেশ থেকে কোন সংকট উপস্থিত হলে রাজনৈতিক ব্যবস্থা কাঠামো ও কার্যপদ্ধতিতে পরিবর্তন আনয়ন করে সে সংকটের মোকাবেলা করে। এসব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন সূচিত হতে পারে এবং পূর্বের ভারসাম্যেও পরিবর্তন আসতে পারে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার আউটপুট হচ্ছে ঐ সকল সিদ্ধান্ত কার্যকলাপ যা সমাজে উপযোগ বরাদ্দের ক্ষেত্রে গৃহীত হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার ইনপুট ও আউটপুটের মধ্যে সমতা বিধান হলে সে ব্যবস্থা স্থায়ীত্ব লাভ করে।

রাজনৈতিক পদ্ধতির কোন কোন সদস্য নীতি, বিধিবিধান এবং সরকার কর্তৃক বলবৎকৃত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রভাব তথা রাজনৈতিক প্রভাবের অধিকারী হতে চায়। এই রাজনৈতিক প্রভাব সরকারের উপর জণগণের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ একজনের লক্ষ্য বা মূল্যমান বৃদ্ধির এত পরিচিত উপায় যে, এমন কোন রাজনৈতিক পদ্ধতি বা ব্যবস্থার কল্পনাই করা যায় না যে ব্যবস্থায় কেউ ক্ষমতা চায়না।

জনগণ যে প্রভাব প্রয়োগ করে তার পরিমাণগত পার্থক্য সাধারণত সরাসরি তিনটি মৌলিক ব্যাখ্যামূলক কারণে হয় বলে ধরা যেতে পারে:

Dhaka University Institutional Repository

১. রাজনৈতিক সম্পদ বন্টনে পার্থক্য। রাজনৈতিক সম্পদ এমন এক জিনিস যা দিয়ে একজন লোক অন্য ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে। এ কারণে টাকা, তথ্য, খাদ্য, শক্তি প্রয়োগের ভয়, চাকরি, বন্ধুত্ব, সামাজিক অবস্থান, আইন প্রণয়নের অধিকার, ভোট এবং আরও অনেক ধরণের জিনিস রাজনৈতিক সম্পদ হিসাবে গণ্য।

২. জনগণ তাদের রাজনৈতিক সম্পদগুলি যে নৈপূণ্য বা দক্ষতায় কাজে লাগায় সেই দক্ষতা ও নৈপূণ্যের তারতম্য। আবার মেধা, সুযোগ-সুবিধা এবং রাজনৈতিক দক্ষতার শিক্ষা ও অনুশীলনের প্রেরণা থেকেও রাজনৈতিক দক্ষতার তারতম্য হয়ে থাকে।

৩. জনগণ যে পরিসরে তাদের সম্পদ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়ে থাকে সেই পরিসরের তারতম্য। এ তারতম্য বা পার্থক্যগুলির কারণ তাদের প্রেষণার পার্থক্যে নিহিত। এই প্রেষণার তারতম্য আবার উদ্ভূত হয় সুযোগ-সুবিধা ও অভিজ্ঞতার পার্থক্যের কারণে।[১২]

আর এ কারনেই উন্নয়নে সকল মানব সম্পদের ঘনিষ্ট সম্পৃক্ততার প্রয়োজন জোরালোভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ এই সম্পৃক্ততার বিষয়কে সহায়তা করবে। অন্যান্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে বিশেষ করে নারীর অংশগ্রহণ সঠিক মাত্রায় নিশ্চিত করতে পারেনি আধুনিক যুগে এসেও; সেখানে আজ হতে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই ইসলাম নারীর সেসব মর্যাদা দিয়েছে। যেমন–অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রভৃতি যা নারী ও উন্নয়ন অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। গবেষণায় সিস্টেম তত্ত্বকে সামনে রেখে ইসলাম ধর্ম এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন'র প্রেক্ষিত বিশ্লেষণপূর্বক উভয়ের সম্পৃক্তি তুলে ধরে প্রকল্পের যথার্থতা যাচায়ের চেষ্টা করা হয়েছে ।

এ প্রচেষ্টাকে বাস্তবায়নের জন্য মূলত: বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার আলোকে উন্নয়ন ও রাজনীতি'র অতীত প্রেক্ষাপটসহ ধারাবাহিক পর্যায়ক্রম অনুসরণ করে তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। উন্নয়ন ও রাজনীতি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এবং বাংলাদেশে যে সকল কাজ হয়েছে তার আলোকে বিভিন্ন গ্রন্থ, গবেষণাপত্র, বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং জাতিসংঘ প্রকাশিত বিভিন্ন বার্ষিক প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উন্নয়ন ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্যের তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রে স্বীকৃত বিভিন্ন উপাত্তের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃত চিত্র বের করে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। বিগত সময়ের এ সংক্রান্ত কাজের ধারাবাহিকতা হিসাবে নতুন কিছু সংযোজন এবং পূর্ণাঙ্গতা প্রদানের ব্যাপারে মনযোগ দেয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে গবেষণা প্রকল্পের যথার্থতা প্রমাণ যুক্তিযুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

তথ্য অনুসন্ধান

এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য মূলতঃ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এমন সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ে ইতোমধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থ, জার্ণাল, বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রতিবেদন,

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, গবেষণা পত্র এবং অন্যান্য উৎস হতে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে বিভিন্ন পাঠাগার/লাইব্রেরী ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতে হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

১. উইমেন ফর উইমেন

২. বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বি.আই.ডি.এস)

৩. স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট

৪. সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৫. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

৬. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি.আই. আই. টি)।

এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীর সাহায্য নেয়া হয়েছে তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাম্প্রতিক গবেষণা অনুসন্ধান এবং বিভিন্ন ডাটাভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ওয়েবসাইটের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

১.৫ প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

গবেষণা কাজ সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য প্রকাশিত তথ্যসূত্র, প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ ও অন্যান্য রচনা পাঠের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

উন্নয়ন ও ইসলামঃ ধারণা বিশ্লেষণ

বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

উন্নয়ন একটি ব্যাপক বিষয়। ইসলাম এবং উন্নয়ন বিষয়টি আরও ব্যাপক ধারণা। আন্তর্জাতিক পরিসরে এ বিষয়ে অনেক কাজ হয়েছে ইতোমধ্যে এগুলো থেকে ইসলাম ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দিক নির্দেশক প্রকাশনা সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে একটি ধারাবাহিক চিত্র পাওয়া যায়। প্রথমে উন্নয়ন ধারণার স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন। রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে L. W. Pye এর Aspects of Political Development বইটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এখানে রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। রাজনীতির বহুমুখী চরিত্রের কারণে রাজনৈতিক উন্নয়নকে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি রাজনৈতিক উন্নয়নকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। G.A. Almond এর অনুপ্রেরনায় গঠিত *Committee on Comparative Politic of the special science Research Council* রাজনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে অবদান রেখেছে। W.W Rostow, ও A.F.K Organiski রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে G.M. Meir and Boldwin এর *Economic Development, Theory" History Policy', Dudley Seers, The meaning of Development' International Review*, বই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

নোবেলবিজয়ী অর্থনীতিবিদ Gunner Myrdal এর Asian Dram: An Inquiry into the poverty of Nations Abridged উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা ব্যাখ্যা করেছে। সমাজ ব্যবস্থার অনুন্নত অবস্থা সৃষ্টি কারী বহু সংখ্যক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণকে উন্নয়ন বলে উল্লেখ করেছেন। Prof. Khurshid Ahmad তার Islamic Approach to Development- গ্রন্থে উন্নয়ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যেখানে তিনি বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বের উন্নয়নের জন্য পাশ্চাত্য মডেল অপেক্ষা দেশজ মডেল এবং ইসলামী পদ্ধতি অনুসরণের উপর জোর দিয়েছেন। Dr. M. Umer Chapra র "Islam and the Economic Development" এবং Islam and the Economic Challenges" বই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বইটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে মুসলিম দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য মোকাবেলা করে কিভাবে ভারসাম্য পূর্ণ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যায় তার দিক নির্দেশনা দিয়েছে।

বিশ্বের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী যে উন্নয়নে ভূমিকা পালন করতে পারে সে সম্পর্কে Dr. Zakir Naik এর Women's Rights in Islam গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ড. জামাল আল বাদাবীর ইসলামী শিক্ষা সিরিজ গ্রন্থটি ইসলামের বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছে যা থেকে ইসলামের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়।

American Journal of Islamic Social Sciences এবং International Institute of Islamic Thought' এর বিভিন্ন সংখ্যায় ইসলামের সঠিক নীতিমালা প্রকাশিত হয়েছে। অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর লিখিত অনেক আর্টিকেল হতে উন্নয়ন সংক্রান্ত ধারণা পরিষ্কার বোঝা যায়।

Dr. Muhammad Al-Buracy এর Administrative Development an Islamic Perspective বইটি রাজনৈতিক উন্নয়ন এ ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তারিত তুলে ধরেছে। এখানে মুসলিম শাসনামলের উদাহরণ তুলে ধরে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে ইসলামের সফলতার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

ড. আব্দুল হামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান রচিত ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ বইটি সংঘাতময় বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। এক্ষেত্রে নবী যুগের ইতিহাস হতে মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক বিরোধ নিরসনে সহিংসতা বর্জন করে নৈতিকতার অনুসরণে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আবদুল হালীম আবু শুককাহ রচিত রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা বইটি রাজনীতি ও অর্থনীতিতে নারীর সফল অংশ গ্রহণের ইতিহাস তুলে ধরে, যা থেকে প্রতীয়মান হয় ইসলাম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা নয় বরং সহায়ক। John Exposito রচিত, Islam and politics গ্রন্থটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইলামের দিক নির্দেশনা তুলে ধরেছে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন রকম সমস্যা, বিশেষ করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার উত্তরণের উপায় সম্পর্কে ইসলামী সমাধান উথাপিত হয়েছে উপরোক্ত প্রকাশনাগুলোতে। আধুনিক কালের অন্যান্য ব্যবস্থার পাশাপাশি ইসলামী ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক ভিত্তিক জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে এসব বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে উল্লিখিত সকল গ্রন্থ ও প্রকাশনায়। এই গবেষণায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে রচিত বিভিন্ন রচনা থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য যে সকল গ্রন্থাদি ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও অধিক তথ্য সমৃদ্ধ প্রকাশনা সম্পর্কে এখানে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

উন্নয়ন ও ইসলাম ধারণা বিশ্লেষণ ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত:

উন্নয়ন ও ইসলাম ধারার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গেলে রাষ্ট্র, সরকার, বে-সরকারী সংগঠন সকল দিক থেকে জানার প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশ প্রথম থেকে ধর্ম নিরপক্ষেতার নীতি গ্রহণ করে। পরবর্তীতে ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে সংবিধানে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস মূলনীতিটি গৃহীত হয়। তারপরও বাংলাদেশে রাষ্টীয়ভাবে ইসলামী নীতিমালার সঠিক আনুসরণ হয়নি। তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে না হলেও বে সরকারী উদ্দগ্যে অনেক প্রকাশনা ও সাহিত্য কাজ করছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সাহিত্যিকদের লেখনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশে ইনস্টিটিউট অব ইলামিক থ্যট যা সংক্ষেপে বি.আই.আই.টি (B.I.I.T) নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠানটি এ ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ এবং অনূদিত গ্রন্থে ইসলামের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস উল্লেখ করে সেসময়ের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। যার উৎস ছিল ইসলামের মুল উৎস আল-কুরআন ও আল হাদীস এবং এসবের আলোকে তাদের গবেষণামূলক সিদ্ধান্ত। প্রফেসর আবদুন নূর তাঁর 'লোক- প্রশাসন, সংগঠন প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা' গ্রন্থে মাহানবী (সা.)-এর প্রশাসন ব্যবস্থার সুস্পস্ট ব্যাখ্যা দান করেন যা থেকে সুন্দর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।

প্রফেসর ড. ইউ.এ. বি. রাজিয়া আকতার বানু সম্পাদিত Bangladesh Journal of Islamic Thought এ প্রকাশিত Articles ও Book Reviews এক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছে। প্রকৌশলী হালিমা আল-হামরা লিখিত 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলাম' নিবন্ধটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা এবং নারী উন্নয়নে ইসলামের ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করেছে। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা প্রকাশিত ড. ইউ. এ. বি রাজিয়া আকতার বানু লিখিত' সংবিধানে ও ধর্মে বাংলাদেশে মুসলিম নারীর অধিকার ও মর্যাদা একটি পর্যালোচনা' নিবন্ধটি নারী উন্নয়ন বিষয়ে ইসলামের অবদান তুলে ধরেছে যা এই গবেষণায় অনেক ভূমিকা পালন করেছে। মুহাম্মদ কুতুব লিখিত 'ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম B.I.I.T প্রকাশিত মুহাম্মদ আবদুল আজিজ সম্পাদিত 'সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম' বই টির বিভিন্ন নিবন্ধ হতে এই

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সাহায্য নেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ধর্মের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ ও অন্যান্য রচনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

উপরোক্ত প্রকাশনাসমূহের পাশাপাশি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে কাজ করেছে বিভিন্ন বিশ্ব প্রতিবেদন। উন্নয়নের পূর্নাঙ্গমাত্রা নির্ধারণ ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের পারস্পরিক সম্পূরকতাকে যৌক্তিক ভাবে উপস্থাপন ও যথার্থতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে Human Development Report 1999 বিশেষ ভাবে ভূমিকা রেখেছে। বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন, বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯০ মুসলিম দেশগুলোর উন্নয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য দিয়েছে। যদিও গবেষণায় প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন রচনাবলীর সাহায্য নিতে হয়েছে, তবু এই আলোচনায় সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশনা সমূহের উল্লেখ করা হয়েছে।

১.৬ অধ্যায় পরিকল্পনা

সম্পূর্ণ গবেষণা চিন্তাকে রূপায়িত করার জন্য বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের সুবিধার্থে মোট আটটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: মূলত গবেষণার *পরিচিতিমূলক* অধ্যায়ে। *রাজনৈতিক* ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীতা এবং উন্নয়নে ধর্ম বাধা নাকি সাহায়ক বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম উন্নয়নে কিভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে, সে বিষয়টি পর্যালোচনা করাই এ গবেষণা কর্মের লক্ষ্য। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার যৌক্তিকতা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: মূলত ধারণা বিশ্লেষণ মূলক অধ্যায়। যে কোন বিষয়ে গভীর ও বিস্তৃত ধারণা লাভের জন্য নির্দিষ্ট প্রত্যয় সমূহের সুস্পষ্ট ও ব্যাপক আলোচনা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে ঐতিহাসিক চিন্তা এবং তত্ত্বগত ধারা বিশ্লেষণ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এ উভয় ক্ষেত্রে ইসলামরে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে যথার্থ মতাদর্শিক ব্যাখ্যা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: মূলত প্রচলিত অর্থব্যবস্থা অর্থাৎ পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন দিক এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের সাথে এর কল্যাণমূলক দিকের পর্যালোচনামূলক অধ্যায়। এখানে বিভিন্ন অর্থনীতির আলোচনা শেষে ইসলামী অর্থব্যবস্থার সফলতা তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: ইসলামী অর্থনীতির সবচেয়ে আলোচিত বিষয় যাকাত ব্যবস্থা এবং এটি কিভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পারে তার প্রমাণমূলক। এখানে যাকাত ব্যবস্থা অনুসরণ করে কিভাবে হযরত (সঃ) অর্থনৈতিক সফলতার বাস্তব প্রমাণ স্থাপন করেছিলেন এবং এ সফলতা অন্যান্য যেমন রাজনৈতিক, সামাজিক সকল ক্ষেত্রেই সফলতার নিদর্শন স্থাপন করেছিল তা দেখানো হয়েছে। তাছাড়া পরবর্তীতে খলিফাদের আমলেও কিভাবে যাকাত ব্যবস্থা অর্থনৈতিক সফলতার নজীর স্থাপন করেছিল তা

Dhaka University Institutional Repository

দেখানো হয়েছে। আরো আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে বাংলাদেশে একমাত্র যাকাত ব্যবস্থার সুষ্ঠু বাস্তবায়নই পারে অর্থনীতি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে সমস্যা দূর করতে।

পঞ্চম অধ্যায়: বিশ্বের অর্ধেক জনগোষ্ঠী অর্থাৎ নারী উন্নয়ন বিষয় পর্যালোচনামূলক। এক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে কতটুকু অধিকার দিয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে তা আলোচনা করা হয়েছে। আরো দেখানো হয়েছে নারীর উন্নয়নে ইসলামে গৃহীত পদক্ষেপ যার উল্লেখ কুরআন ও হাদীসে রয়েছে। অন্যান্য সভ্যতা ও ধর্মে নারীর অবস্থান ও ইসলামে নারীর অবস্থান ব্যাখ্যা করে এটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে, ইসলাম ধর্ম নারীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা নয় বরং সহায়ক।

ষষ্ঠ অধ্যায়: বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা যেমন- রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে সমস্যার কারণ সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিশেষকরে বাংলাদেশে বর্তমানে কেমন সমস্যা রয়েছে তা তুলে ধরে এর প্রকৃত কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে হারে উন্নত হয়েছে সে হারে মানুষের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ঘটেনি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন বিশ্বকে মানুষের হাতের মুঠোয় এনেছে। কতিপয় মানুষের জীবন যাপন প্রাণালী অনেক উন্নত হয়েছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। সেই সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন মানব সমাজের জন্য দুর্ভাগ্যও বয়ে এনেছে। ইসলাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিরোধীতা করেনা। বরং কুরআন বিজ্ঞানের উপর অনেক বেশিই জোর দিয়েছে। কিন্তু মানুষের নৈতিক উন্নয়নের অভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষময় ফল মানব সমাজ বিশেষ করে যুব সমাজ ভোগ করছে। উন্নত বিশ্বর জন্য আশীর্বাদ হিসেবে খ্যাত বিশ্বায়ন উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য কুফল বয়ে এনেছে। এসব বিষয় নিয়েই এই অধ্যায় আলোচনা করেছে।

সপ্তম অধ্যায়: বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম আন্তর্জাতিক সনদ বা মদীনা সনদ সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। মদীনা সনদের কতিপয় ধারা উল্লেখ এবং এর মাধ্যমে তৎকালীন সমস্যা সংকুল আরবের বুকে শান্তিময় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। খেলাফতের শাসন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত (সা.)-এর মদীনা রাষ্ট্র এবং চার খলিফার শাসনকালের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে। ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের অনুশাসন উন্নয়নে বাধা নয় বরং সহায়ক। প্রশাসনিক উন্নয়নের বিভিন্ন প্রামান্য চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলামী প্রশাসনের বিভিন্ন দলিল ও পান্ডুলিপি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেগুলো রাজনৈতিক উন্নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সে সময়ের সফলতা তুলে ধরা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়: হচ্ছে সর্বশেষ অধ্যায়। এটি মূল গবেষণার পরিসমাপ্তির অংশ। ইতোপূর্বে আলোচিত বিভিন্ন অধ্যায়ের প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ সাপেক্ষে গবেষণার প্রতিপাদ্যের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করে দেখানো হয়েছে এ অধ্যায়ের আলোচনায়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামের সঠিক অনুসরণের ব্যাপ্তির সম্প্রসারণ

Dhaka University Institutional Repository

ঘটিয়ে ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার যথাযথ অনুসরণের বিষয়ে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের যে প্রচেষ্টা এই গবেষণায় করা হয়েছে তার মূল বক্তব্য সংগ্রথিত করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। সবশেষে, বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নে ইসলামের সঠিক অনুসরণের জন্য কতিপয় সুপারিশ সন্নিবেশিত হয়েছে।

উপসংহারে এসে বলা যায়, প্রথম অধ্যায় ছিল গবেষণা কাজের পরিচিতি মূলক আলোচনা গবেষণার বিষয়বস্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলাম ধর্ম বাধা নয় বরং সহায়ক এ বিষয় নিয়ে এ গবেষণা এগিয়েছে। বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অসম অগ্রগতি এবং ভবিষ্যতে ইসলামের সোনালী অতীতের অনুসরণে উন্নয়নে অগ্রসরতা অর্জনের পথ প্রশস্ত হতে পারে- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গবেষণা কাজ অগ্রসর হয়েছে এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্য নির্দেশিকা

১. Hilkka Pietila and Jeanne Vickers, *Making Women Matter the Role of the United Nations*, United Nations.

২. আহমেদ, এমাজ উদ্দীন, *তুলনামূলক রাজনীতি ঃ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ*, বাংলাদেশ যুব কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৯১৯, এ- লেখক কর্তৃক অনূদিত। (মূল রচনাঃ David Easton, *A Framework for Political Analysis*, Hill. 1965.)

৩. আহমেদ, এমাজ উদ্দিন, *তুলনামূলক রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

৪. DAWN Report, *Women and the new international economic order*, NGO Conference, 1982

৫. Hika Pietila and Jeanne Vickers, op. cit.,

৬. চাপরা, ড. উমর, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন* বি.আই.আই.টি. ঢাকা, ২০০০

৭. আহমেদ, এমাজ উদ্দিন, *তুলনামূলক রাজনীতিঃ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

৮. আহমেদ, এমাজ উদ্দিন, পূর্বোক্ত এ- লেখক কর্তৃক অনূদিত মূল রচনাঃ David Easton, op.cit., p.92)

৯. আহম্মেদ, এমাজ উদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৩৬

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০

১১. রবার্ট এ ডাল রচিত ও মঈনউদ্দীন আহমেদ অনূদিত রাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩। (মূল রচনাঃ হ্যারল্ড) ডি. লাসওয়েল ও আব্রাহাম ক্যাপলান, *পাওয়ার অ্যান্ড সোসাইটি*, নিউ হাভেন, ইয়েল ইউনিভারসিটি প্রেস, ১৯৫০)

১২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্ম, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ

২.১ ইসলাম ধর্ম

২.২ ইসলাম ও বাংলাদেশ

২.৩ উন্নয়ন

২.৪ রাজনৈতিক উন্নয়ন

২.৫ অর্থনৈতিক উন্নয়ন

২.৬ উন্নয়নের ইসলামী ধারণা

২.৬.১ ইসলামী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য

২.৭ উন্নয়নের ইসলামিক কলাকৌশল

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা কিনা এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উন্নয়নকে রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে নিয়েই নবীন রাষ্ট্রগুলোর যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু উন্নয়ন লাভ সঠিকভাবে সম্ভব হচ্ছে না। উন্নয়ন সম্পর্কে ভুল ধারণার কারণেই এমনটি হচ্ছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আলাদাভাবে না দেখে ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বিকভাবে বিচেনা করতে পারলে সমাধান সম্ভব হতে পারে বলে আশা করা যায়। এজন্য ইসলামের উন্নয়ন ধারণা ও উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রয়োজন।

ইসলাম শুধু ধর্ম সর্বস্ব বিষয় নয়। এখানে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা মুখ্য বিষয়। এই শান্তি (১) নিজের সাথে শান্তি স্থাপন (২) সকল সৃষ্টির সাথে শান্তি স্থাপন এবং (৩) সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্‌র সাথে শান্তি স্থাপনের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়।

ইসলাম তথাকথিত উন্নয়নকে নয় বরং প্রকৃত উন্নয়নকে উৎসাহিত করে। কখনও বাধার সৃষ্টি করে না। মানুষ স্বভাবতই শান্তিপ্রিয় সৃষ্টি। কিন্তু শয়তানের কুপ্ররোচনায় শান্তি অন্বেষণে ভুল পথে চলে। ফলে শান্তি অর্জিত না হয়ে অশান্তি অর্জিত হয়। ইসলাম মানব জাতির জন্য সহজ সরল পথের ব্যবস্থা রেখেছে। আবার পৃথিবীতে বন্ধুর ও বাঁকা পথ আছে। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের মধ্যে মানুষ ও জিনকে স্বাধীনতা দিয়েছে আল্লাহ্ এভাবে– যে কেউ ভাল পথে চলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে আবার বিপরীতে চলে আল্লাহ্‌র রোষানলেও পড়তে পারে। Isiah Berlin মানুষের দুই ধরণের স্বাধীনতার কথা বলেছেন-

১. Positive Freedom.
২. Negative Freedom.[১]

আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু ইসলাম সব ধরণের আয় ও ব্যয়কে সমর্থন করে না। মদ তৈরি করে আয় করাকে ইসলাম যেমন সমর্থন করে না, তেমনি নিজের আয়কে মদ খেয়ে জুয়া খেলে নষ্ট করাকেও ইসলাম সমর্থন করে না। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে নৈতিক দিক বিবেচনায় রাখাকে ইসলাম সমর্থন করে।

২.১ ইসলাম ধর্ম

গবেষণার বিষয় ধর্ম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা কিনা হলেও এখানে ধর্ম বলতে সকল ধর্মকে না বুঝিয়ে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে এবং ইসলাম ধর্ম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা কিনা সে বিষয়ে সুস্পষ্ট আলোচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এক্ষেত্রে সর্ব প্রথম ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিতে চাই।

ইসলাম ধর্ম বলা হলেও এটি শধু একটি ধর্মই নয় বরং পরিপূর্ণ জীবন বিধান। দুনিয়ায় যত ধর্ম বিধাতার নিকট থেকে এসেছে সবই ছিল ইসলাম এবং এর অনুসারীরা ছিল মুসলিম অর্থাৎ সবার দীন ছিল একই কিন্তু শরীয়াত ভিন্ন। পরবর্তীতে নবী রসূলদের অনুসারীরা দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন এনে নতুন নতুন নাম ধারণ করে। যেমন-ঈসা (আঃ) এর অনুসারীরা খ্রিস্টান, মুসা (আঃ) এর অনুসারীরা ইহুদি নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীতে তাওরাত, ইনজীল প্রভৃতি আসমানী কিতাবে উল্লিখিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ও রসুল

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর পৃথিবীতে আগমন ঘটে আল্লাহ মনোনীত জীবন বিধান ইসলামের পরিপূর্ণতা দানকারী হিসেবে।[২]

ইসলাম শব্দটির অর্থ: আরবী ভাষায় ইসলাম বলতে বুঝায় আনুগত্য ও বাধ্যতা। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও তাঁর বাধ্যতা স্বীকার করে নেয়া এ ধর্মের লক্ষ্য বলেই এর নাম হয়েছে ইসলাম।[৩] আনুগত্য অর্থ আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেওয়া, গ্রহণ করতে সম্মত হওয়া। আর বাধ্যতা অর্থ আল্লাহর নির্দেশ কাজে কর্মে চর্চা করা। আল্লাহর নিকট আনুগত্য ও বাধ্যতা শান্তি বয়ে আনে। আর এ কারণে ইসলাম অর্থ শান্তি।[৪] আবার, ইসলাম গ্রহণকারী নিজের সাথে, প্রতিবেশীর সাথে এবং সর্বোপরি মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করে বিধায় ইসলাম অর্থ শান্তি। যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগত হয়, আল্লাহকে নিজের মালিক, প্রভু ও মাবুদ হিসেবে মেনে নেয়, নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দেয় এবং দুনিয়ার আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে সে-ই মুসলিম।[৫] এ আকীদা বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতির নাম 'ইসলাম' মানবজাতির সৃষ্টিলগ্ন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে যেসব নবী এসেছেন এটিই ছিল তাদের সবার দীন ও জীবন বিধান ।

ধর্ম হিসেবে ইসলাম পরিপূর্ণভাবেই , আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার করে বলে একে ইসলাম বলা হয়। ইসলাম শব্দটি 'সিলমুন' শব্দ হতে এসেছে যার অর্থ আত্মসমর্পন, aslama amrahu ila Allah' অর্থ 'he commitied his cause to Allah' or he resigned himself to the will of Allah'[৬] পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, ইবরাহীমকে তো আমি দুনিয়ায় নিজের জন্য নির্বাচিত করেছিলাম আর আখেরাতে, সে সৎকর্মশীলদের মধ্যে গণ্য হবে। তার অবস্থা এই ছিল যে, যখন তার রব তাকে বললো, *"মুসলিম হয়ে যাও"* তখনই যে বলে উঠল, *"আমি বিশ্ব-জাহানের প্রভুর মুসলিম'* হয়ে গেলাম।" ঐ একই পথে চলার জন্য সে তার সন্তানদের উপদেশ দিয়েছিল এবং এরি উপদেশ দিয়েছিল ইয়াকুবও তার সন্তানদেরকে। সে বলেছিল, "আমার সন্তানেরা আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দীনটিই পছন্দ করেছেন। কাজেই আমৃত্যু তোমরা মুসলিম থেকো"[৭] আল্লাহর আনুগত্য ও বাধ্যতার মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃত অর্থে শারীরিক ও মানসিক শান্তি লাভ করতে পারে। এরকম বাধ্যতার জীবন অন্তরের শান্তি আনে এবং বৃহত্তর অর্থে সমাজে শান্তি আনয়ন করে।[৮] এ কারণে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, সত্যিকার মুসলিম সেই যার জিহবা ও হাত হতে অন্যান্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।[৯]

ইসলামের ঐতিহাসকি পটভূমি

যুগযুগ ধরে ইসলামের মৌলিক মতবাদ একই রয়েছে। মহান আল্লাহ পৃথিবীতে মানব জাতির পথ নিদের্শনার জন্য শত শত নবী-রসূল পাঠিয়েছিলেন যাঁদের মৌলিক মতবাদসমূহের মধ্যে লক্ষনীয় সাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল।[১০] মানব জাতির জন্য সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহম্মদ (সাঃ)। পূর্বের নবী রাসূলদের নিকট মহান আল্লাহর নিকট হতে যেসব বাণী আসত তার সাথে হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর নিকট প্রেরিত বাণীর যোগসূত্র

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে যা কুরআন হাদীসের বাণী থেকে পরিষ্কার জানা যায়। হযরত মুহম্মদ (সাঃ) অনেক বাণীর মধ্যে নিম্নোক্ত বাণী সমূহ এ বিষয়ের সাথে মিল রয়েছে।

হযরত মুহম্মদ (সাঃ) বলেন যে, তাঁর দৃষ্টান্ত সুন্দর একটি গৃহের একটি ইটের সাথে তুলনীয় যা ছাড়া গৃহটি পরিপূর্ণ হচ্ছিল না।

আদম (আঃ) থেকে হযরত মুহম্মদ (সাঃ) পযর্ন্ত সকল নবী-রসূল ইসলামকে একমাত্র সত্য ধর্ম বলে ঘোষণা করেছেন। একজন মুসলিমের উচিত সকল নবী রসূলদের বিশ্বাস করা এবং একজনের সাথে অপরজনের পার্থক্য না করা।[১১]

ইসলাম : একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান

'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন পথ। এটা সমগ্র মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ প্রদত্ত। এটি মানুষের সারা জীবনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা পূরণ করে। ইসলাম আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য, আমাদের শেষ গন্তব্য... এবং অন্যান্য সৃষ্ট জীবের মধ্যে আমাদেরও স্থান সম্পর্কে বলে। এটি আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং আত্মিক সম্পর্কে পথ নির্দেশ দেয়। 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' কুরআনের শব্দ। কুরআন বলে, "ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন, তিনি (আল্লাহ্) তোমাদেরকে মুসলিম নাম প্রদান করলেন পূর্বেও আর এখনও।"[১২]

হযরত আদম (আঃ) হতে হযরত মুহম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রসূল এবং বার্তা বাহকের বার্তা একই। তারা অন্য কাউকে নয় বরং আল্লাহকে মান্য করতে বলেছেন। নবী রসূলদের মাধ্যমে প্রেরিত বার্তা হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর নবুওতীর সময়ে শেষ হয়। অর্থাৎ শেষ নবীর সময়ে ইসলাম পূর্ণতা লাভ করে যা কুরআন এর ভাষা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। কুরআন বলছে "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন কে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছি এবং তোমাদের জন্য ইসলাম কে তোমাদের দীন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছি।[১৩]

ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়; পরিপূর্ণ জীবন বিধান। আর একারণে পবিত্র কুরআন 'ইসলামকে' কে 'আল দীন' হিসেবে ঘোষণা করেছে, যার অর্থ আনুগত্য বা বিশ্বস্ততা। 'ইসলাম' হলো মানব জীবনের সকল দিককে নিয়ে এক ব্যাপক ভিত্তিক শাশ্বত নির্দেশনা। ইসলামের নবী এমন একটি ধর্মীয়-সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে কুরআনের আইন বাস্তবায়িত হয়েছিল ।[১৪] আল কুরআন আরো বলে;

"আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য দীন অন্বেষণ করে তা কখনও কবুল হবে না, আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" (৩:৮৫) সুতরাং সকল মানুষের প্রয়োজন ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পুর্ন লাইফ স্টাইল পরিচালিত করা, এমন কি যারা মুসলিম নামে পরিচিত তারাও। সর্বশক্তিমান আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করো (ইসলাম ধর্মের সকল বিধি নিয়ম পালনের মাধ্যমে) এবং শয়তানের অনুগামী হয়ো না, কেননা সে তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন ।"[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ও মুসলিম সর্ম্পকে ডঃ জামাল আল বাদাবী বলেন,

"ইসলাম শব্দের দুটি অর্থ আছে। সালাম অর্থ শান্তি এবং এর আর একটি অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পণ ইসলামের অর্থ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে তার নির্দেশ মান্য করার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন। ইসলাম এমন এক বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত শব্দ যা তার অর্থের ব্যাপকতার স্থান, কাল ও পাত্রকে অতিক্রম করে । সমাজ ও ব্যষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহতে আত্মসমর্পণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই মুসলমান। ব্যাপক অর্থে এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ এবং সকল নবীদের উপর ঈমান আনা এবং তাদের মাধ্যমে প্রদত্ত বিধানের আলোকে জীবন পরিচালিত করা।"[১৬] কুরআন থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান। সব নবী-রসূলই এই জীবন বিধান প্রচার করেছেন এবং পালন করেছেন। পবিত্র কুরআন এর বাণী *"ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন"(৩:১৯)* "হে আমাদের রব। আমাদের দুজনকে তোমার মুসলিম (নির্দেশের অনুগত) বানিয়া দাও। আমাদের বংশ থেকে এমন একটি জাতি সৃষ্টি করো যে হবে তোমার মুসলিম।"(২:১২৮)

সুতরাং ইসলাম ধর্ম শুধু একটি ধর্মই নয় বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যার অনুসারী মুসলিম নামে পরিচিত যা আল্লাহ প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, আল কুরআন ও হাদীসে রসূল থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায়।

২.২ ইসলাম ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম মুসলিম দেশ যদিও ইসলামী দেশ নয়। কারণ মুসলিম শাসনকে ইসলামী শাসন বলা যায় না।[১৭] আব্বাসীয়, উমাইয়া, ফাতিমি. গজনবী, সুলতানী এবং মুঘল রাজত্ব মুসলিম শাসন ছিল না। তারা ইসলাম অনুসরণ করতেন, তবে পুরোপুরি নয়। অপরপক্ষে নির্বাচিত চার খলিফা যারা কড়াকড়ি ইসলামের আনুগত্য করতেন তাদের শাসন ছিল সত্যিকার ইসলামী শাসন।[১৮] বাংলাদেশও অনুরূপ অর্থে ইসলামী নয় বরং মুসলিম দেশ।

যাহোক পৃথিবীর সকল দেশের মতো বাংলাদেশেরও রয়েছে একটি বিবর্তনের ইতিহাস। তা যেমন বর্ণাঢ্য তেমনি আকর্ষণীয় । প্রাচীন এই ভূখণ্ড ছিল পৌত্তলিক ধর্মাচরণে লালিত এবং পরিচালিত। ফলে পুরোহিততন্ত্র ও রাজতন্ত্রের জাঁতাকলে সাধারণ মানুষ শোষন ও বঞ্চিত হয়ে আসছিল যুগ যুগ ধরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী। ধর্মের নামে, দেবতার নামে এখানে পৌত্তলিক ধর্ম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল- যার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল মানুষ শোষণ করা. অন্যকে পদানত করা। পরবর্তীতে বৌদ্ধ ধর্মের কিছুটা উদার মানবিকতাও পুরাতন হিন্দু ধর্মের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। সূফী দরবেশ এবং মুসলিম বিজেতাদের আগমন সেক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটায় এবং বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ইসলামের মানবিক ও সাম্যের বাণী গণমানুষের জীবনে এক নতুন সম্ভাবনার সূচনা করে। ইতিহাসের বাক বদল হয়। পৌত্তলিক আবহে আবর্তিত আদি জনগোষ্ঠীর জীবনে তা মুক্তি ও সৌভাগ্যের পরশ বুলিয়ে দেয়।[১৯] তারা তৌহিদের অনুপম ধর্ম ইসলামের ছায়ায় শান্তি খুঁজে পায়। ইসলামের আলোয় আলোকিত একটি সংঘবদ্ধ জনপদ এই ভূখন্ডে ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে । তারই ধারবাহিকতায় আজকের এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক ইসলাম বাংলাদেশ

সপ্তম শতকের প্রথম দিকে বিশ্ব মানবতার কল্যাণকামী শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) আরবে ইসলামের চিরন্তন সত্য বাণী প্রচার করেছিলেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ প্রদত্ত সত্য, সুন্দর, সুষ্ঠু ও সংস্কার মুক্ত জীবন বিধান ও সমাজ ব্যবস্থার শেষ শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠাতা। সমগ্র বিশ্ব মানবতাকে অন্ধকার অজ্ঞানতা ও পংকিলতা থেকে মুক্ত করা ছিল তার দায়িত্ব। কাজেই তার পরবর্তীকালে তাঁর সুশিক্ষিত সাহাবারা ইসলামের সত্য জীবন বিধান ও সমাজ ব্যবস্থা বাণী নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পরেছিলেন। এ সময় আরবরা ব্যবসা বাণিজ্যেও উন্নত ছিল। তাদের বানিজ্য বহর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যতায়াত করত। মুসলিম বণিকদের সাহায্যে সপ্তম শতকের প্রথম দিকেই ভারতের পশ্চিম উপকুলে মালাবারে (বর্তমানে কেরালা) ইসলাম প্রচার শুরু হয়। সেখানকার হিন্দু রাজা চেরুমল পেরুমল ইচ্ছা পূর্ব সিংহাসন ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার অভিলাষে মক্কা গমন করেন।[২০] শায়খ জয়নুদ্দীন তাঁর "তুহফাতুল মুজাহিদীন ফী আহওয়ালীল বারতাবালীন" গ্রন্থে এ রাজার শেষ নবী (সাঃ)সমীপে উপস্থিত হয়ে সেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের কথা বণর্না করেছেন। এ সময় মালাবারের বহুসংখ্যক হিন্দুও ইসলাম গ্রহণ করে।

আরব বণিকদের জাহাজ ভারতের পশ্চিম উপকুল পার হয়ে চীন দেশে যাবার পথে বঙ্গপোসাগর অতিক্রম করত। কাজেই বাংলার উপকুলে তাদের আনাগোনা হতো। এসময় (সপ্তম ও অষ্টম) বঙ্গপোসাগর জাহাজ চলাচল ও সামুদ্রিক বাণিজ্য কেন্দ্রহুল ছিল। বাংলার উপকুলে তাম্রলিপ্তি (বর্তমানে তামলুগ) ও শৎগঙ্গ (বর্তমানে চট্টগ্রাম) ছিল প্রধান বন্দর।[২১] দক্ষিণ উপকূল পথে এসময় ইসলামের সত্য বাণী বাংলায় প্রবেশ করে। অতঃপর ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী নদীয়া বিজয় (১২০৪ খ্রি.) পর্যন্ত পূর্ব পথ দিয়ে ইসলাম প্রচারকের দল বিভিন্ন সময় বিছিন্ন ভাবে বাংলার বিভিন্ন হানে ইসলামের সত্য বাণী বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পৌছাতে থাকে। বখতিয়ার খলজীর বাংলার অভিযানের পর এ ধারা পূর্ণগতিতে অগ্রসর হয়।

এরপর বাংলা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শাসকবর্গের শাসনামলে ইসলামী শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর হতে থাকে। কখনও বন্ধুর পথ আবার কখনও সমতলে চলে বর্তমানে বাংলাদেশ ৮৫% মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। তবে শাসন ক্ষেত্রে ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে শুরু হয় প্রথম সংবিধান । ১৯৭৫ সালের পর সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি বাদ দিয়ে "আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" এই মুলনীতিটি বলবৎ করা হয়। বর্তমানে আবারও প্রথম সংবিধানে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা চলছে।

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ইসলামী দলের অস্তিত্ব রয়েছে। তবে তাদের কার্যক্রম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দলগুলো কর্তৃক সবসময়ই বাধা প্রাপ্ত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতি গ্রহণ করার চেয়ে পুঁজিবাদী, কখনও বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গ্রহণের দিকে ঝোক দেখা যার। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতি অপেক্ষা বিজাতীয় সংস্কতি অনুসরণের প্রতি মানুবের আগ্রহ বেশি। তবে অনেকে ইসলামী সংস্কৃতি অনুসরণের চেষ্টা করে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যবস্থা বাদ দিয়ে অন্যান্য ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণের মাত্রা অধিক। উন্নয়ন আশানুরূপ হয় নাই। স্বাধীনতার পর থেকে যতগুলো সময় অতিক্রম করেছে তা একটি দেশের কাঙ্খিত উন্নয়নের জন্য খুব বেশি না হলেও কম নয়। কিন্তু উন্নয়ন কতটুকু হচ্ছে তা ভাববার বিষয় বটে।

৮৫% মুসলমানের দেশ হলেও এখানে মিথ্যা, দূর্নীতি, ঘুষ ,স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি অনৈসলামীক কার্যগুলো অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়, যা এদেশের কাঙ্খিত উন্নয়নের জন্য বড় বাধা বলে অভিজ্ঞমহল মনে করেন। তাছাড়া বেশির ভাগ দেশবাসীর দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ হিসেবে এখানে ইসলামী অর্থনীতি , রাজনীতি ও সংস্কৃতি গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। যার মাধ্যমে এদেশ একটি উন্নত দেশে পরিণত হতে পারে। কারণ পরিপূর্ণভাবে ইসলাম অনুসরণের মাধ্যমে মদীনা রাষ্ট্র এবং চার খলিফার রাষ্ট্রে মানুষ সর্বাধিক সুখে বাস করতো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভাবে। তবে এখানে পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসরণ করা হয়।

২.৩ উন্নয়ন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে পাশ্চাত্যেও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ফলশ্রুতিতে এশিয়া,আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার পূর্বতন ঔপনিবেশিক দারিদ্রপীড়িত ও নব্য স্বাধীন দেশগুলো যার মধ্যে মুসলিম দেশগুলোও রয়েছে। পাশ্চাত্য মডেলের উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করে এগিয়ে যাবার কৌশল গ্রহণ করেছে। জার্মান পন্ডিত উলফগাং সাকস অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেছেন, "বিগত চল্লিশ বছরকে উন্নয়নের যুগ বলা যায়... যেমন লাইট হাউসের উজ্জ্বলতা, নাবিককে তীরের দিকে পথ প্রদর্শনের মতো "উন্নয়ন" এমন একটি ধারণা, যা নব প্রজন্মকে যুদ্ধোত্তর ইতিহাসের ভ্রমণ পথে নিয়ে যায়। গণতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক যে দেশই হোক না কেন, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো উপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে তাদের প্রাথমিক গর্বের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে পাশ্চাত্য নির্দেশিত উন্নয়ন মডেলকে জাহির করেছে।... সমস্ত প্রচেষ্টাকে পাশ্চাত্য মডেলের উন্নয়ন লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যই যুক্তিযুক্ত মনে করা হয়েছে। কিন্তু তা অন্ধকারেই রয়ে গেছে... বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে এ দেশগুলো পাশ্চাত্য উন্নয়ন মডেলকে বন্ধুভাবাপন্ন হিসাবে গ্রহণ করেছে।[২২] কিন্তু দৃশ্যপট পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। উলফগাং সাকস আরো বলেছেন, 'আলোকের স্তম্ভে ফাটল ধরেছে এবং তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে শুরু করেছে। উন্নয়ন ধারণা এখন যেন বুদ্ধিবৃত্তিক ধ্বংসাবশেষের ছবি। সত্যিকার অর্থে এ যুগ শেষ হয়ে যাবে। এখন এর সমাধি রচনার সময়।'[২৩]

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি) মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ১৯৯২[২৪]-এ অনুতাপের সাথে স্বীকার করা হয় যে, 'উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফসল সব জায়গায় সমভাবে পড়েনি এবং প্রায়ই তা হতাশাজনক।' এবং প্রতিবেদনটি সতর্ক করে দিয়ে উল্লেখ করেছে, বিশ্ব দারিদ্র্যের নিগূঢ় সমস্যাগুলো আরো বৃদ্ধি পেতে পারে তা বিশ্বে বৃহদাকারে ছন্দপতন ঘটাতে পারে। যার ফলাফল থেকে শিল্পোন্নত ও ধনী দেশগুলোও রেহাই পাবে না। প্রতিবেদনটি পরামর্শ দিয়ে লিখেছে, 'বিশ্ব উন্নয়নের সমস্যাগুলো দূর করার জন্য ধনী দেশগুলোর নিজের স্বার্থেই একটা নতুন, শক্তিশালী এবং মৌলিক ভাবে ভিন্ন কিছু কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। মানব

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন প্রতিবেদন ১৯৯২ এই স্পষ্ট বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে যে, গত তিন শতাব্দীর তথাকথিত সার্বজনীন উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ধনীরা আরো ধনী হয়েছে এবং দরিদ্ররা আরো দরিদ্র হয়েছে। উনিশশত ষাট দশকে, পাঁচ বিলিয়ন জনসংখ্যার তুলনায় ত্রিশগুণ বেশি ভাল অবস্থানে ছিল। দি গার্ডিয়ান পত্রিকার সম্পাদক মন্তব্য করেছেন যে, উন্নয়নশীল দেশগুলো অসম অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে বাজারে প্রবেশ করছে এবং অসম হিস্যার সাথে অবস্থান করছে।[২৫]

উন্নয়ন ধারণাটি একটি বহুমাত্রিক বিতর্কিত ও আন্তর্জাতিক ভাবাদর্শ। এর বিভিন্ন প্রথার অভিব্যক্তি রয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দার্শনিক ইবনে খালদুন "The Muqaddimah" গ্রন্থে সর্বপ্রথম উন্নয়ন (Development) শব্দটি ব্যবহার করেন।[২৬] ইবনে খালদুন উন্নয়নকে আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করেছিলেন। উন্নয়নের সে ধারণা বর্তমানে বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। কট্টর মার্কসবাদী থেকে উদারনীতিবাদী এমনকি হালের পুঁজিবাদী দর্শনে বিশ্বাসীদের কেউ কেউ উন্নয়নকে কোন একক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণের পক্ষপাতি নন। তাই উন্নয়ন সমীক্ষক ইয়ান সাতাইস বলেন, "উন্নয়নের সার্বজনীন কোন সংজ্ঞা নেই বরং দেশ-কাল আঞ্চলের ভিত্তিতে উন্নয়নের ধারা নির্ধারিত হয়, ধারা সুগঠিত হয়।"

যদিও বিভিন্ন লোকের কাছে উন্নয়নের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে, তবুও একটি অর্থ সাধারণ ভাবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় যে, উন্নয়ন বলতে কোন দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত উন্নয়নকে বুঝায়। এগুলোর কোন একটিকে উপেক্ষা করে উন্নয়নকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

উন্নয়ন বলতে কেউ পরিবর্তন বললেও অনেকে একে প্রবৃদ্ধি বলেছেন। অপর পক্ষে কেউ কেউ একে পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধি বলেছেন। তবে পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধির মধ্যে কিছু পার্থক্যও রয়েছে। যেমন কিন্ডেল বার্জার এর মতে, ***"অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কাঠামোগত এবং কার্যগত পরিবর্তন বুঝায়"***। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, এক মুখো ব্যপার। ব্যাপক অর্থে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে বুঝায় অধিকতর উৎপাদন ও অধিকতর দক্ষতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে বুঝায় অধিকতর উৎপাদন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রকৌশলগত ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন। কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থায় অনুন্নত অবস্থা সৃষ্টিকারী বহু সংখ্যক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ (Upliftment of overall social Structure)[২৭] এশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বহু সংখ্যক দেশে জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব ও রোগে শোকে জর্জরিত। এগুলো হচ্ছে সেসব দেশের জন্য অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি যা থেকে তারা পরিত্রাণ লাভে সদা সচেষ্ট। তাই উন্নয়ন বলতে শুধু বস্তুর প্রবৃদ্ধি অথবা মুষ্টিমেয় লোকের উপকার বুঝায় না, বরং এটা হচ্ছে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে একটা বহমান প্রক্রিয়া।[২৮] জনগণই এখানে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মুল জ্যোতিকেন্দ্র (Focus)। উন্নয়ন হলো একটি দেশজ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি জাতির আত্মবিকাশ ঘটে এবং জাতি আত্মমর্যাদা লাভ করে। অর্থনীতিবিদ মাইকেল পি টোডারা উন্নয়নের নিম্নলিখিত তিনটি মৌলিক উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন:

উন্নয়ন= আত্ম-জীবিকা নির্বাহ (মৌলিক চাহিদা পূরণের সামর্থ্য) + আত্ম-সম্মান+অধীনতা থেকে মুক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ রাজনৈতিক উন্নয়ন

রাজনৈতিক উন্নয়ন যে কোন সমাজের তথা রাষ্ট্রের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ রাজনৈতিক উন্নয়নের উপর একটি দেশের অন্যান্য অনেক বিষয় নির্ভর করে। বিশেষভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উন্নয়ন অপরিহার্য। কারণ রাজনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো বাধাগ্রস্থ হয়। তবে অর্থনৈতিক উন্নয়নও রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ একটি দেশ যখন অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ না হয়ে বরং অন্যের উপর বিশেষ করে বিদেশী রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হয় তখন সে দেশ রাজনৈতিকভাবেও স্বনির্ভর হতে পারে না। অর্থাৎ তার রাজনৈতিক উন্নয়ন পদে পদে বাধাগ্রস্থ হয়। রাজনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাপক বিষয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে জড়িত আছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উন্নয়ন। এ সবের উন্নয়ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবেন।

রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের অভিমত

রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে জি এ অ্যালমন্ড বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার অনুপ্রেরণায় গঠিত "Committee on Comparative Politics of the Social Science research council" রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে বিশেষ অবদান রাখে। এই কমিটির মতে "রাজনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোগত পৃথকীকরণ, ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা এবং একত্রীকরণ, সাড়া প্রদানকারী ও খাপ খাওয়ানোর দক্ষতার এক নিরবচ্ছিন্ন পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বিশেষ।" প্রফেসর জি এ অ্যালমন্ড রাজনৈতিক উন্নয়নের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছে। যথা-

স্বতন্ত্রীকরণ

সমযোগ্যতা/সাম্য

দক্ষতা/ধারণ ক্ষমতা

স্বতন্ত্রীকরণ

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও কাঠামোর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উন্নয়নের বিশেষভাবে সত্য এ স্বতন্ত্রীকরণ উপাদানটির মাধ্যমে চারটি লক্ষ্য অর্জিত থাকে।

প্রথমত: রাজনৈতিক কাঠামোতে ব্যাপক বিশেষীকরণ।

দ্বিতীয়ত: প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ও কাঠামোর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন।

তৃতীয়ত: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কাঠামোর মাঝে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন ও অর্জন।

চতুর্থত: রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ক্রমবর্ধমান হারে বাস্তব ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক প্রসার। অধ্যাপক অ্যালমন্ড স্বতন্ত্রীকরণ বলতে কোন অবস্থাতেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে খণ্ডীকরণ বা বিচ্ছিন্ন করা নয় বরং সংহতি চেতাণর উপর নির্ভরশীল এক প্রকার বিশেষীকরণকে বুঝিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সাম্য

রাজনৈতিক উন্নয়নের একটা বিশেষ পরিলক্ষিত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমতার প্রতি সাধারণ স্পৃহা ও মনোভাব। এ সম্পর্কে অধিকাংশ লেখকের মতানুযায়ী রাজনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে:

১) গণ-অংশগ্রহণ অর্থাৎ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক জনগণের জড়িত হওয়া।

২) রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান ও নিয়মকানুন সর্বজনীন প্রকৃতির হবে। অর্থাৎ তা সকলের উপর সমভাবে প্রযোজ্য হবে এবং তাদের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে হবে কম বেশি নৈর্ব্যক্তিক।

৩) রাজনৈতিক পদে নিয়োগকার্য সম্পাদনের অর্জনমূলক মানকে প্রতিফলিত করবে।

ধারণ ক্ষমতা

রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে দক্ষতা হলো:

১) রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য যে সম্পদ ও সমর্থন প্রয়োজন তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ থেকে নিষ্কাশন করার ক্ষমতা।

২) রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে জন-সমাজ ও গোষ্ঠীসমূহ বাস করে তাদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা।

৩) রাষ্ট্রভ্যান্তরে সকলের জন্য বিভিন্ন মূল্যবান উপকরণের ন্যায় সঙ্গত বিতরণ করার ক্ষমতা এবং

৪) বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, একাত্মতা ও দেশপ্রেম বৃদ্ধির ক্ষমতা।

রাজনৈতিক উন্নয়ন একটি দেশের জন্য অতীব জরুরী হলেও উন্নয়নের পথ সহজ সরল নয়। পদে পদে অনেক বাধা, জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যেগুলোকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক সংকট বলে অভিহিত করেছেন। রাজনৈতিক উন্নয়নের সাথে এসব সংকট সমূহের সমাধান ও দূরীকরণ একান্ত আবশ্যক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করার জন্য। অর্থাৎ রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য এসব সংকট অবশ্যই চিহ্নিত ও দূরীভূত হওয়া প্রয়োজন।

জি এ অ্যালমন্ড রাজনৈতিক উন্নয়নের এসব সংকটকে চ্যালেঞ্জ নামে চিহ্নিত করছেন। চ্যালেঞ্জগুলো হলো:

১) জাতি গঠন

২) রাষ্ট্রগঠন

৩) রাজনৈতিক অংশ গ্রহণ

অর্থাৎ জাতি গঠন, রাষ্ট্রগঠন ও রাজনৈতিক অংশ গ্রহণের সংকট বা চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠতে পারলে রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

লুসিয়ান ডব্লিউ পাই

প্রফেসর লুসিয়ান ডব্লিউ পাই রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য ধারণা প্রদান করেন। তিনি রাজনীতির বহুমূখী চরিত্রের কারণে রাজনৈতিক উন্নয়নকে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বা সংজ্ঞার আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি তার *Aspects of political development* নামক গ্রন্থে রাজনৈতিক উন্নয়নের দশটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন।[২৯]

Dhaka University Institutional Repository

১) রাজনৈতিক উন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের রাজনৈতিক পূর্বশর্ত

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা উন্নত হওয়া প্রয়োজন। আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন রাজনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। তবে শুধু রাজনৈতিক উন্নয়ন একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয়।

২) রাজনৈতিক উন্নয়ন শিল্পায়িত সমাজগুলির আদর্শ রাজনীতি

শিল্পায়িত সমাজ যে ধরণের রাজনৈতিক আচরণ করে তাকে রাজনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি ধরা হয়। তা গণতান্ত্রিক হোক বা না হোক। অনেক সময় শিল্পায়িত হোক বা না হোক এমন অনেক দেশ শিল্পায়িত সমাজের রাজনৈতিক আদর্শকে রাজনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে গ্রহণ করে।

৩) রাজনৈতিক উন্নয়ন হলো রাজনৈতিক আধুনিকী করণ

রাজনৈতিক উন্নয়নকে রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের সমার্থক মনে করে কোথাও রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ হলে সেখানে রাজনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে ধরা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শিল্পায়িত ও পাশ্চাত্য সমাজের জনগণের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সর্বজনীন আইনের দাবী জন্মের প্রতি নয় গুণের প্রতি শ্রদ্ধা, ন্যায় ও নাগরিকতার সাধারণকৃত ধারণা প্রভৃতিকে রাজনৈতিক উন্নয়নের আদর্শ ধরা হয়।

৪) রাজনৈতিস উন্নয়ন হলো জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্র চালনা

উন্নয়ন বলতে জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্রকে বুঝানো যায়। আর এটি এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জনগণ বিভিন্ন রকম সাম্প্রদায়িক বাধা ছিন্ন করে একটি একক জাতিসত্তায় রূপান্তরিত হয় এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে জাতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

৫) রাজনৈতিক উন্নয়ন হলো প্রশাসনিক ও আইনগত উন্নয়নঃ

রাজনৈতিক উন্নয়ন বলতে প্রশাসনিক ও আইনগত উন্নয়ন বুঝায়। ইউরোপীয়গণের বিশ্বাস মতে রাষ্ট্রগঠনে প্রথম এক আইন ব্যবস্থা ও পরে এক প্রশাসন ব্যবস্থা জরুরি, আর এখান থেকে বর্তমান যুগের কার্যকর আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই রাজনৈতিক উন্নয়নের মূলকথা ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত। এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রশাসনিক উন্নয়ন, বিচার বুদ্ধির প্রসার, ধর্ম নিরপেক্ষ ও আইনগত ধারণা শক্তিশালী করা এবং মানবিক বিষয়াদি পরিচালনার ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল ও বিশেষ জ্ঞানের উন্নত করণের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। তবে শুধু প্রশাসনিক উন্নয়ন রাজনৈতিক উন্নয়ন করতে পারে না। নাগরিক প্রশিক্ষণ এবং গণঅংশগ্রহণ রাজনৈতিক উন্নয়নের দুটি দিক।

৬) রাজনৈতিক উন্নয়ন বলতে রাজনীতিতে জনগণের সংগঠিত সক্রিয়তা ও অংশগ্রহণই বুঝায়ঃ

নাগরিকের আনুগত্য, রাজনীতিতে সংগঠিত সক্রিয়তা ও অংশগ্রহণকেই প্রধানত: রাজনৈতিক উন্নয়নের অপর এক দিক গণ্য করা হয়। কোন কোন পূর্বতন ঔপনিবেশিক দেশে প্রধানত: যে ধরণের রাজনৈতিক জাগরণকেই রাজনৈতিক উন্নয়ন হিসেবে অভিহিত করা হত, তার মাধ্যমে সে সকল দেশের অধিবাসীগণ সক্রিয় প্রতিশ্রুতিশীল নাগরিক হয়ে উঠত।

Dhaka University Institutional Repository

৭) রাজনৈতিক উন্নয়ন বলতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই বুঝায়:

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও রীতি নীতি প্রতিষ্ঠা করাকেই রাজনৈতিক উন্নয়ন বলা হয় বা বলা উচিত। অনেকেই স্বত:সিদ্ধ হিসেবে ধরে নেয় যে, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করণকেই কেবলমাত্র রাজনৈতিক উন্নয়ন বলা যেতে পারে। সমাজে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদি ও রীতিনীতি, মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার অর্থই হচ্ছে রাজনৈতিক উন্নয়ন। যে সমাজের গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধ বিদ্যমান থাকে সেখানে দায়িত্বশীল সরকারও বিদ্যমান থাকে এবং এর অব্যহতির ফল হচ্ছে রাজনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। তবে সমাজতান্ত্রিক দেশেও রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটতে দেখা যায়।

৮) রাজনৈতিক উন্নয়ন বলতে স্থিতিশীল সুশৃংখল পরিবর্তনকেই বুঝায়:

রাজনৈতিক উন্নয়ন সচরাচর স্থিতিশীল ও সুশৃংখল পরিবর্তনের সামর্থের উপর ভিত্তিশীল। উন্নয়ন মূলত: রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ধারণাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। স্থিতিশীল মানে নিশ্চয়তা নং বরং নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তনকে বুঝায়। স্থিতিশীলতা উন্নয়নের ধারণার সাথে বৈধভাবে সম্পর্কযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে যে কোন ধরণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিধি উন্নয়ন এমন এক পরিবেশের উপর নির্ভর করে যেখানে অনিশ্চয়তা হ্রাস পেয়েছে এবং যুক্তিসিদ্ধ অনুমানের উপর ভিত্তিশীল পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব। তবে এ ক্ষেত্রে পরিবর্তনের মাত্রা কেমন হবে তা সঠিকভাবে জানা যায় না।

৯) সমাবেশেকরণ ও শক্তি হিসেবে রাজনৈতিক উন্নয়ন:

এই অর্থে রাজনৈতিক উন্নয়ন বলতে চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামর্থ কতটুকু তা নির্দেশ করে। উন্নয়নশীল দেশ সমূহে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীগণ অতি সামান্য ক্ষমতা নিয়ে কাজ করেন এবং তারা স্বভাবতই দূর্বল থাকেন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তারা প্রায় শক্তিহীন হয়ে পড়েন। পক্ষান্তরে উন্নত রাষ্ট্রসমূহে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীগণ নিজেদের আয়ত্বে যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষমতা রাখেন এবং একারণেই এসব রাষ্ট্রে ব্যাপক ভিত্তিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাধারণ লক্ষ্য সমূহ অর্জন করা সম্ভবপর হয়।

১০) সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে রাজনৈতিক উন্নয়ন

এই অর্থে রাজনৈতিক উন্নয়ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের অন্যান্য দিকের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। যদিও সীমিত ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সমাজের বাকী অংশ থেকে স্বতন্ত্র থাকতে পারে তবুও সামাজিক পরিবর্তনের বহুমূখী প্রক্রিয়ার পটভূমিতেই কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হতে পারে। লুসিয়ান ডব্লিউ পাই বলেন, উন্নয়নের জন্য যা মৌলিক তা হচ্ছে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ, সর্বজনীন আইনের প্রতি আস্থা ও অর্জিত মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা অর্জন স্পৃহার জন্য সাম্যের দাবী, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য দক্ষতার প্রয়োজন, শ্রম বিভাগ ও বিশেষীকরণের জন্য উত্তরোত্তর স্বতন্ত্রীকরণের প্রসার লাভ। তার মতে সাম্য, দক্ষতা, স্বতন্ত্রীকরণ এই তিনটি উপাদানে যথাযথ বিকাশের উপর একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভরশীল।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক উন্নয়নে সংকট

বিভিন্ন সমস্যাকে সংকট বা ক্রাইসিস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তার মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংকট ছয়ভাগে বিভক্ত-

১) একাত্মতার সংকট

রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রথম ও সর্বাপেক্ষা মৌলিক সংকট হলো এক প্রকার সাধারণ একাত্মতার চেতনা অর্জন করা। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্রের জনগণকে অবশ্যই তাদের ভূখণ্ডকে নিজেদের সত্যিকার আবাস ভূমি হিসেবে স্বীকার করে নিতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই ভাবতে হবে যে, ব্যক্তি হিসেবে তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত পরিচয় অংশত: তাদের ভুখণ্ডগত সুনির্দিষ্ট দেশের পরিচয় দ্বারাই নির্মিত হয়। এসব রাষ্ট্রের ধর্ম ও উপজাতিগত একাত্মতার সনাতন ধারণা বৃহত্তর জাতীয় একাত্মতার সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। তবে এধরণের সমস্যা উন্নত দেশেও পরিলক্ষিত হয়।

২) বৈধতার সংকট

লুসিয়ান ডব্লিউ পাই নির্দেশিত রাজনৈতিক উন্নয়নের দ্বিতীয় প্রধান সংকটটি হচ্ছে বৈধতার সংকট। সরকারী কর্তৃত্বের বৈধ প্রকৃতি এবং সরকারের যথাযথ দায়িত্ব সম্পর্কে ঐক্যমত অর্জনজনিত সমস্যা এই সংকটের অন্তর্ভুক্ত। আর এই বৈধতার সংকটটি একাত্মতার সংকটের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত।

৩) অনুপ্রবেশের সংকট

নতুন রাষ্ট্রে প্রশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিল সমস্যা রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে ধরণের সংকট সৃষ্টি করে তাই হচ্ছে অনুপ্রবেশের সংকট। সরকার তাদের মৌল নীতিমালা সমূহ সমাজের নিম্নস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ও কার্যকর করতে গিয়ে জনজীবনের উপর হস্তক্ষেপ করতে অগ্রসর হয়।

৪) অংশ গ্রহণের সংকট

রাজনৈতিক উন্নয়ন বলতে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ বুঝায়। লুসিয়ান পাই এর মতে, অংশগ্রহণের সংকট তখনই দেখা যায় যখন অংশগ্রহণের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা থাকে।[৩০]

৫) সংহতির সংকট

রাজনৈতিক উন্নয়নের পথে উল্লেখযোগ্য সমস্যাটি হলো সংহতির সংকট। জনগণকে রাজনৈতিকে সরকারী কার্য সম্পাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত করার সমস্যাটিই এই সংহতি সংকটের অন্তর্ভুক্ত। এরূপ সংহতি সংকট দূরীকরণে অনুপ্রবেশ ও অংশগ্রহণ উভয় সংক্রান্ত সংকটাদিই কার্যকর ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সমাধান করতে হয়। প্রথমে সরকারী অফিস ও শাখাগুলির মধ্যে তারপর বিভিন্ন গোষ্ঠী ও স্বার্থকামী দলের মধ্যে এবং শেষত: সরকারী কর্মচারী এবং স্বার্থজ্ঞাপনকারী নাগরিকগণের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্রকে কতখানি কিভাবে সংগঠিত করা যায় তাই সংহতি সমস্যার অন্তর্গত।

Dhaka University Institutional Repository

৬) বণ্টনের সংকট

সমাজের বিথর দ্রব্যাদি "সার্ভিস ও মূল্য বণ্টন প্রভাবিত করার জন্য সরকারি ক্ষমতা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে এই প্রশ্নাদিই বণ্টন-সংকটের অন্তর্গত।

সরকারের নিকট হতে কে বা কারা উপকার লাভ করবে এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের জন্য অধিকতর কল্যাণ সাধন করতে হলে সরকারের কি করা উচিত এরূপ প্রশ্নাদি রাজনৈতিক উন্নয়নের এই সংকটের পর্যায়ভুক্ত। সরকার এ সংকটের মোকাবেলায় কখনও ধন-সম্পদের বণ্টন কার্য প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করতে চায় আবার কখনও সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য সুবিধা বৃদ্ধি ও তাদের সুপ্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে চায়।

এস. এম. লিপসিট তার ***Some Social Requisities of Democracy*** গ্রন্থে পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, যে সব দেশে শিল্পায়নের মাত্রা অধিক, শহরাঞ্চলে বসবাসকারীদের সংখ্যা তুলনামুলক ভাবে বেশি, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা অধিক এবং শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে সে সকল দেশে গণতন্ত্রের সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর।[৩১] এস. এম. লিপসিট এর এ ধারণার উপর নির্ভর করে ফিলিপস কাটরাইট জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক উন্নয়নের সূচক নির্ধারণ করেন নিম্নোক্ত ভাবে-

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, গণসংযোগ ব্যবস্থা, শহরাঞ্চলে বসবাসকারীদের সংখ্যা, শ্রমিকদের সংখ্যা ও প্রকারভেদ প্রভৃতির উপর। অর্থাৎ কাটরাইট মনে করেন, রাজনৈতিক উন্নয়নের মূল নিহিত রয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অংগতির উপর বিস্তৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু কার্যকারিতা, রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি রাজনৈতিক উন্নয়নের নিদর্শন।[৩২]

W.W. Rostow

মার্কসবাদীদের মতে, রাজনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাঁচটি বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন-

ক) সাম্যবাদী পর্যায়

খ) দাস প্রথা

গ) সামন্তবাদী পর্যায়

ঘ) পুঁজিবাদী পর্যায়

ঙ) সমাজতান্ত্রিক পর্যায়

মার্কসবাদীদের এ ধারণার প্রতিবাদ করে W. W. Rostow তিনি পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার পাঁচটি ধাপ বা পর্যায়ের উল্লেখ করেন যথা:

ক) প্রাচীন সমাজ যাতে রাজা ও জমিদারদের একক প্রভূত্ব বিদ্যমান ছিল।

খ) প্রাচীন সমাজ অতিক্রম করে কিছুটা উন্নয়নের পথে অগ্রসরমান।

গ) অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পর্যায় যে পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) পরিপূর্ণতার বিকাশ সংক্রান্ত পর্যায় যে পর্যায়ে কোন জনগোষ্ঠী জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

ঙ) ভোগের চরম পর্যায় যে পর্যায়ে মানুষ অধিক মাত্রায় ভোগ করে থাকে।

রোস্টার মতে, এই বিভিন্ন পর্যায়গুলো অতিক্রমের মাধ্যমেই একটি দেশ লাভ করতে পারে তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন। আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে পরেই রাজনৈতিক উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী। তার মতে, রাজনৈতিক উন্নয়ন মূলত: অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলশ্রুতি।

A.F.K Organiski

রোষ্টার পদাংক অনুসরণ করেই রাজনৈতিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে চারটি বিভিন্ন ধাপের উল্লেখ করেন।

১) Establishment of National Unity

২) Development of the Area of Industrialization and government assistance in Economic Developments.

৩) Adoption of Social Welfare Measures and

৪) Accummulation of Wealth.

রাজনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন নির্ধারক যেমন Social structure, class structures, education structure, economic development, Authority structure, political structure এর মধ্যে Economic Development একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক বা মাপকাঠি। কোন দেশে রাজনৈতিক উন্নয়ন সাধন করতে হলে সে দেশে অবশ্যই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করতে হবে। তাই নবীন রাষ্ট্রগুলোতে দেখা যায় যে, সরকার সমূহ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তাদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব বলে গণ্য করেন। আর এ দায়িত্ব পালনের জন্য অর্থনীতিবিদ, বেসামরিক আমলা ও শ্রমিক নেতাদের উপর বহুলাংশে নির্ভর করেন। সাধারণত: জাতীয় জীবনের যেসব ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধনে তারা ব্রতী হন তন্মধ্যে জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, প্রকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব কর্মসূচী ও লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে গিয়ে এলিট শ্রেণীকে বিভিন্ন প্রতিকুলতার সম্মুখীন হতে হয়। তাদের কোন কোন কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্ত দ্বারা সাধারণ জনগণের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়। ফলে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু পরিমাণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া নবীন রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক উন্নয়ন কিছুতেই সম্ভব নয়। গোত্রগত ও সম্প্রদায়গত চিন্তা চেতনার স্থলে জাতীয় চিন্তা চেতনার প্রসার না ঘটলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন ত্বরান্বিত হতে পারে না।

২.৫ অর্থনৈতিক উন্নয়ন

মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উন্নয়নের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন। কারণ মানব জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনের মধ্যে অর্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি পূর্বশত। তৃতীয় বিশ্ব বা উন্নয়নশীল দেশগুলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারেনা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতার জন্য। তাই বিশ্বের প্রতিটি দেশই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য বিশেষ তৎপর। তবে অনেক দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে এক ও একমাত্র সমস্যা মনে করে এর জন্যই বেশি সময় দিতে যেয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়নকে উপেক্ষা করে চলছে। এক্ষেত্রে যা করতে হবে তা হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নকে এক এবং একমাত্র না ভেবে একে মানব জীবনের অন্যান্য দিকের একটি ভেবে এর উন্নয়নে কাজ করতে হবে। সেই সাথে অন্যান্য যেমন রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতির উন্নয়ন করতে হবে তাহলেই মানব জাতির সার্বিক উন্নয়ন হবে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের অভিমত-

অধ্যাপক আর্থার ও লুইস অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে তাদের মত ব্যক্ত করে বলেন, **'Growth is taking place if out is increasing per hour of work done"** তার মতে প্রতি ঘন্টা কাজের মাধ্যমে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তাহলে বুঝতে হবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

অধ্যাপক উইলিয়ামস ও ব্যাটিক বলেন,

অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলো এমন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি দেশের বা আঞ্চলের জনগণের প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে মাথাপিছু দ্রব্যের ও সেবার উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

অধ্যাপক স্নাইডার বলেন,

"অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে মাথাপিছু উৎপাদন ক্ষমতার দীর্ঘমেয়াদী বা অব্যাহত বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বুঝায়" *Professor paul barb* এর মতে "সময়ের ব্যবধানে বস্তুগত সম্পদের মাথাপিছু উৎপাদনের যে বৃদ্ধি ঘটে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে"। G.M Meir and Boldwin বলেন" **Economic development is a process where by an Economy real national income incrase over a long period of times.**[৩৩]

(যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দীর্ঘকাল মেয়াদে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে।)

Professor W.W.Rostow মানুষের কতগুলো প্রবণতার প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ প্রবণতাগুলো সমাজের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তার ফলে উন্নয়ন সাধিত হয়। প্রবণতাগুলো হলো–

১) বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন ও প্রসারের প্রবণতা

২) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিজ্ঞানের ব্যবহারের প্রবণতা।

৩) নতুন যন্ত্রপাতির ও কালাকৌশল উদ্ভাবন ও তার প্রয়োজন প্রবণতা।

৪) বৈবয়িক উন্নতি অর্জনের প্রবণতা।

৫) জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বলা যায় *"অর্থনৈতিক উন্নয়ন"* বলতে সাধারণত একটি দেশের বা অঞ্চলের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নকেই বুঝায়, আর ব্যাপক অর্থে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ সময় ধরে একটি অর্থনীতিতে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। প্রক্রিয়া হচ্ছে কতগুলো সুনির্দিষ্ট শক্তির সম্মিলিত কার্যক্রম। এই শক্তিগুলো দীর্ঘ সময় ধরে কার্যকরী থাকে এবং অর্থনৈতিক চলকের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। সময় এবং স্থানভেদে এই সমস্ত প্রক্রিয়ার সাধারণ ফলাফল হচ্ছে জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধি যা দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে।

যখন আমরা জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করি তখন আমরা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ফলাফল একটি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করি। যখন আমরা প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরো ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি তখন আমরা লক্ষ্য করি যে আরো অনেক পরিবর্তন সমূহ উৎপাদন বৃদ্ধিতে অত্যন্ত সহায়তা করে। এগুলোর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন যেমন- উপকরণ যোগানে পরিবর্তন এবং উৎপাদন চাহিদার কাঠামোগত পরিবর্তন কে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীবিভাগে করা যায়:

উপকরণ যোগানের পরিবর্তন সমূহ নিম্নরূপ-

ক) অতিরিক্ত সম্পদের আবিষ্কার

খ) পুঁজির গঠন ও বিকাশ

গ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি

ঘ) নূতন এবং উন্নততর উৎপাদন কৌশলের উদ্ভাবন

ঙ) দক্ষতার উন্নয়ন

চ) অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক সংস্কার

উপকরণের চাহিদার কাঠামোগত পরিবর্তনগুলোকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়

ক) জনসংখ্যার আকার, প্রকৃতি এবং বয়সগত গঠন

খ) আয়ের বণ্টন

গ) রুচি

ঘ) অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা

অতএব উপকরণ যোগানের ক্ষেত্রে এবং উৎপাদন-চাহিদার কাঠামোগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উন্নয়নকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হিসেবে গণ্য করা যায়।

প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। জাতীয় আয় বলতে মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি অথবা নীট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি বুঝানো হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপের ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উৎপাদন পদ্ধতিতে ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় এবং অপচয়কে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। যেহেতু মোট জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় ও অপচয় বিবেচনা আনা হয় না সেজন্য নীট জাতীয় উৎপাদনকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকৃষ্ট চাবিকাঠি হিসাবে গণ্য করা হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে দীর্ঘসময় ধরে জাতীয় আয় বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকা বাঞ্ছনীয়। অর্থনীতিবিদদের মতে বাণিজ্য চক্রের উঠা-নামার পরিধির নূন্যতম সময় হচ্ছে এক দশক (ছয় থেকে পনের বৎসর)। কাজেই বাণিজ্য চক্রের মেয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করা কঠিন।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কি সেটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সামাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদদের কেউ কেউ অত্যন্ত সূক্ষ ও সচেতন দৃষ্টিভংগীর পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের মতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কেবলমাত্র বস্তুগত বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বুঝায় না। বরং মানব অভিপ্রায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ আবদান রাখতে পারে। অতএব অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে প্রধানত:মানব সম্পদের উন্নয়ন বুঝতে হবে এবং অর্থনীতিতে তার গুরুত্ব স্বীকার করে নিতে হবে। মানব সম্পদের উৎকর্ষতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে উন্নয়নের মূল সত্য। মানব অভিপ্রায় যদি সঠিক ভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে লাগান হয় তাহলে পারিপার্শ্বিক সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। মানব সম্পদের উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে তাই বলা যায়, 'Motivation factor may play a larger role in economic development than marginal shift in resources' আসলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এটাই মূল কথা।

অনুন্নয়নের প্রকৃতি

অনুন্নত দেশের সঠিক সংজ্ঞা কি কিংবা অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা বলতে কি বুঝায় এ নিয়ে উন্নয়ন অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অনেকেই অনুন্নয়ন বলতে উন্নয়নের চাহিদা রয়েছে এরূপ অর্থনীতিকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে অনুন্নত দেশ হচ্ছে 'Countries mostly in need of development' অনুন্নয়নের ধারণাটি উন্নয়নের ধারণা থেকে আরো ব্যাপক বলে Szentas মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে অনুন্নয়ন ধারণাটি উন্নত দেশসমূহের উন্নয়ন সম্পর্কে মূল্যায়ন ও প্রকৃত ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। অনুন্নয়ন ধারণার সাথে ঐতিহাসিক ও বৈদেশিক উপাদান যোগ করতে হবে অর্থাৎ একটি দেশের অনুন্নয়নের সাথে ঐতিহাসিক ও বৈদেশিক ক্রিয়াকলাপ জড়িত রয়েছে। এ সকল দেশে ঐতিহাসিক কারণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিকতার বীজ দানাবেধে উঠেছিল যার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পুঁজির ক্রমবিকাশ ভারসাম্য বজায় রাখেনি এবং কাঠামোগত পরিবর্তন আনয়নের জন্য অতীতে কোন প্রচেষ্টা নেয়া হয়নি। ফলে এসকল দেশে কারিগরী ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং এ দেশগুলোর অধিকাংশই 'Bread and butter task' এ নিয়োজিত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৬ উন্নয়নের ইসলামী ধারণা

উন্নয়ন একটি ব্যাপক ভিত্তিক বিষয় এবং এর এক অর্থ পরিবর্তন। যে কোন ধরণের পরিবর্তনকে ইসলামে উন্নয়ন বলা যাবে না। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থাৎ আধুনিক ধারণা আলোচনা হয়েছে। অনেক দেশ উন্নয়নের আধুনিক মডেল গ্রহণও করেছে। কিন্তু কাঙ্খিত উন্নয়ন এখনও ঘটেনি। বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলো এক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে। ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করেই বিশ্বের ইতিহাসের সবচেয়ে উন্নত মদীনা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সপ্তম শতকে। তথাপি নিজস্ব ইতিহাস ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে মুসলমানরা পাশ্চাত্য উন্নয়ন মডেল গ্রহণ করে উন্নয়নের চেষ্টা করছি। ইসলাম একটি পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যেখানে অন্য সমস্ত অর্থনৈতিক বিবেচনার ওপর কর্তৃত্ব করে নৈতিকতা, সেখানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই একমাত্র লক্ষ্য নয়। বস্তুগত প্রাচুর্যের চেয়ে এখানে বেশি জোর দেয়া হয় সমাজের সর্বাঙ্গীন ও ভারসাম্যমূলক উন্নয়নের দিকে।[৩৪] এক্ষেত্রে প্রয়োজন একটি খাঁটি ইসলামী উন্নয়ন কৌশল ইসলামী উন্নয়ন কৌশলের সাথে অন্যান্য কৌশলের কিছু কিছু মিল থাকা সত্ত্বেও ইসলামের সামগ্রিক কৌশল সন্দেহাতীত ভাবেই অনন্য সাধারণ।[৩৫]

যদি অর্থনৈতিক সম্পদ মানুষের নিকট সীমাহীন হতো তবে প্রত্যেকেই তার ইচ্ছা ও সামর্থ অনুযায়ী যা খুশী তাই পেতো এবং সম্পদের উন্নয়ন ও বন্টন সম্পর্কিত আলোচনার প্রয়োজন হতো না। সম্পদ সীমিত। তাই অভাব একদিকে যেমন অর্থনৈতিক সম্পদের বিস্তার ও উন্নয়নের প্রয়োজনকে নির্দেশ করে, অপরদিকে সম্পদ ব্যবহারের উপর দুটি সীমাবদ্ধতাও আরোপ করে। স্থিতিশীলতা ও লক্ষ্য অর্জন। স্থিতিশীলতা এমনভাবে অর্জন করতে হবে যেন সামাজিক লক্ষ্য সমূহ কাংখিত মানে অর্জন করা যায়। স্থিতিশীলতা ও লক্ষ্য অর্জন, এই উভয়টাই অর্থনৈতিক অব্যাহত উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক।[৩৬]

একটি অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য অবশ্যই নির্ধারিত হয় তার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে যেখানে কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে। যেমন- কি করে এই বিশ্বজগৎ অস্তিত্ব লাভ করল, মানব জীবনের ৺ ও উদ্দেশ্য কি এবং মানুষের করায়ত্ত সীমিত সম্পদের মালিকানা কার এবং এসব কিছুর উদ্দেশ্য কি? মানুষ ও মানুষের অধিকারভূক্ত, সকল কিছুই যদি এক শ্রেষ্ঠতম স্বত্বা কর্তৃক সৃষ্ট এবং মানুষ যদি সেই মহান স্বত্বার নিকট মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে' তবে তারা নিজেদেরকে নিরঙ্কুশ স্বাধীন মনে করে যেমন খুশী তেমন আচরণ করতে পারে না। অথবা ইতিহাসের দাবার অসহায় গুটি মনে করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারেনা এই ভেবে যে, ইতিহাস তার নিজস্ব গতিতে চলতে থাকুক তাতে মানুষের একটি মিশন বা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকবে এবং তারা পরস্পর এমন ব্যবহার করবে যাতে তাদের সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহার ও পরিবেশ ঐ মিশনকে সফল করতে সাহায্য করবে।

উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের কৌশল সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নির্ধারণ করতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে কোন আলোচনায় ইসলামী সমগ্র দৃষ্টিকোণের প্রতি মুসলিম দেশগুলোর বিশেষ নজর দিতে হবে

Dhaka University Institutional Repository

এবং এই দৃষ্টিকোণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করতে হবে। তিনটি মৌলিক ধারণার উপর ইসলামের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দণ্ডায়মান।[৩৭] এগুলি হচ্ছে:

ক. তাওহীদ (আল্লাহ এক এবং একক),

খ. খেলাফত (মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি), এবং

গ. আদল (ন্যায়বিচার)।

তাওহীদ হচ্ছে এসব ধারণার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরবর্তী ধারণা দুটি তাওহীদ থেকে উৎসারিত। তাওহীদের মানে এই বিশ্বলোক সুপরিকল্পিতভাবে এক মহান সত্তা সৃষ্টি করেছেন। যিনি এক এবং অনন্য এবং এই জগৎ কোন দৈব দুর্ঘটনার ফলে অস্তিত্ব লাভ করেনি। (কুরআন ৩ : ১৯১, ৩৮ : ২৭ এবং ২৩ : ১৫) তাঁর সৃষ্ট সকল কিছুরই একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। এই উদ্দেশ্যই বিশ্বজগতকে করেছে অর্থবহ এবং গুরুত্বপূর্ণ যার মধ্যে মানুষ একটি অংশ মাত্র। মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা, মনুষ্যত্ব ও নৈতিক সচেতনতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আল্লাহর প্রতি সচেতনতা ও মানুষের সহজাত প্রবৃতি। এসব কিছুর দাবী হচ্ছে মানুষ আল্লাহর আরাধনা করবে এবং সেই মহান সত্তার একান্ত অনুগত থাকবে। অতএব তাওহীদ কেবল যাত্ত বতার স্বীকৃতিই নয় বরং সক্রিয় তৎপরতারও প্রকাশ।

পৃথিবীতে মানুষ হলো শ্রেষ্ঠতম সত্তা বা আল্লাহর প্রতিনিধি/খলিফা (কুরআন, ২:৩০, ৬:১৬৫, ৩৫:৩৯, ৩৮:২৮, ৫৭:৭) এবং অধীনস্থ সকল সম্পদ মানুষের জিম্মায় রাখা হয়েছে (৬৭:৭)।

যেহেতু আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু তিনি মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি এবং ক্ষমতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে পুরোপুরি জানেন। তাই মানুষের প্রয়োজন ও স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান দিতে তিনি সক্ষম। আল্লাহ তাঁর প্রেরিত বার্তাবাহকগণের মাধ্যমে একের পর এক বিধান নাযিল করেছেন। এই বিধান গ্রহণ বা বর্জনে মানুষ স্বাধীন, তবে এর সঠিক অনুসরণ প্রকৃত কল্যাণ লাভের উপায়। এই বিধান গ্রহণ বা বর্জনের মাধ্যমে জীবন যাপন অনুযায়ী মানুষ পরজগতে পুরস্কার কিংবা শাস্তি লাভ করবে।

ব্যক্তি, জাতি ও রাষ্ট্র ভেদে প্রত্যেকটি মানুষ হচ্ছে আল্লাহর প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধিত্বের অত্যাবশ্যকীয় দিক হচ্ছে ঐক্যের মৌলিকত্ব এবং মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব। এই ভ্রাতৃত্ব একটি তাৎপর্যহীন ফাঁকা বুলি হবে যদি তাতে ন্যায়ের মানদণ্ড সম্পৃক্ত না থাকে। সুতরাং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যা আল্লাহর প্রেরিত নবী রসূলগণ অর্জন করতে চেয়েছেন (কুরআন ৫৭ : ২৫)। ইসলামী বিশ্বাসে 'ন্যায়' নামক ধারণাটিকে আল্লাহ ভক্তির নিকটতম পর্যায়ে স্থান দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ ভক্তি বা নৈতিক উন্নয়ন বলতে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়াকে বুঝায়। এই ঘনিষ্ঠতা অর্জন করতে হয় পবিত্র কুরআনে আল্লাহ প্রদত্ত ও হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রদর্শিত সকল মূল্যবোধকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করার মাধ্যমে। এ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাসহ সকল ভাল কাজকে মদদ যুগিয়ে থাকে। ভ্রাতৃত্ববোধ ও ন্যায়ের প্রতি ইসলামের এই কঠোর

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিজ্ঞা যা সকল মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারে তাই হচ্ছে ইসলামের প্রধান লক্ষ্য।[৩৮] এই লক্ষ্য পূরণে শুধুমাত্র মোট উৎপাদনের সর্বাধিক অর্জনই মুসলিম সমাজের লক্ষ্য হতে পারেনা। মোট উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে মানুষের গভীর চেতনায় লালিত আধ্যাত্মিকতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সুন্দর আচরণকে সকল ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে। এ ধরণের লক্ষ্যই কেবল মাত্র ইসলামী শরীয়তের লক্ষ্যের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের জন্য নৈতিক উন্নয়ন, এবং বস্তুগত চাহিদা পূরণের জন্য সকল বস্তুগত ও মানব সম্পদের উন্নয়ন করা প্রয়োজন, যেন আরও সম্পদের ন্যায্য বণ্টন দ্বারা সকল মানুষের চাহিদা পর্যাপ্তভাবে পূরণ হয়ে থাকে। ইসলাম ভিক্ষা বৃত্তিকে নিষেধ করেছে। মানুষ এক আল্লাহর প্রতিনিধি। ইসলামের বিধান হচ্ছে প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তি নিজের এবং পরিবার পরিজনের ভরণপোষণ করা। এক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করা। অধিকন্তু ইসলামী শরীয়ার প্রধান শিক্ষা হচ্ছে অপরের ক্ষতি না করা। এমনকি অপরের কৃত ক্ষতির বিপরীতে তার ক্ষতি না করা। পুনরায় সৃষ্টি হবে না এমন প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার না করা। পরিবেশ দূষণ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়ন অর্জনের বিষয়টি বিবেচনা করা সম্ভব হতে পারে, যদি সকলের অভাব পূরণ করা যায়। আরও সম্পদের সুষম বণ্টন করা যায়। পূর্ণ কর্মসংস্থান এবং পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে মানুষের প্রতিনিধিত্বের ধারণা ও ন্যায়ের বাস্তবায়ন করা যায়।

মূল প্রতিপাদ্য বিষয়

ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ নৈতিক উন্নয়নের জন্য তেমন গুরুত্ব প্রদান করে না। কিন্তু বর্তমানে তারাও ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়নের প্রত্যয় নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে এ ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করা যে, নৈতিক উন্নয়ন ব্যতীত ন্যায়ভিত্তিক বস্তুগত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই বিতর্কের যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তি হলো, ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য সকল সম্পদের বণ্টন, দক্ষতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে হতে হবে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে নৈতিকতা দ্বারা ভরে দেওয়া ছাড়া দক্ষতা এবং ন্যায়পরতাকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না এবং অর্জন করাও যায় না।

দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতাকে বহুভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ইসলামী শরীয়ার প্রেক্ষিতে ঐ সংজ্ঞাগুলিই যথোপযুক্ত যেগুলো ইসলামী ধারণায় উন্নয়ন অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে। সুতরাং সম্পদ বণ্টনে কাংখিত দক্ষতা অর্জিত হয়েছে তখন বলা যাবে যখন যৌক্তিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং একটি টেকসই উন্নয়ন ধারা অর্জনসহ চাহিদা পূরণের জন্য পণ্য ও সেবার উৎপাদন সর্বোচ্চ পরিমাণে হয়ে থাকে।[৩৯]

একটি নতুন কৌশলের আবশ্যকতা

এতদিন পাশ্চাত্য উন্নয়ন অর্থনীতির প্রদত্ত উন্নয়ন কৌশলগুলো মুসলিম দেশগুলোতে প্রয়োগের যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু উন্নয়ন অর্থনীতির নিজের আলাদা কোন পরিচয় নেই। বাজার অর্থনীতি এবং সমাজতন্ত্র এই উভয়ের সংমিশ্রণে দুনিয়াবী প্রয়োজনের আলোকে উন্নয়ন অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। তাতে তাদের সমস্যা

Dhaka University Institutional Repository

আরো জটিল আকার ধারণ করেছে। যখন মুসলিম দেশগুলো পশ্চিমা উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে তখন তারা শরীয়ার লক্ষ্য অর্জন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।[৪০] ফলে তাদের উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণে উন্নয়ন পরিচালনা জরুরী হয়ে পড়েছে।

উন্নয়ন সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির দার্শনিক ভিত্তি হলো

১. তাওহিদ (আল্লাহর এককত্ববাদ ও সার্বভৌমত্ব): এটা আল্লাহর সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের বিধি-বিধানসমূহ বর্ণনা করে।

২. রুবুবিয়াহ (মানুষকে পবিত্র করা, উপজীবিকা দান করা এবং তার পূর্ণত্বের দিকে পরিচালনার জন্য ঐশী ব্যবস্থাপনা): এটা হচ্ছে বিশ্বজগতের একটি মৌলিক নীতিমালা বা আইন, যা সমস্ত প্রয়োজনীয় সম্পদের উন্নয়ন এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও অংশীদারিত্বের জন্য ঐশী মডেল থেকে দিক নির্দেশনা দেয়। এটা এমন এক ধরণের ঐশী ব্যবস্থাপনা যাতে মানুষের প্রচেষ্টা অংশগ্রহণ করে।

৩. খিলাফত (পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে মানুষের দায়িত্ব): এটা দায়িত্ব ও কর্তব্য উল্লেখ করে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকাকে নির্দেশ করে যাতে মানুষ খিলাফতের যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে মুসলিম ও মুসলিম উম্মাহ্ হিসাবে কাজ করে। এখান থেকেই মানুষের ট্রাষ্টিশিপ, নৈতিকতা, রাজনীতি ও অর্থনীতি এবং সামাজিক সংগঠনের রীতিনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামের অনুপম ধারণা পাওয়া যায়।

৪. তাজকিয়াহ (শোধন ও সমৃদ্ধি): আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা প্রত্যেক নবী ও রসূলের কাজ ছিল মানুষের সাথে তার সৃষ্টিকর্তা, অন্য মানুষ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষের তাজকিয়াহ সম্পাদন করা।

উন্নয়নের ইসলামী ধারণা মূলত তাজকিয়াহ ধারণাকেই অনুসরণ করে, যেহেতু এটা নিজেই মানব উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা বিষয়ে উদ্যোগী। এ উন্নয়ন মানুষের পারস্পরিক আচরণ, মনোভঙ্গি (**Attitude**) ও সম্পর্কের পরিশোধনের মাধ্যমে পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হওয়া নিয়ে আগ্রহী। তাজকিয়াহর ফলশ্রুতি হলো মানুষের কল্যাণ-ইহকাল ও পরকালের সমৃদ্ধি।

উন্নয়নের ইসলামী ধারণা সম্পর্কিত আল কুরআনের কিছু কিছু বাণী উপযুক্ত আলোচনা বুঝার জন্য খুবই সহায়ক হবে।

"হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দিয়েছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে যে অধিক পরহেজগার সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদার অধিকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।" (সূরা আল-হুজুরাত; আয়াত-১৩)

Dhaka University Institutional Repository

"পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি, তার মধ্যে পাহাড় স্থাপন করেছি, সকল প্রজাতির উদ্ভিদ তার মধ্যে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করেছি এবং তার মধ্যে জীবিকার উপকরণাদি সরবরাহ করেছি তোমাদের জন্যও এবং এমন বহু সৃষ্টির জন্যও যাদের আহারদাতা তোমরা নও, এমন কোন জিনিস নেই যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই এবং আমি যে জিনিসই অবতীর্ণ করি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণেই করে থাকি।" (সূরা আল হিজর; আয়াত ১৯-২১)

"হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছো জুম'আর দিন যখন নামাজের জন্য তোমাদের ডাকা হয় তখন আল্লাহর যিকরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য বেশি ভাল যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে। তারপর যখন নামাজ শেষ হয়ে যায় তখন ভূ-পৃষ্টে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।" (সূরা আল-জুম'আ ও আয়াত-৯-১০)

"পুরুষ বা নারী যেই সৎকাজ করবে, সে যদি মুমিন হয়, তাহলে তাকে আমি দুনিয়ার পবিত্র পরিবেশে জীবন দান করবো এবং আখেরাতে তাদের প্রতিদান দেবো তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুসারে।" (সূরা আন-নাহল; আয়াত- ৯৭)

"আর বললেন, তোমরা (উভয় পক্ষ অর্থ্যাৎ মানুষ ও শয়তান) এখান থেকে নেমে যাও, তোমরা পরস্পরের শত্রু থাকবে; এখন যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন নির্দেশনামা পৌঁছে যায় তাহলে যে ব্যক্তি আমার সেই নির্দেশ মেনে নিবে সে বিভ্রান্তও হবে না, দুর্ভাগ্যপীড়িত হবে না। আর যে ব্যক্তি আমার উপদেশমালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জন্য হবে দুনিয়ার সংকীর্ণ জীবন এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে উঠাবো অন্ধ হিসেবে।" (সূরা ত্বা-হা; আয়াত ১২৩-১২৪)

"তোমাদেরকে আমি ক্ষমতা ইখতিয়ার সহকারে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য এখানে জীবন ধারণের উপকরণ সরবরাহ করেছি। কিন্তু তোমরা খুব কমই শোকরগুজারী করে থাকো।" (সূরা আল আ'রাফ; আয়াত-১০)

"কাজেই হে লোকেরা! আল্লাহ তোমাদের যা কিছু পাক-পবিত্র ও হালাল রিযিক দিয়েছেন তা খাও এবং আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা সত্যিই তার বন্দেগী করতে বদ্ধপরিকর হয়ে থাকো।" (সূরা আন্ নাহল; আয়াত-১১৪)

"হে নবী! এদেরকে বলে দাও, পবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, অপবিত্রের আধিক্য তোমাদের যতই চমৎকৃত করুক না কেন। কাজেই হে বুদ্ধিমানেরা! আল্লাহর নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকো আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।" (সূরা আল-মা-রেফাহ; আয়াত-১০০)

"নিঃসন্দেহে সফল হয়ে গেছে সেই ব্যক্তি যে নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে।" (সূরা আশ্ শামস; আয়াত-৯)

Dhaka University Institutional Repository

"আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অবৈধ পদ্ধতিতে খেয়ো না এবং শাসকদের সামনেও এগুলোকে এমন কোন উদ্দেশ্যে পেশ কর না, যার ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে তোমরা অন্যের কিছু অংশ খাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাও।" (সূরা আল বাকারাহ; আয়াত-১৮৮)

"আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা দিয়ে আখেরাতের ঘর তৈরি করার কথা চিন্তা করো এবং দুনিয়া থেকেও নিজের অংশ ভুলে যেয়ো না। অনুগ্রহ করো যেমন- আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করো না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আল কাসাস; আয়াত-৭৭)

"যাদের সম্পদে নির্দিষ্ট হক আছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের।" (সূরা আল মা'আরিজ; আয়াত-২৪)

"যা কিছুই তাদের দেয়া হোক না কেন তারা নিজেদের মনে তার কোন প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করে না বরং যত অভাবগ্রস্থই হোক না কেন নিজেদের চেয়ে অন্যদের অগ্রাধিকার দান করে।" (সূরা হাশর; আয়াত-৯)

এছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নিম্নলিখিত হাদীস দ্বারাও ইসলামী উন্নয়ন কৌশলের অগ্রাধিকার বুঝা যায়:

- জনগণ! তোমাদের পালনর্কতা এক, তোমাদের আদি পিতাও এক, সবাই তোমরা এক আদমের সন্তান এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট, আরবের উপর অনারব, কালোর উপর সাদার কোন প্রাধান্য নাই। প্রাধান্যের একমাত্র মাপকাঠি খোদাভীরুতা (আল-বুখারী)।
- কোন মুসলিম যখন বৃক্ষ রোপণ করে বা কৃষিকাজ করে, অতঃপর তা হতে পাখি, মানুষ ও প্রাণী খায়, তার জন্য তা সদকা হিসাবে গণ্য হয়। (আল-বুখারী)
- নিজ হাতে উপার্জন করে খাওয়ার চাইতে উত্তম খাদ্য কেউ কখনো খায়নি। (সুনান ইবনে মাযাহ, বুখারী)
- নীচের হাত অপেক্ষা উপরের হাতই উত্তম (আল-বুখারী)।

উপরোল্লেখিত এসব মৌলিক নীতিমালা ও মূল্যবোধ, বিশেষত ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রেক্ষিতে কিছু কিছু পরামর্শ থেকে উন্নয়ন ধারণার উপাদানসমূহ পাওয়া যায়। নীচে এসব উপাদানের অত্যাবশ্যকীয় অংশগুলি বর্ণনা করা হলো:

১. উন্নয়ন সম্পর্কে ইসলামিক ধারণা বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে খুবই ব্যাপক যাতে নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং বস্তুগত দিকও অন্তর্ভুক্ত। উন্নয়নের বিষয়টি বর্তমানে লক্ষ্য ও মূল্যবোধ সর্বস্ব হয়ে গেছে এবং সকল ক্ষেত্রেই তা মানুষের সমৃদ্ধির জন্য উৎসর্গীকৃত। নৈতিক ও বস্তুতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক ও পার্থীব বিষয়গুলি এখন আর পৃথক করা যায় না। অথচ সমাজের কিছু ব্যক্তি বা কোন বিশেষ দলের সমৃদ্ধি ঘটানোই ইসলামের লক্ষ্য নয় বরং সমাজের সকল মানুষের কল্যাণ সাধনই ইসলামের কাজ। অধিকন্তু, শুধুমাত্র ইহকালের নয় বরং পরকালীন কল্যাণও ইসলামের লক্ষ্য এবং এ দুয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। পাশ্চাত্যের সমসাময়িক উন্নয়ন ধারণায় এই দিকটি অনুপস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

২. উন্নয়ন প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্তঃস্থল হচ্ছে মানুষ। সুতরাং উন্নয়ন অর্থ হলো মানুষের উন্নয়ন-তার মনোভঙ্গি, তার আকাংখা, তার আচরণ, তার জীবন-যাপন পদ্ধতি এবং তার ভৌত ও সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন। সমকালীন ধারণা অনুযায়ী, উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার মূল কেন্দ্রই হলো ভৌত পরিবেশ যাতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্ন্তভুক্ত। ইসলাম সকল কার্যক্রমের মূলবিন্দু হিসাবে মানুষকেই গুরুত্বারোপ করে, যার কল্যাণই সফলতার পরিমাপক। এর অর্থ হচ্ছে, মানুষ যান্ত্রিক অনুভূতি নিয়ে নয়, কাজ করে তার প্রচ্ছন্ন মানবিক শক্তি দিয়ে। কাজেই ইসলামী দর্শনের বাস্তবায়নে ভিতর ও বাইরের পরিবর্তনটা প্রাসঙ্গিক। তাই ইসলামী নীতি সংক্রান্ত কৌশলপত্রের জন্য যতটা প্রয়োজন ভৌত সম্পদ, মূলধন, শ্রমশক্তি, শিক্ষা, দক্ষতা ও সংগঠন, ঠিক ততটাই প্রয়োজন মানুষের আদর্শ, মনোভঙ্গি, রুচি, অভিপ্রায় ও আকাঙ্খা'। এভাবে ইসলাম একদিকে তার প্রচেষ্টার দৃষ্টিকে ভৌত পরিবেশ থেকে আর্থ দক্ষতা ও সংগঠন, ঠিক ততটাই প্রয়োজন মানুষের আদর্শ, মনোভঙ্গি, রুচি, অভিপ্রায় ও আকাঙ্খা'। এভাবে ইসলাম একদিকে তার প্রচেষ্টার দৃষ্টিকে ভৌত পরিবেশ থেকে।

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ইসলাম বিভিন্নমুখী কার্যক্রম হিসাবে বিবেচনা করে।[৪১] এর জন্য একই সাথে বিভিন্ন দিকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কোন একটি উপাদানের উপর কাজ করার এবং সার্বিকভাবে ঐ উপাদানের উপর মনোনিবেশ করার পদ্ধতি ফলপ্রসূ হবে না। ইসলাম উন্নয়নের সকল উপাদান ও শক্তির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যাতে সব উপাদানই একযোগে সচল ও কার্যে লিপ্ত হয়। বিভিন্ন উপাদান ও শক্তির মধ্যে ভারসাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেও এটা প্রয়োজন।

৪. অর্থনৈতিক উন্নয়ন কতগুলি সংখ্যাগত ও গুণগত পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। সংখ্যাগত সম্পৃক্ততা নিজস্ব দাবিতেই প্রয়োজন ও যুক্তিযুক্ত কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাতে উন্নয়ন ও সাধারণভাবে জীবনের গুণগত ও অপরিমাপযোগ্য বিষয়ের প্রতি অবহেলা করা হয়। ইসলাম এই ভারসাম্যহীনতাকে সংশোধনের চেষ্টা করে।

৫. সামাজিক জীবনের গতিময় মৌলনীতি সম্পর্কে ইসলাম বিশেষভাবে দুটি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে। (এক) সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, আল্লাহ মানুষকে যে সম্পদের অধিকারী করেছেন এবং (দুই) সকল মানবীয় সম্পর্কের মধ্যে ন্যায়বিচার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্পদের সুষম বন্টন ও ব্যবহার। ইসলাম শোকর (আল্লাহর রহমতের প্রতি কৃতজ্ঞতা) ও আদল (ন্যায়বিচার) এর পক্ষে এবং কুফর (আল্লাহ ও তার রহমতকে অস্বীকার করা) ও যুলুম (অন্যায্যতা) এর বিপক্ষে অবস্থান করে।

এই বিশ্লেষণের আলোকেই শোকর ও আদল বাস্তবায়ন এবং কুফর ও যুলুম বিনষ্ট করার মধ্য দিয়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়া কার্যে পরিণত ও সমাবেশিত হয় (১৪ : ৩৩)। এভাবেই ইসলামী উন্নয়ন প্রচেষ্টা শোকর শক্তিশালী করা ও আদল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শত্রু সমাজ থেকে কুফর ও জুলুম নির্মূল করবে।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নের এ দৃষ্টিভঙ্গি ঐসব প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মৌলিকভাবে সম্পূর্ণ পৃথক, যা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে উৎপাদন ও বন্টনের সম্পর্ককে **either/or** হিসাবে বিবেচনা করে। ইসলামী কাঠামোতে উন্নয়ন প্রচেষ্টা পরিচালিত হয় আল্লাহ সচেতন মানুষ তৈরির লক্ষ্যে, যারা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, মানবজাতির প্রতি সত্যের সাক্ষ্য হিসাবে কাজ করতে সমর্থ, ইনসাফপূর্ণ সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং অন্যদের বঞ্চিত বা অন্যের অধিকার হরণ না করে মানুষ ও সমাজের প্রকৃত প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম।

সুতরাং ইসলামী কাঠামোতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলো মানুষকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করানো ও সকল দিকে মানবীয় সর্বোচ্চ কল্যাণ পরিচালনার মাধ্যমে গন্তব্যভিমুখী (**Goal oriented**) ও মূল্যবোধ কেন্দ্রিক (**Value-realising**) কার্যক্রম। এটা মুসলিম উম্মাকে সবলভাবে তৈরি করার জন্যও অনিবার্য, যেন তারা পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে সকল কার্য সম্পাদন করতে পারে এবং মধ্যমপন্থী জাতি (উম্মাতুন ওয়াসাতুন) হিসাবে মানবজাতিকে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজের দিকে আনয়ন করে, ইসলাম মানবজাতির জন্য যা কামনা করে। উন্নয়ন অর্থ ব্যক্তির নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উন্নয়ন এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের সর্বোচ্চ আর্থ-সামাজিক কল্যাণসাধন, ইহকাল ও পরকালে মানবজাতি যার ফলাফল ভোগ করবে।[৪২]

২.৬.১ ইসলামী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য

এখন আমরা উন্নয়ন নীতির সাধারণ লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ এবং মুসলিম সমাজের উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি।

১. উন্নয়ন পরিকল্পনার এক নম্বর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানব-সম্পদ উন্নয়ন। এটা মানুষের মনোভঙ্গি (**attitudes**) ও আকাংখার (**aspirations**) পুনঃপুনঃ সংশোধন, ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক উন্নয়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন কাজের জন্য দক্ষতা অর্জন, জ্ঞান-গবেষণার উন্নতি, মূল উন্নয়ন কার্যক্রম ও সকল পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সাধারণ জনগণের দায়িত্বশীল এবং সক্রিয় ও সৃষ্টিধর্মী অংশগ্রহণের (**Proactive & creative participation**) জন্য পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং সর্বোপরি উন্নয়নের ফলভোগে অংশীদারিত্বের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করবে। এটা শিক্ষার সম্প্রসারণ ও ইসলামায়ন, জনগণের সার্বিক নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং সহযোগীতা, অংশীদারিত্ব ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে উদ্ভাবিত সম্পর্কের নতুন কাঠামোর গুরুত্বারোপের দাবি করে। মানব-সম্পদ সমাবেশীকরণ ও পুনঃ পুনঃ আত্ম-ত্যাগের উৎসাহ অর্জনের জন্য অবশ্য সুউচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন কলা-কৌশল অনিবার্য।

২. প্রয়োজনীয় উৎপাদন সম্প্রসারণঃ নিয়মিত ও স্থায়ীত্বশীল জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে, একদিকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ও দক্ষতাপূর্ণ উৎপাদন এবং অন্যদিক সঠিক উৎপাদন মিশ্রণ অর্জন নিয়ে। ইসলামী উন্নয়ন কাঠামোতে উৎপাদন অর্থ, যে কোন ধরণের উৎপাদনকে বুঝায় না, যার চাহিদা আছে এবং যা শুধুমাত্র ধনী শ্রেণী ক্রয় করতে সমর্থ বরং

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদন হবে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে এবং মানবজাতির সাধারণ প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ইসলামী অর্থনীতিতে হালাল (অনুমোদিত) এবং হারাম (অননুমোদিত) স্পষ্টভাবে বর্ণিত এবং এর সীমারেখা নির্ধারিত, যার মধ্যেই উৎপাদন ও ভোগের মিশ্রণ পরিকল্পনা করা হয়। যে সকল পণ্যের ব্যবহার ইসলামে নিষিদ্ধ, তা উৎপাদনেও অনুৎসাহিত এবং যে সকল পণ্য জীবন-যাপনের জন্য অপরিহার্য এবং ব্যবহার উপযোগী তা উৎপাদনে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে ও উৎসাহিত করা হয়েছে। এই নীতির আলোকে উৎপাদন ও বিনিয়োগ পদ্ধতি গঠন করা হবে, ইসলামের অগ্রাধিকার উন্নয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে। তিনটি অগ্রাধিকারের বিষয় হলোঃ

ক. প্রচুর উৎপাদন এবং খাদ্য, রাস্তাঘাট ও বাড়ী নির্মাণ সামগ্রীসহ ন্যায্যমূল্যে সকল প্রয়োজনীয় উৎপাদন সামগ্রীর যোগানদান।

খ. মুসলিম বিশ্বের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

গ. ভারী যন্ত্রাংশ ও মৌল মূলধন সামগ্রীর স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিমাণ উৎপাদন।

৩. জীবনের গুণগত দিকের উন্নতি ঃ শুধুমাত্র মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কিছু চলকের দিকে নজর না দিয়ে জনগণের নৈতিক ও উন্নত সামাজিক জীবনযাপনের দিকে প্রচেষ্টা চালানো উচিত। এ জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের দাবি রাখেঃ

ক. নৈতিক উন্নয়ন, গুণগত শিক্ষা এবং সর্বোচ্চ নিরাপত্তা, সমমান ও সম্পদসহ সামাজিক মিথস্ক্রিয়া।

খ. পর্যায়ক্রমিক গঠনগত, প্রযুক্তিগত, আঞ্চলিক ও শিক্ষাগত সমন্বয়সাধনসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

গ. সমাজে যারা সুবিধাজনক কর্মসংস্থান পেতে অসমর্থ অথবা যারা সামাজিক সহযোগিতা পাওয়ার উপযুক্ত তাদের জন্য জীবনের মৌলিক চাহিদাসহ একটি দক্ষ ও সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। যাকাতই এই পদ্ধতির মূল চালিকাশক্তি হওয়া উচিৎ।

ঘ. অর্থ ও সম্পদের সুসমবণ্টন ঃ এর অর্থ হচ্ছে নিম্ন আয় শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য বিমোচনের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান, সমাজে সম্পদ সমাবেশীকরণ ও অসমতার মাত্রা হ্রাস। সমাজের সকল বিভাগে সম্পদ ও ক্ষমতার প্রসারণের লক্ষ্যে মুসলিম সমাজের অবশ্যই একটি সক্রিয় আয় ও মজুরী নীতিমালা (**Active income & wage policy**) প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া উচিত। সুনির্দিষ্ট পরিমাণে সার্বিক দারিদ্র্য (**absolute poverty**) কমানো এবং আয় বৈষম্য কমান, চলকগুলি উন্নয়ন কার্যক্রমে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। এই লক্ষ্য হাসিলের নিমিত্তে কর ব্যবস্থা (**Tax system**) পুনর্গঠন করতে হবে।

ঙ. কমমূল্যে বাসস্থান ও যাতায়াত ব্যবস্থা।

চ. শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার (**Vocational training**) প্রতি অগ্রাধিকার এবং গবেষণা ও উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

Dhaka University Institutional Repository

৪. ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন ঃ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভাগের মধ্যে সমান ও সমন্বিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিকেন্দ্রীকরণ, বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন, দেশের বিভিন্ন অংশ ও বিভাগের মধ্যে যথাযথ উন্নয়ন চাহিদা শুধুমাত্র ন্যায়ের স্বার্থেই নয়, দেশের সর্বোচ্চ সমৃদ্ধির জন্যও প্রয়োজন।

একটা দেশের ভিতরে বৃহত্তর সমন্বয় সাধন এবং অর্থনৈতিক দ্বৈতনীতির প্রতিকার হিসাবেও কাজ করবে; যার জন্য বেশিরভাগ মুসলিম দেশ ক্লেশ ভোগ করছে। তাছাড়া এটি এমন একটি ক্ষেত্র, যা সাথে যতোপযুক্ত পরিবর্তনের ঐ সব চলকগুলো সমন্বয় করতে প্রচুর মূলনীতি, অর্থনৈতিক কৌশল, ইনপুট আউটপুট পদ্ধতি ব্যবহারের দাবি করবে, যা ইসলামিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো উন্নয়নের জন্য খুবই প্রয়োজন।

৫. নতুন প্রযুক্তি ঃ এর অর্থ মুসলিম দেশের কাংখিত (aspiration) প্রয়োজনীয় ও মানানসই দেশীয় প্রযুক্তি (Indigenous technology) উদ্ভাবন। উন্নয়ন প্রক্রিয়া তখনই স্থায়ী হবে যখন আমরা শুধুমাত্র বৈদেশিক সাহায্যের (Foreignaid) ওপর নির্ভরশীল হব না বরং বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে প্রযুক্তির সমৃদ্ধি ঘটবে, আমরা প্রযুক্তিগত শৃজনশীলতার গদ্ধতিকে আত্মস্থ করতে সমর্থ হবো এবং নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন শুরু হবে, যা আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ বহন করবে। এর জন্য গবেষণাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন নতুন চেতনা।

৬. বিদেশের ওপর দেশের নির্ভরশীলতা কমানো এবং মুসলিম বিশ্বের মহাসমন্বয় সাধন ঃ এ বিষয়টি মুসলিম উম্মার জন্য এত বেশি প্রয়োজন যে, এটা অমুসলিম বিশ্বের ওপর মুসলিম বিশ্বের সকল ধরণের নির্ভরশীলতাকে পরিবর্তন করে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, আত্মসম্মান, পর্যায়ক্রমিকভাবে শক্তি ও ক্ষমতা তৈরির পর্যায়ে নিয়ে যাবে (৮ : ৬০)। মুসলিম বিশ্বের স্বাধীনতা বজায় রাখা এবং মানবজাতির শান্তি ও প্রশান্তি সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি দক্ষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অবশ্যই প্রাধান্য পেতে হবে।[৪৩]

২.৭ উন্নয়নের ইসলামিক কলাকৌশল

অর্থনীতির পরিভাষায় বলা যায়- মানুষের অভাব অসীম, কিন্তু সম্পদ সীমিত। ডাল-ভাতের অভাব পূরণ হলে পোলাও মাংস খেতে ইচ্ছে করে। ইসলাম এক্ষেত্রে বলে- মানুষ তার স্বচ্ছলতা অনুযায়ী আরাম আয়েশ ভোগ করবে। কৃপণতা ও অপচয় করবে না, মিতব্যয়ী হবে। সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষের জন্য সবচেয়ে সুন্দর ব্যবস্থা দিয়েই আল্লাহ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। সাধারণত এই বিশ্বে মানুষ ব্যতীত কোন প্রানী এমনকি সবচেয়ে বড় প্রাণী নীলতিমি ও (যার একই সময়ে টনে টনে খাদ্যের প্রয়োজন হয়) খাদ্যের অভাবে মারা যায়না। অথচ সৃষ্টির সেরা মানুষ যার কিনা দৈনিক মাত্র কয়েকশ গ্রাম খাদ্যের প্রয়োজন, সে না খেতে পেরে অনাহারে মারা যায়। এজন্য দায়ী মানুষই। কারণ পৃথিবীতে সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষই শুধু বিধাতার দেয়া নিয়ম ভঙ্গ করে। ফলে সে নানা রকম সমস্যায় নিপতিত হয়। বিশ্বে সীমাহীন পথ চলা। তাই প্রকৃত

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন সাধনের জন্য ইসলামী কলাকৌশল অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। কারণ এর চারটি গুরুত্বপূর্ণ, কার্যকরী এবং আন্ত: সম্পর্কিত উপাদান রয়েছে।[৪৪]

এ কলাকৌশলের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

১. অভিরিক্ত দাবী ন্যায়সঙ্গত ভাবে ছেঁকে ফেলা জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী বাস্তবে রূপদান করতে প্রত্যেক সমাজ প্রথমে যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা হলো সীমিত সম্পদের উপর সীমাহীন দাবী কি করে ছেঁকে ফেলা যায় যেন দাবিগুলি দক্ষতা এবং ন্যায়পরতা এ উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এটা ইতিমধ্যে দেখানো হয়েছে যে, যখন মূল্য পদ্ধতি 'ছেঁকে ফেলার' কার্য সম্পাদন করে তখন তা ন্যায় পদ্ধতিতে করে না। সুতরাং ইসলাম এটাকে অন্য একটি পরিপূরক ফিল্টার দ্বারা পরিপূর্ণ করে। যা ন্যায়পরতা সুনিশ্চিত করতে সহায়তা করে। 'নৈতিক ফিল্টার' সামাজিক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পছন্দের মাত্রা এবং কল্যাণের আঙ্গিকে সম্পদের উপর দাবী নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটিয়ে সম্পদের উপর সীমাহীন দাবির বিষয়টিকে তার উৎসমূলে আঘাত করে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

এভাবে নৈতিক ফিল্টার সম্পদের বরাদ্দ এবং বিতরনের ক্ষেত্রে ক্ষমতা এবং আর্থিক মধ্যস্থতাকে পরিশীলিত করে, যেন তা সম্পদের বণ্টন এবং বিন্যাসে সফলকাম হয়। নৈতিক ফিল্টারের সূচনা সামাজিকভাবে স্বীকৃত নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে, দুষ্প্রাপ্য সম্পদের উপর দাবীকে মূল্যায়ন করে বাজারে তা প্রকাশিত হওয়ারও আগে। মোটের উপর সম্পদের উপর দাবী নৈতিক ফিল্টারের মধ্য দিয়ে হয়ে আসলে, অপ্রয়োজনীয় এবং অন্যায্য দাবী অপসারিত হয় অথবা সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। তখন বাজারের মূল্য ফিল্টার পদ্ধতিও নিয়ন্ত্রিত হয় এবং মূল্য ফিল্টার তখন অধিকতর কার্যকরভাবে সম্পদের বণ্টন করতে পারে যাহা দক্ষ এবং ন্যায়পর উভয়ই হতে পারে।

পাঁচটি নীতি নির্ধারক উপাদান

ইসলামের এই চতুর্মাত্রার উপস্থাপনা (নৈতিক ফিল্টার দ্বারা মূল্য পদ্ধতিকে যাচাইকরণ ব্যক্তিকে সমাজের স্বার্থ রক্ষায় উদ্দীপ্ত করতে, আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠন, এবং সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা) সকলের কল্যাণ অধিকতর কার্যকরভাবে সুনিশ্চিত করতে একচেটিয়া পুঁজিবাদ অথবা সমাজতন্ত্র এবং মার্কেট ফোর্স অথবা জাতীয়করণ এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার চেয়ে অধিকতর কার্যকর প্রমাণিত হওয়া উচিত। অথচ দরিদ্রতম মুসলিম দেশের সরকারগণের রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ সভ্যতা থেকে ধার করা প্রচলিত জ্ঞান। এই জ্ঞান বর্তমান পৃথিবীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ফলে তারা ন্যায়পরতার সাথে উন্নয়ন ঘটাতে কলা-কৌশল গঠন ও প্রণয়ন করতে অসামর্থ্য হয়েছেন। মুসলিম দেশগুলোর যা করা দরকার তা হচ্ছে, উন্নয়ন অর্থনীতির ধর্ম নিরপেক্ষ এবং অসামঞ্জস্য সংস্পর্শ থেকে দুরে থাকা এবং ইসলামের সমন্বিত পরিধির অবকাঠামোর মধ্যে নীতিগুলোকে পুনর্গঠিত করা।

ন্যায়পরতা এবং স্থিতিশীলতার সাথে উন্নয়নের জন্য গঠিত পাঁচটি নীতি নিম্নে সুপারিশ করা হলো। এগুলো হলো: (১) মানবীয় উপাদানকে শক্তিশালী করা (২) সম্পদের কেন্দ্রিভূতকরণ হ্রাস (৩) অর্থনৈতিক পুনর্গঠন

Dhaka University Institutional Repository

(৪). অর্থায়ন পূনর্গঠন এবং (৫) কৌশলগত নীতি পরিকল্পনা। এই সমস্ত নীতির কিছু কিছু সমৃদ্ধশালী উন্নয়ন সাহিত্যের নিকট পরিচিত হতে পারে। যাহোক, যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো উন্নয়নের সমস্ত বস্তুগত মাত্রার মধ্যে নৈতিক মাত্রার প্রবেশ ঘটানো। নৈতিক এবং বস্তুগত মাত্রার এমন সমন্বয় ব্যতীত পূর্বোল্লিখিত দক্ষতা অথবা ন্যায়পরতার অর্জন নাও হতে পারে।

১. মানবীয় উপাদানকে শক্তিশালী করা

মানুষ যে কোন উন্নয়ন কর্মসূচির জীবন্ত এবং অপরিহার্য উপাদান হিসেবে কাজ করে। তারা উন্নয়নের গুরু এবং শেষ দুটাই করে থাকে। উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখতে এবং তাদের ব্যক্তিস্বার্থ সামাজিক কল্যাণের বাধ্যবাধকতার মধ্যে বজায় রাখতে যতক্ষণ না তাদেরকে সুবিধাজনকভাবে পুনর্গঠন করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবে পরিণত করতে অন্য কোন উপায় সফল হবে না। সুতরাং মুসলিম দেশসমূহের সামনে খুব কষ্টকর যে কাজটি তা হলো উন্নয়নের স্বার্থে ন্যায়পরতার সাথে প্রয়োজনীয় সমস্ত মানবীয় বিষয়কে অনুপ্রাণিত করা। ব্যক্তি অবশ্যই ইচ্ছাকৃতভাবে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে এবং নিয়ম শৃঙ্খলার সাথে কঠোরভাবে কাজ করে উত্তম অবদান রাখতে সচেষ্ট হবে এবং উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ অতিক্রম করতে প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকার করবে। বৃহত্তর সাম্য অর্জন এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে প্রয়োজনীয় প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতে তারা অবশ্যই ইচ্ছাকৃতভাবে ভোগ, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ আচরণ কাঙ্খিতভাবে পরিবর্তন করবে। অথচ, মানুষের কাছ থেকে উৎকৃষ্ট কিছু পেতে একমাত্র প্রেরণাই যথেষ্ট নয়। তাদেরকে অবশ্যই উন্নত প্রযুক্তি এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করার সামর্থ্য থাকতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হবে যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং অর্থ। যতক্ষণ পর্যন্ত এ উভয়ের পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যবস্থা করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু প্রেরণা দ্বারা মানবীয় উপাদানের সর্বাপেক্ষা উত্তম সম্ভাবনাময় শক্তিকে কাজে লাগাতে কেবল মাত্র অর্থনৈতিক পদ্ধতি সফল নাও হতে পারে।

প্রেরণা

মানুষ যেন সর্বোত্তম কাজ করে সেজন্য মানুষকে উৎসাহিত করতে এবং দুষ্প্রাপ্য সম্পদ সর্বাধিক দক্ষতার সাথে কাজে লাগাতে হলে দরকার হচ্ছে কাজের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তি স্বার্থের সংরক্ষণ যেন হয় তা নিশ্চিত করা। সমাজতন্ত্রের ছিল সোজা পদ্ধতি, যা ছিল অবাস্তব। যখন এটা আশা করেছিল যে ব্যক্তি দক্ষতার সাথে কাজ করবে যদিও তাদেরকে ব্যক্তি-স্বার্থ এবং সামাজিক স্বার্থের একাত্মতার ধারণা ছিল অবাস্তব। এর ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ইহজাগতিক প্রেক্ষাপট ব্যক্তিকে সামাজিক স্বার্থে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করতে কোন কৌশল শিক্ষা দেয় না, যখন ব্যক্তি স্বার্থের সাথে সামাজিক স্বার্থ পরস্পর বিরোধী হয়। সকল সন্দেহের উর্ধ্বে অভিজ্ঞতা হল, ব্যক্তিকে দক্ষ এবং ন্যায়বান হতে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব নয় যতক্ষণ না ব্যক্তি স্বার্থের মধ্যে এরূপ নৈতিক মাত্রার সংযোগ ঘটানো না যায় যে, ব্যক্তি স্বার্থের সাথে সংঘর্ষের কারণে সামাজিক স্বার্থ বিপন্ন হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

আর্থ-সামাজিক ন্যায়পরায়নতা

বস্তুগত পুরস্কারসমূহ এত বৈষম্যমূলক হয়ে পড়েছে যে অধিকাংশ লোকজন কঠোর পরিশ্রম, সৃজনশীলতা এবং উৎপাদনের জন্য অবদান রেখেও তাদের ন্যায্য পুরস্কার থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। ফলস্বরূপ তাদেরকে উদাসীন হতে হয় এবং তাদের উদ্যোগ, আন্তরিকতা, কঠোর পরিশ্রম এবং কর্মদক্ষতা সবকিছু ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ জন্য দু'টি উপাদান দায়ী ঃ প্রথমত, সরকারি নীতিতে বাস্তবতার অভাব এবং দ্বিতীয়ত, পল্লী এবং নগর এলাকায় সম্পদ এবং ক্ষমতা সীমিত সংখ্যক লোকের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হওয়া।

গ্রামীণ উন্নয়ন

সরকারী নীতিসমূহের অবাস্তবতা গ্রামীণ উন্নয়নের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। যখন মুসলিম দেশসমূহের জনসাধারণের একটি ব্যাপক অংশ গ্রাম অঞ্চলে বাস করে তখন সরকারী নীতিসমূহ শহর উন্নয়নে অযাচিত গুরুত্ব দিয়েছে এবং শহর এলাকায় বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে, এবং পল্লী এলাকার মানবীয়, ভৌত এবং অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নে অবহেলা করেছে। এটা শুধু কৃষক প্রজাদের এবং পল্লী এলাকার শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রমের ফলই নষ্ট করেনি, অধিকন্তু, উন্নত বীজ, সার, যন্ত্রাংশ এবং ছোট ও ক্ষুদ্রাকৃতির ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করার সামর্থ নিম্নতর পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে। এটা শহর এলাকার দিকে শ্রমিকের দ্রুত ও অবিরত আগমন পরিচালিত করেছে। ফলে সেখানে মজুরী ও জীবন যাপনের মান কমে গেছে।

এর বিপরীতে শক্ত প্রতিরোধ, সুবিধাজনক অর্থায়ন এবংয় ভর্তুকি শহর এলাকার বৃহদায়তন ব্যবসায় বাণিজ্যে এবং শিল্পে প্রদান করা হয়েছে। যা শহরের এই সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক সুবিধা বৃদ্ধি করেছে। পল্লী এবং শহর এলাকার ছোট এবং ক্ষুদ্রাকৃতির ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা হ্রাস করেছে এবং ক্ষমতা ও সম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণ সম্প্রসারিত করেছে। যখন উচ্চ আয়কর এড়ানোর ছল-চাতুরী সরকারকে শহর উন্নয়নের সুফল লাভ করা থেকে বিরত রেখেছে, তখন শহরে জনসংখ্যার অতিরিক্ত ভিড় সেখানকার কর্মচারীদের মজুরী কমিয়ে শহরের সম্পত্তির উপর তাদের অবদানের যথাযথ পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করেছে এবং তাদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কমিয়ে দিয়েছে।

সুতরাং সরকারী নীতিতে কৃষি এবং ছোট ও ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ করে বাস্তববাদ প্রবর্তন করা দরকার। তবুও এটা পর্যাপ্ত নয়। অসংখ্য আর্থ-সামাজিক সংস্কার চালু করা দরকার, যা সমস্ত শ্রমিক, সঞ্চয়কারী, অর্থ বিনিয়োগকারী, রপ্তানিকারক এবং বিশেষ করে সত্যিকারের দরিদ্রদের প্রকৃত আয় বাড়াতে সাহায্য করবে।

শ্রম সংস্কার

ইসলামী মূল্যবোধ নিয়োগ দানকারীকে কর্মচারী যে তাদেরই পরিবারের একজন সদস্য তা বিবেচনা করা দরকার বলে মনে করে দেয়। এটা দাবী করে যে একজন কর্মচারীর সাথে সম্মান এবং সহানুভূতির সাথে

Dhaka University Institutional Repository

আচরণ করতে হবে এবং তাদের কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে হবে। মুসলিম সমাজে একজন কর্মচারীর প্রকৃত মজুরী প্রকৃত ভাবে তাদের এবং তাদের পরিবারের সমস্ত জরুরি প্রয়োজন পূরণে যথাযথ হতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই প্রশিক্ষণ, চাকুরীর নিশ্চয়তা, এমনকি লাভেরও একটি অংশ দিতে হবে যেন তাদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় থাকে। এর সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, মুসলিম দেশগুলোতে প্রকৃত মজুরী এত কম কিন্তু মুসলিম যে দশ থেকে চৌদ্দ ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও একজন শ্রমিক তার নিজের এবং তার পরিবারের মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করতে সক্ষম হয় না। অধিকন্তু, কর্মচারীগণ চাকুরীর কোন নিশ্চয়তাও পায় না।

সুতরাং সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ধাঁচের নীতির অবলম্বন অধিকতর ভাল হবে। যেমন- প্রথমত: যে সমস্ত নীতি শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে, শোষণের তীক্ষ্ণ ধারকে ভোতা করে দেয় সেই সমস্ত নীতি গ্রহণ এবং দ্বিতীয়ত ঃ শহর এবং পল্লী এলাকায় পর্যাপ্ত আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ করা। এই ধরণের নীতিসমূহে কতিপয় বিষয় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। যেমন: (ক) উৎপাদনশীলতা বাড়াতে অধিকতর উন্নতমানের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, (খ) ছোট এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, (গ) প্রয়োজন পরিপূরণ এবং আয় ও সম্পদের ন্যায্য বন্টনের অনুকূলে পুরো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে সমন্বয় ঘটাতে হবে।

কর্মচারীদের নির্দিষ্ট নূন্যতম প্রয়োজনের পশ্চাতে তাদের কর্মক্ষেত্রকে লাভজনক করার লক্ষ্যে জীবনযাত্রাকে আরামদায়ক করার জন্য, আয়ে ক্রমবৃদ্ধির জন্য, বেশ কিছু সংখ্যক সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার। এইগুলি হলো (ক) কর্মচারীদের নৈতিক মান বর্ধিতকরণের মাধ্যমে বিরাজমান ঔদাসীন্যতা হ্রাস করে কর্মচারীদের বিবেক বিরাটাকারে জাগিয়ে তুলে উচ্চতম উৎপাদানশীলতা অর্জন, (খ) ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শ্রম ব্যবস্থার উন্নয়ন-এভাবে একটি আদর্শ মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য পুনরুজ্জীবন লাভের সহায়তা করা, (গ) শ্রমিকের আয় জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রতি নমনীয় এবং সহানুভূতিশীল রাখা এবং তাদের কর্মক্ষেত্রের কার্য সম্পাদন-যখন ভাল লাভ হবে তখন শ্রমিকের অংশ গ্রহণ প্রতিষ্ঠানের সফলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করবে কিন্তু যখন প্রতিষ্ঠানটি আয় নিম্ন পর্যায়ে নেমে যাবে বা প্রতিষ্ঠানটি যখন লোকসান করতে থাকবে তখন যেন প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে না যায়, (ঘ) কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা হ্রাসকরণ (কর ব্যবস্থা সংস্কার করে যদি সম্ভব হয়) কেননা শ্রমিকরা তাদের নিজের স্বার্থে প্রতিষ্ঠানের সত্যিকারের আয়ের উপর সমসাময়িক অভিন্ন দৃষ্টি রাখবে এবং (ঙ) অর্থনীতি এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা বাড়ানো। এভাবে অর্থনীতিতে সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্য সম্পাদনের এবং বিনিয়োগের স্বাভাবিক পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে। লভ্যাংশ ভাগাভাগির প্রকল্প যখন চালু করা হবে তখন এটা সুনিশ্চিত হওয়া দরকার যেন এটা শোষণের নীতির দিকে না যায়।

ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী এবং শেয়ার হোল্ডারদের আশানুরূপ লাভ

অনেক মুসলিম দেশে সঞ্চয় এবং শেয়ারের উপর নিম্ন হারে লাভ প্রদান প্রশাসনিক মিথ্যাচার এবং সংঘবদ্ধ দূর্নীতি মূলতঃ ক্ষুদ্র সঞ্চয়ী এবং বিনিয়োগকারীদের ক্ষতিগ্রস্থ করে।

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদনকারী, রপ্তানিকারক এবং ভোক্তাদের প্রতি ন্যায় বিচার

জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশের খরচে ক্ষুদ্রতম অংশের সমৃদ্ধিকারী কোন পদক্ষেপকে ইসলামী শরীয়তের আলোকে সমর্থন করা যায় না। যা হোক, বৈদেশিক বিনিয়োগ হার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে এনে মূল্য নিয়ন্ত্রণের বিপরীতে দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন। এ সমস্ত উপায় বিভিন্ন আকারে অবলম্বন করা যায়। যেমন, যাকাতের মাধ্যমে খয়রাত প্রদান অথবা এই উদ্দেশ্যে ভিন্ন তহবিল আলাদা করে রাখা। তাছাড়া মৌলিক প্রয়োজন পরিপূরণের পণ্য এবং সেবা সুবিধার সরবরাহ বৃদ্ধি করতে উৎসাহ প্রদান এবং সুযোগ সুবিধা সহকারে আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

নৈতিক সংস্কার

যদিও কঠোর এবং দক্ষ কাজ আদায় করার জন্য পরিশ্রম এবং পারিতোষিক এর মধ্যে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক থাকাটা অপরিহার্য, তবুও এটা সচেতনতার সূচনা করতে পর্যাপ্ত নয়। এটা জনসাধারণের ভোগ, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ আচরণ পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট নয়। আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্যসমূহের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা মুসলিম দেশসমূহে কিছু সময়ের জন্য প্রভাবশালী দর্শন হিসেবে কাজ করেছিল। কিন্তু তা সামাজিক লক্ষ্য অর্জনে একটি ফিল্টার ম্যাকানিজম এবং জনপ্রিয় নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। যা দ্বারা জনগণকে ত্যাগ স্বীকারের জন্য অনুপ্রাণিত করা যেত। যাহোক, জনগণের মধ্যে দরকারী গুণাবলী সৃষ্টি করতে ইসলামের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। জনগণের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থ নিরূপণেও ইসলাম সক্ষম। সামাজিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে সৃষ্টি করতে ইসলাম সক্ষম এবং জনগণের মধ্যে পরিবর্তন আনতে এবং তাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে ইসলামের জনপ্রিয়তাও রয়েছে।[৪৫]

যাহোক, ইসলামের পতনের কারণে মুসলিম জনগণ তাদের মূল শিক্ষা বহুলাংশে হারিয়ে ফেলেছে যা মুসলিম সমাজকে সাধারণ স্তরে নামিয়ে ফেলেছে। ইসলামী মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। মানবীয় উপাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে মুসলিম দেশগুলির মানব সম্পদের উৎকর্ষ সাধনে ইসলাম ব্যাপক অবদান রাখতে পারে।

সামর্থ্য

জনগণকে উৎসাহিত করতে আর্থ-সামাজিক ন্যায়পরতা, নৈতিক সচেতনতা এবং যথোপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদির প্রয়োজন হয় বটে। কিন্তু 'দক্ষতা' এবং 'সমতা' অর্জনের ক্ষেত্রে এসব কিছু পর্যাপ্ত নহে। দুজন ব্যক্তিকে সমানভাবে উৎসাহিত করা যেতে পারে। কিন্তু তারা লক্ষ্য অর্জনে সমান অবদান রাখতে অসামর্থ্য হতে পারে। জন্মগতভাবে অর্জিত গুণাবলীর পার্থক্য নয় শুধু, শিক্ষা, অর্থ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত গুণাবলীর পার্থক্যের কারণেও উভয় ব্যক্তির মধ্যে তারমত্য সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সুবিধার প্রসার হওয়া উচিত এবং অর্থলাভের ক্ষেত্রে গরীবদের সুযোগ প্রদান করা অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

মানুষের গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে, আর্থ-সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে এবং উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের অসামান্য অবদানের কথা আজ-কাল বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার দুয়ার খুলে দিয়েছে শিক্ষা। মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মুসলিম দেশের সরকারগুলো এই গুরুত্বপূর্ণ খাতে তাদের সম্পদ বরাদ্দ করতে সুস্পষ্ট অবহেলা প্রদর্শন করেছে। এমনকি সাহিত্য, যা কিনা শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ, এখনো অনেক মুসলিম দেশে সার্বজনীনতা লাভ করেনি। এসব দেশে নারী শিক্ষা অবহেলিত। অথচ নারী শিক্ষার উপর বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের স্বাস্থ্য, চরিত্র, এবং সামর্থ্য নির্ভর করে। এহেন অবহেলা দীর্ঘ দিন ধরে চলতে পারে না। নারী শিক্ষার প্রতি অবহেলা মুসলিম দেশগুলোর সমাজ কাঠামোকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

শিক্ষার প্রাথমিক কথা হচ্ছে একজন ভাল উৎপাদনক্ষম মানুষ তৈরি করা। মুসলিম দেশগুলোতে পুঞ্জীভূত মেধা ও প্রতিভার লালন ও বিকাশ সাধনে শিক্ষা সহায়ক হতে পারে। প্রত্যেক মুসলিম ছাত্রকে একজন খাঁটি মুসলমানের গুণাবলী শিখতে হবে এবং ঐ সব গুণাবলী নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হতে হবে। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। চাহিদা সৃষ্টিতে দক্ষতা এবং অধিকতর দক্ষতাপূর্ণ উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা এবং বিপনণ সম্বন্ধে তাকে শিক্ষা দিতে হবে।

অধিকাংশ মুসলিম দেশের প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ছাত্রদেরকে উন্নত মানুষ, খাঁটি মুসলমান এবং সমাজ সচেতন নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে শুধু ব্যর্থ হয়নি, তাদেরকে অধিকতর উৎপাদনশীল হিসেবে গড়ে তুলতেও ব্যর্থ হয়েছে। যখন একজন ছাত্র মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ভকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে স্বল্প সুযোগ-সুবিধার কারণে ভর্তি হতে পারে না, তখন তারা উপনিবেশ আমলে তৈরি বিশ্ববিদ্যালয় ও গোলামী যুগের সিলেবাস অনুসারে সনাতন শিক্ষা লাভ করে কেরানী অথবা সিভিল সার্ভিসে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করে, যা বর্তমান যুগে আর দরকার নেই। কেননা ইতিমধ্যে এদের সংখ্যা যথেষ্ট হয়েছে। এমনিভাবে অর্থনীতিতে বিবিধ খাতে যোগ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তির অভাব সন্তর্পণে বেড়েই চলছে। যদিও শহরে এলাকায় শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অনেক। এসব দেশে ধনী ব্যক্তিরা সহজে তাদের সন্তানদেরকে দেশে-বিদেশে টেকনিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারেন। অথচ যারা গরীব, যাদের টেকনিক্যাল শিক্ষার প্রয়োজন বেশি, নিজেদের আয় ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তারাই সে টেকনিক্যাল শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। এই অবস্থা ধনী-গরীবের ব্যবধানকে আরও বাড়িয়ে তোলে এবং গরীবদেরকে স্থায়ী দারিদ্রের নিগড়ে আবদ্ধ করে ফেলে। এ অবস্থা মুসলিম দেশগুলির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিবাচক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিষ্কার ব্যর্থতার চিত্র মাত্র।

অতএব, শিক্ষা কারিকুলামে ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করা খুব দরকার, যেন একজন ছাত্রের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধের এবং প্রয়োজনীয় প্রকৌশলগত দক্ষতারও সৃষ্টি হয়। এজন্য প্রয়োজন ব্যাপক সংখ্যায় টেকনিক্যাল

Dhaka University Institutional Repository

ইনষ্টিটিউশন গড়ে তোলা, যেন গরীবের সন্তানরা নিভৃত গ্রামে থেকে কিংবা শহরের বস্তিতে বাস করেও কারিগরী শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। বৈষম্য এবং দারিদ্র দূর করার জন্য এটা হয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা ও প্রশিক্ষণসহ প্রত্যেককে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হবে।

অর্থ লাভের সুযোগ

গরীবের জন্য অর্থ লাভ করার সুযোগ যদি না থাকে তবে নিঃসন্দেহে তা গরীবদের শিল্প ও বাণিজ্যের মালিকানা অর্জনের জন্য এক বিরাট ব্যর্থতার কারণ হয়ে থাকবে। সবার জন্য সমান সুযোগ- ইসলামের এ মহৎ উদ্দেশ্যটিও তাতে অর্জিত হবে না। দেশ থেকে এ অসুবিধা দূর করার বাস্তব পদক্ষেপ না নিলে কারিগরী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ফলে ব্যক্তির আয় ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে ঠিকই, কিন্তু সম্পদের বৈষম্য তাদের মধ্যে তেমন একটা হ্রাস পাবে না। এমতাবস্থায় সবার জন্য সমান সুযোগের ভিত্তিতে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের আলোচনা একটা কথার কথা হয়েই থাকবে। সৌভাগ্যবশতঃ ফিনান্সিয়াল সিস্টেমের ক্ষেত্রে ইসলামের এমন একটা পরিষ্কার সুবিধা রয়েছে যা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের চাইতেও শ্রেষ্ঠ এবং তা মূল্যবোধের ব্যবস্থা দ্বারা নির্মিত।

ভূমি সংস্কার ও পল্লী উন্নয়ন

অধিকাংশ মুসলিম দেশের বেশিরভাগ মানুষ তাদের আয়, কর্মসংস্থান এবং সার্বিক কল্যাণের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। এসব দেশের ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গঠিত আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে পল্লীর জনগণ পূর্বকাল থেকেই অবিচার, শোষণ এবং দারিদ্র্যতার যাঁতাকলে পিষ্ঠ হয়ে আসছে। সরকারী নীতিও পল্লী খাতকে অগ্রাধিকার প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ সামাজিক বৈষম্য ও অদক্ষতাকে কমাতে হলে উন্নয়ন পরিকল্পনায় পল্লী খাতের অগ্রাধিকার থাকা উচিত ছিল। গরীব মুসলিম দেশগুলো যতদিন পর্যন্ত কৃষি খাতে অধিকতর দক্ষতা এবং সমতা ফিরিয়ে আনতে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না, ততদিন পর্যন্ত এসব দেশের দারিদ্র এবং বৈষম্য দূর হবে না এবং তারা তাদের উন্নয়নকেও ত্বরান্বিত করতে পারবে না।

পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি অথবা মুসলিম দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের গোড়া মজবুত করতে হলে অর্থনীতির মূল বিষয় 'ভূমি সংস্কার' সাধন করতে হবে। ভূমি সংস্কার বলতে ভূমির আয়তন এবং বর্গা চাষের শর্তাবলীর সংস্কারকে বুঝানো হয়। আর্থ-সামাজিক চাহিদা ও ন্যায়-নীতির আলোকে ভূমি সংস্কার করা না গেলে ইসলামী শরীয়তের মঞ্জিলে মকছুদে পৌঁছা বড় কষ্টকর হয়ে যাবে।

মালিকানাধীন ভূমির আয়তন

যদি বৈধ উপায়ে ভূমি দখল করা হয় এবং ভূস্বামী ও বর্গা চাষী যদি ন্যায়পূর্ণ শর্তের উপর থাকে এবং ইসলামের উত্তরাধিকার আইন যদি ঠিকমত প্রয়োগ করা হয় তবে ভূমির মালিকানা কতিপয় পরিবারের হাতে কুক্ষিগত হতে পারে না। মুসলিম দেশগুলোর বিভিন্ন অংশে অবৈধ উপায়ে জমি দখল করা হয় শতাব্দীর পর

Dhaka University Institutional Repository

শতাব্দী ধরে এবং ইসলামের উত্তরাধিকার আইন এসব দেশে অবজ্ঞা করার ফলে জমির মালিকানার ক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে, এবং পল্লীর মানুষকে করেছে দাস, বানিয়েছে দরিদ্র এবং নিঃস্ব।

এরকম একটা মারাত্মক খারাপ অবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানায় জমির সর্বোচ্চ সিলিং বা পরিমাণ নির্ধারণ করা দরকার। বাকি জমি ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে ন্যায্যভাবে বণ্টন করে দিতে হবে।

স্বাভাবিক অবস্থায় ইসলামী শরীয়ত ব্যক্তি মালিকানায় জমির পরিমাণ ঠিক করে দেয় না।[৪৬] তবে ইসলামী শরীয়ত রাষ্ট্রকে এই কর্তৃত্ব দিতে পারে যে, রাষ্ট্র ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক লক্ষ্য অর্জনের যে কোন পদক্ষেপ নিতে পারে, যদি না সে সকল পদক্ষেপ ইসলামী শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক হয়।

বর্গাচাষের শর্তাবলী

জমির মালিকানার আয়তন কমিয়ে ফেলার সাথে সাথে জমির বর্গাচাষের শর্তাবলীরও সংশোধন করা গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম সরকারগুলোর জন্য এটাই উচিত হবে যে, তারা জমির মালিক ও বর্গাচাষীর মধ্যে শস্য ভাগাভাগি করার নীতিকে জমি বর্গা চাষের ভিত্তি হিসেবে চালু করবে। জমির মালিক ও বর্গাচাষীর মধ্যে ফসল ভাগ হবে ইনসাফপূর্ণভাবে। পল্লী এলাকায় ক্ষমতার ভিত্তি প্রসারিত না হওয়া পর্যন্ত এবং ভূস্বামী পরিবারের শোষণ করার ক্ষমতা যথেষ্ট সীমিত না হওয়া পর্যন্ত ফসল ভাগাভাগীর বর্গা চাষ নীতি চালু থাকা উচিত। মদীনার সমাজে প্রাথমিক দিকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কর্তৃক গৃহীত দ্রুত পরিবর্তনশীল নীতি এটাই প্রমাণ করে যে, কৃষক এবং ভূমিহীন কৃষক পরিবারের কল্যাণের জন্য এবং মুসলিম সমাজে সম্পদের কুক্ষিগত হওয়াটাকে কমিয়ে ফেলতে ইসলামী রাষ্ট্র সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে।

পল্লী উন্নয়ন

সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ার প্রবণতাকে কমিয়ে ফেলতে যদিও ভূমি সংস্কার খুব জরুরী, তবুও কেবলমাত্র এটাই মুসলিম দেশগুলোকে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারবে না। বিরাজমান অন্যান্য অসুবিধাগুলো দূর করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এসব অসুবিধা কৃষি খাতের দক্ষতাকে কমিয়ে উৎপাদনকে ব্যাহত করে, গ্রামীণ বেকারত্ব বৃদ্ধি করে, পল্লী এলাকার মানুষের আয় কমিয়ে ফেলে এবং বৈষম্যকে বাড়িয়ে দেয়।

পল্লী এলাকার অন্য একটি মারাত্মক অসুবিধা হচ্ছে ক্ষুদ্র কৃষক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের জন্য অর্থের দুষ্প্রাপ্যতা। "ব্যবসায়ী, মুৎসুদ্দী, আত্মীয়-স্বজনদের নিকট থেকে গৃহীত অব্যাহত ঋণ পল্লীর জনগণের দারিদ্র্যকে স্থায়ী করে তুলছে"।[৪৭] ফলে ভাল গুণাগুণসম্পন্ন কৃষি উপাদান ক্রয়ের জন্য এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিচালনার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা এবং নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে কর্মে নিয়োজিত করার জন্য কৃষকের হাতে টাকা পয়সা থাকে না।

সুতরাং কৃষিতে অর্থায়নের জন্য এবং পল্লী এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিচালনার মাধ্যমে কৃষক যেন আয় বৃদ্ধি করতে পারে সেজন্য পর্যাপ্ত অর্থায়নের সুন্দর ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া শুধুমাত্র জমির মালিকানার সুষম বণ্টন খুব একটা ফলপ্রসূ হবে না। কৃষির পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিচালনার মাধ্যমে কৃষক পূর্ণ কর্মসংস্থান ও

Dhaka University Institutional Repository

অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ লাভ করতে পারে। ফলে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে।[৪৮] সুদী ব্যবস্থার বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে এসবকিছু স্বাভাবিকভাবেই করা উচিত। ঐ বিকল্প ব্যবস্থা ইসলামী মূল্যবোধ ও শিক্ষার আলোকে গড়ে উঠতে পারে।[৪৯]

ক্ষুদ্র এবং ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া

ভূমি সংস্কারের অপর দিক হলো গ্রামে এবং শহরে ক্ষুদ্র ও ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া। এটা মুসলিম দেশগুলোতে ক্ষমতা ও সম্পদ কুক্ষিগত হওয়াকে হ্রাস করার ব্যাপারে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করবে। এটার অন্যান্য সুবিধাও রয়েছে, যেগুলি ইসলামী মূল্যবোধ কাঠামোতে উচ্চ অগ্রাধিকারমূলক স্থান দখল করে আছে। বৃহৎ মালিকানা এবং কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

যাকাত ও ইসলামী উত্তরাধিকারকে জোরালোভাবে সচল করা

আয় এবং সম্পদের বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত ব্যবস্থাগুলো আরও বেশি কার্য্যকরী হবে যদি ঐ সকল ব্যবস্থার পাশাপাশি যাকাত ও ইসলামী উত্তরাধিকার আইনকে ভালভাবে বলবৎ করা যায়। দূর্ভাগ্যজনক হলো মুসলিম দেশগুলোর লক্ষ্য অর্জন করার জন্য এবং মুসলমানদের অত্যাবশ্যকীয় করণীয় হিসাবে এই উভয় ব্যবস্থার বাস্তবায়ন বহু আগেই হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু সুদীর্ঘকাল ধরে এ দুটো ব্যবস্থা মুসলিম দেশগুলোতে অবহেলিত হয়ে আছে।

উত্তরাধিকার

ইসলামী আইন অনুসারে মৃত ব্যক্তির সম্পদ উত্তরাধিকারদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হয়ে যাওয়ার ফলে দীর্ঘ মেয়াদে সম্পদ এক পেশে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে না। যদি দরকার হয়, তবে উত্তরাধিকার আইন এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যেন অপ্রয়োজনীয় ভোগব্যয় হ্রাস পায়। বরং বিনিয়োগ এবং উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা বৃদ্ধি পায়।

আর্থিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন

মুসলিম দেশগুলি যে সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা পুঁজিবাদী দেশগুলো থেকে গ্রহণ করেছে তা সম্পদ এবং ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার অন্যতম প্রাথমিক উৎস।[৫০] অতএব' ইসলামী শিক্ষার আলোকে আর্থিক ব্যবস্থার পূনর্গঠন ব্যতীত মুসলিম দেশগুলো বৈষম্য দূরীকরণে এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ সাধনে অসুবিধায় পড়বে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

৩. অর্থনৈতিক পুনর্গঠন

একটি আগাগোড়া অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ব্যতীত সুষম উন্নয়নের জন্য সম্পদের পুনঃবন্টন সম্ভব নয়। এরূপ পুনর্গঠনে অর্থনীতির সকল দিক বিবেচনায় আসবে যেমন, ব্যক্তিগত ভোগ, সরকারী অর্থায়ন, পুঁজি গঠন এবং উৎপাদন। এসবের সাথে সম্পর্কিত কিছু বিষয় নিম্নে আলোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

ভোক্তার পছন্দের পরিবর্তন

অধিক কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের জন্য দ্রুত পুঁজি গঠন যেহেতু অত্যাবশ্যক, সেহেতু ভোগ কমিয়ে সঞ্চয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যের মধ্যে দ্বৈততা রয়েছে। ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলাম দ্ব্যর্থহীন গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ জন্য ভোগব্যয় এমনভাবে কমাতে হবে যেন গরীবদের প্রয়োজন পূরণ ব্যাহত না হয়ে তাদের জীবনের মান কার্যত উন্নত হয়।

বর্তমান জীবন-যাপন পদ্ধতির, বিশেষত ধনীদের, বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছাড়া এই দ্বৈততা পরিহার করা সম্ভব নয়। অভাব পূরণে সমাজের ব্যর্থতা সম্পদহীনতার ফসল নয় সমাজের লক্ষ্য অর্জনের সাথে সম্পদের সাযুজ্যপূর্ণ একটি ভোগবিধি গ্রহণে ব্যর্থতার ফসল।

ব্যয়বহুল জীবন যাপন যা অনেক শিল্প উন্নত দেশেও বলতে গেলে কঠিন। কিন্তু মুসলিম দেশগুলোতে ব্যয়বহুল জীবন যাপন মর্যাদার প্রতীক হিসেবে চলে আসছে। এর সাথে আবার শিশুর জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী এবং মৃত্যু দিবস পালনের মত অনেক অনৈসলামিক প্রথা এবং উৎসব পালন করতে গিয়ে অযাচিত ভোগব্যয় করা হয় যা ইসলামী শিক্ষার সাথে বেমানান এবং সম্পদের অভাব রয়েছে এমন একটি সমাজের জন্য অপ্রত্যাশিত। এসব জীবন পদ্ধতির শিকার হয়ে মানুষকে স্বীয় সামর্থের বাইরে জীবন যাপনে বাধ্য হতে হয়। এভাবে সমাজের মোট ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়। সঞ্চয় অপ্রতুল হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদের উপর ভিত্তি করে যথেষ্ট পুঁজি গঠন হয় না। তদুপরি যেহেতু অধিকাংশ বিলাস সামগ্রী ও সেবা হচ্ছে বিদেশী, সেহেতু বৈদেশিক মুদ্রার উপর চাপ সৃষ্টি হয় অনেক বেশি । এভাবে সম্পদের ঘাটতি বৈদেশিক ঋণ দ্বারা পূরণ করতে হয়। বৈদেশিক ঋণের উপর সুদের বোঝা বাড়ে এবং বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের সংকোচন দেখা দেয়।

প্রয়োজন পূরণকে উদার করা

উদারীকরণ হতে হবে প্রয়োজন ও বিলাসীতার সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী মূল্যবোধ কাঠামোর মধ্যে। নৈতিক সংশোধন মূল্যব্যবস্থাকে পূর্ণতা দান করতে পারে। কেননা নৈতিক সংশোধনের ফলে ধনীরা স্বেচ্ছায় তাদের অপ্রয়োজনীয় ভোগের পরিমাণ কমাতে পারে। যুদ্ধের আগে জাপান, তাইওয়ান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মত দেশগুলিতে সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ উন্নয়নের আশায় আশায় নিয়ন্ত্রিত ছিল। তেমনিভাবে মুসলিম দেশগুলিতেও থাকতে পারে। দূরপ্রাচ্যের এসব দেশে যুদ্ধকালীন সময়ে জনগণ যে কৃচ্ছতা পালন করেছিলো, ভোগের ক্ষেত্রে সে রকম সংযম প্রদর্শনের আবেগ সমাজে সৃষ্টি করা যেতে পারে।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির এরূপ একটি পরিবর্তন ব্যতীত ভোগ কমানোর জন্য ব্যবস্থা নিলে লোকেরা বাধ্যবাধকতা অনুভব করতে পারে। এরূপ পরিবর্তন আনয়নের ক্ষেত্রে দুটি পদক্ষেপ সাহায্য করতে পারে। প্রথমত, ইসলামী মূল্যবোধকে সমাজে আত্মীকরণের জন্য শিক্ষার সকল মাধ্যমে সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো যেতে পারে যেন লোকেরা মনে করে ইসলামী সরল জীবন-যাপন না করাটা একটা সামাজিক লজ্জার ব্যাপার। এ জন্য যেহেতু অনেক সময় লাগবে, সেহেতু প্রাথমিক পর্যায়ে অনাড়ম্বর জীবন যাপনের জন্য ব্যাপক প্রচারণা

Dhaka University Institutional Repository

চালানোর পাশাপাশি দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে বিলাসীতা, অপ্রয়োজনীয় সামাজিক উৎসব, অতিরিক্ত যৌতুক প্রদান এবং সামাজিক মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য ব্যয়ের উপর রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে। মুসলিম দেশগুলোতে বড়লোকী জাহির করার মানসিকতাসম্পন্ন জীবন যাপন পদ্ধতি একটি সাধারণ ব্যাপার যা কিনা দূর্নীতির অন্যতম কারণ। অতএব দূর্নীতির এ প্রধান শিকড় সমূলে উৎপাটন প্রথম পদক্ষেপেই না করলে সরকারগুলি তাদের দেশ থেকে দূর্নীতি দমনের যে পদক্ষেপই গ্রহণ করুক না কেন তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন পদ্ধতি ব্যক্তিকে অসদুপায় অবলম্বন করে অর্থ রোজগারের জন্য বলতে গেলে প্রায় বাধ্য করে। অসদুপায়ে কিছু অর্জন বা দূর্নীতি অনেক লোকের মধ্যে কমে আসতে পারে যদি একবার তারা অনুভব করে যে, বড়লোকী ধরণের চালচলনের দ্বারা বেশি বেশি মর্যাদা অর্জনের চেষ্টার ফলে তাদের সুনাম নষ্ট হচ্ছে এবং তাদের আয়ের উৎস সম্পর্কে সমাজে প্রশ্ন উঠছে। সরকারী অর্থায়নের সংস্কার সাধণ করতে হবে, সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার চিহ্নিত করতে হবে।

সরকারী ব্যয়ের নীতিমালা

উপরে বর্ণিত চারটি ক্ষেত্রেই সমস্যা সমাধানে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি আস্থা এবং বিশেষ করে ইসলামী লক্ষ্য অর্জনের প্রতিশ্রুতি যথাযথ সাহায্য করতে পারে। শুধু তাই নয়, এটা সরকারী ব্যয়ের অগ্রাধিকার নির্ণয় করে ব্যয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান বিতর্কিত অবস্থার অবসান ঘটাতে পারে। নিম্নবর্ণিত ছয়টি বড় নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে ইসলামী লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনা পুনরায় বাড়ানো যায়। এগুলি মুসলিম শাস্ত্রবিদগণ শতাব্দীকাল ধরে তৈরি করেছেন যেন ইসলামী শাস্ত্র একটি যৌক্তিক এবং ধারাবাহিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে (যা সকল সময়ের উপযোগী করে ব্যবহার করা যাবে)।

(১) জনগণের কল্যাণ সাধন করাই হবে সকল ব্যয় বরাদ্দের মূল নীতি (আর্টিকেল ৫৮)

(২) আরামের চাইতে দুঃখ দুর্দশা দূর করার বিষয়টি প্রাধান্য পাবে (আর্টিকেলস ১৭, ১৯-২০ এবং ৩০-৩২)

(৩) অধিকাংশ লোকের বৃহৎ স্বার্থ অল্প সংখ্যক লোকের ক্ষুদ্র স্বার্থের উপর প্রাধান্য পাবে (আর্টিকেল ২৮)

(৪) রাষ্ট্রীয় ত্যাগকে রক্ষা করতে ব্যক্তিগত ত্যাগ বা ক্ষতি মেনে নিতে বাধ্য করতে হবে এবং বড় ধরণের ত্যাগ বা ক্ষতি এড়াতে হবে ক্ষুদ্র ত্যাগ বা ক্ষতি স্বীকার করার মাধ্যমে (আর্টিকেলস ২৬-২৮)

(৫) যে কেহ উপকার পেয়ে থাকুক না কেন তাকে অবশ্যই খরচ বহন করতে হবে (আর্টিকেলস ৮৭-৮৮)

(৬) এমন কোন কিছু যা না হলে যথার্থ প্রয়োজন পূরণ হয় না তার সরবরাহও অত্যাবশ্যক গণ্য করতে হবে।

কর সংস্কার

ব্যয়ের খাত পুনঃনির্ধারণ করার মাধ্যমে ব্যয় কমাতে হবে। ব্যয়ের নীতি হিসেবে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় কর পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। উচ্চতর রাজস্ব আয় এবং বেশি পরিমাণ ইকুইটি আদায়ের স্বার্থে কর পদ্ধতির সংস্কার করতে হবে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত মুসলিম দেশগুলোতে খুব বেশি কর ধার্য করা নেই। বরং কম কর ধার্য করা আছে। করের ভিত্তি সংকুচিত বলে কর হার বেশি । করের ভিত্তি, করের হার এবং দুর্নীতি

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে একটি দুষ্ট চক্রের অংশ বিশেষ। করের ভিত্তি যত সংকীর্ণ হবে করের হার অবশ্যই তত বেশি হবে কাংখিত পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতে। কর হার যত বেশি দুর্নীতি করার উৎসাহ তত বেশি থাকবে। এই দুষ্ট চক্র শুধু মাত্র অর্থনৈতিক বিশৃংখলার জন্ম দেয় না, পরোক্ষ করের উপরও নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে। এটা সর্বজনবিদিত ঘটনা যে বিত্তবানরা বিশাল অংকের কর ফাঁকি দেয় এবং সংখ্যায় তারা কম। অথচ গরীব লোক সংখ্যায় বেশি । কর ব্যবস্থাকে পরোক্ষ রিগ্রেসিভ করের উপর নির্ভর করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। সম্পূর্ণ কর ব্যবস্থা এবং কর আদায়ের কৌশল সংস্কার করা অত্যন্ত জরুরী।

ইসলামী উপায়ে ঘাটতি পূরণ

সরকারী খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে বেশি দক্ষতা অর্জনে সুদের বিরুদ্ধে ইসলামের নিষেধাজ্ঞা বেশ উপকারী বলে প্রমাণিত হওয়া উচিত। যেহেতু কেবলমাত্র ইমার্জেন্সী অথবা চরম দুঃসময়ে সুদ ভিত্তিক ঋণ অনুমোদিত হতে পারে সেহেতু সরকারকে অবশ্যই তাদের ট্যাক্স রাজস্ব বাড়াতে হবে যেন সরকার তাদের চলতি এবং অনুৎপাদিত ব্যয়ভার বহন করতে পারে। যেহেতু ট্যাক্স রাজস্ব কতটুকু বাড়ানো যাবে তার একটা সীমা আছে সেহেতু সরকার খুব একটা বেশি কিছু করতে পারবে না। অপচয়মূলক এবং অপ্রয়োজনীয় চলতি ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সরকারগুলোকে বাধ্য করতে হবে। সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য ও সেবার মূল্য আরোপ করা হবে খরচ আদায় পদ্ধতির মাধ্যমে।

সরকার প্রদত্ত নমুনা অনুযায়ী প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অর্থায়নকৃত ও নির্মিত বেসরকারী খাতের অবকাঠামোগত প্রকল্প সরকার বেশি বেশি করে লীজ নিতে পারে। তাতে বেসরকারী খাতের উপকার হতে পারে। লাভজনক প্রকল্প নির্মাণে অংশগ্রহণ করার জন্য সরকার বেসরকারী খাতকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে। এসব প্রকল্প এমন ধরণের যে এগুলো বাস্তবায়নের জন্য পুরোপুরি বেসরকারী খাতের উপর নানা কারণে ছেড়ে দেয়া যায় না। বেসরকারী খাতে সমাজহিতৈষী ব্যক্তিবর্গকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, গরীবদের জন্য গৃহ নির্মাণ, এতিমখানা এবং অন্যান্য সমাজ সেবামূলক কাজ যতবেশী সম্ভব নির্মাণ এবং পরিচালনা করার জন্য সরকার উৎসাহ যোগাতে পারে। এজন্য মুসলিম ইতিহাসে সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এমন দাতব্য সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান পুনরুজ্জীবনের জন্য সরকার বাস্তব পদক্ষেপ নিতে পারে।

যেহেতু ঋণের জন্য কোন কিছু ত্যাগ করা শেষ পর্যন্ত দরকার হয় না সেহেতু সুদের নিষিদ্ধকরণ আশীর্বাদ বলে প্রমাণিত হতে পারে। কারণ এর ফলে দীর্ঘ সময় ধরে ঋণের সুদ পরিশোধের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। এটা স্বল্পমেয়াদী সরকারী ব্যয়ের উপর যে বাধা আরোপ করবে তা পুষিয়ে যাবে সরকারী খাতে শৃংখলা ফিরে আসার ফলে টেকসই এবং ক্রমাগত অর্থনৈতিক উন্নতি, সরকারী ও বেসরকারী খাতের মধ্যে সহযোগীতা এবং অভ্যন্তরীণ বৈদেশিক ঋণ বহনের জন্য খরচের বোঝা কম হতে পারে বিধায়।

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগ পরিবেশ পুর্নগঠন

বিনিয়োগ পরিবেশ পুর্ণগঠন করতে হবে শুধু সঞ্চয় করলেই হবে না বরং তা বিনিয়োগ করতে হবে। এ দায়িত্ব কতটুকু অত্যাবশ্যক তা বুঝা যাবে যদি আমরা বুঝতে চেষ্টা করি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উৎপাদন প্রচেষ্টা ও বিনিয়োগকে কতটুকু উৎসাহিত করেছেন একথা বলে:

"যদি একজন মুসলমান একটি বৃক্ষ রোপন করে বা একটি জমি চাষ করে, যেখানে থেকে একটি পাখি বা একটি জন্তু অথবা একজন মানুষ খাদ্য খেয়ে থাকে, তবে ঐ খাদ্য দয়ার দান হিসেবে বিবেচিত হবে।" (বুখারী) রাসূল (সাঃ) অপ্রয়োজনীয় বিনিয়োগকে নিন্দা করেছেন এই বলে: "বিনা প্রয়োজনে যে একটি বাড়ী বিক্রি করেছে, কিন্তু বিক্রয়লব্ধ অর্থ অনুরূপ কোন খাতে বিনিয়োগ করেনি আল্লাহ ঐ অর্থের বরকত দান করবেন না।" (বুখারী) খলিফা উমর সচারাচর বলতেন, "যার সম্পদ আছে তাকে তা বাড়াতে দাও এবং যার জমি আছে তাকে তা চাষ করতে দাও।"[৫১]

রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা

রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা হচ্ছে দারিদ্র, আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতির ফসল। এর তাৎক্ষণিক কোন সমাধান নেই।[৫২] তবে ইসলাম ও গণতন্ত্রের প্রতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি, স্থিতিশীল নীতি ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা লাভে সাহায্য করতে পারে।

এছাড়া মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ এবং মুদ্রা অবমূল্যায়ন বোধ, আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

বৈদেশিক পুঁজি

সুদের উপর ইসলামের নিষেধাজ্ঞা মুসলিম দেশগুলির জন্য সুদবিহীন বৈদেশিক পুঁজিকে উৎসাহিত করা এবং সুযোগ সুবিধা দান করার বিষয়টিকে অপরিহার্য করে তুলছে। এ ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে আকাংখিত কারণ "উন্নয়নগামী দেশের জন্য সুদবিহীন পুঁজির বিনিয়োগ উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে," এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে এই পুঁজি আকষণ করা সম্ভব হতে পারে।[৫৩] প্রয়োজন ভিত্তিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দিতে হবে।

বেকার এবং ছদ্মবেকারের জন্য একটি নতুন প্রস্তাব

ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে অন্যতম গঠনমূলক পন্থা হলো সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার মেধা ও যোগ্যতা অনুসারে দক্ষতার সাথে উৎপাদনমূলক কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দান করা। বেকার এবং ছদ্ম বেকারত্বের বর্তমান উচ্চ হার যদি বজায় থাকে তবে এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা যাবে না। বেকারত্ব এবং ছদ্ম বেকারত্ব ঘুচানোর জন্য প্রধানত যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তা হচ্ছে সামাজিক মোট চাহিদা বৃদ্ধি এবং শ্রমঘন বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প কারখানা গড়ে তোলা।

ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের উন্নয়ন

ইসলামী শিক্ষার আলোকে অর্থনৈতিক সংস্কারের আলোচনায় হাছানুল বান্না কুটীর শিল্পকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি গুরুত্ব সহকারে বলেছেন, ঐ শিল্প গরীব পরিবারগুলির সদস্যদের জন্য উৎপাদনশীল

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং বেকারত্ব ও দারিদ্র্য হ্রাস করবে।[৫৪] ডঃ মোহাম্মদ ইউনুছ ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের অন্য দিকের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন এই বলে যে, দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য মজুরী ভিত্তিক নিয়োগ সুখকর কোন ব্যাপার নয় এবং আত্মকর্মসংস্থান একজন ব্যক্তির সম্পদের ভিত্তি মজবুত করার ক্ষেত্রে মজুরী ভিত্তিক নিয়োগের চেয়ে বেশি শক্তিশালী।[৫৫]

বর্তমানে এমন একটি বোধ ক্রমশ জাগ্রত হচ্ছে যে, "বড় আকারের 'আধুনিক' শিল্পায়ন কৌশল বিশ্বময় বেকারত্ব ও দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।[৫৬] মিশিগান ষ্টেট ইউনিভার্সিটি কর্তৃক কয়েকটি দেশের মধ্যে পরিচালিত সমীক্ষায় পণ্ডিতরা পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করেছেন যে, ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখতে পারে। তারা সরাসরি নতুন কাজই সৃষ্টি করে না, পণ্য ও সেবা, কাঁচামাল এবং রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে আরও বৃদ্ধি করে থাকে।

মুসলিম দেশগুলিতে সঞ্চয় ও পুঁজি বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বিকেন্দ্রীকরণের প্রতি গুরুত্ব আরোপের নীতি এবং গ্রামীণ ভূমিহীনদের বিরাট অংশ এবং গ্রামীণ পরিবারের স্ত্রী, মাতা-পিতা এবং সন্তানদিগকে ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পে নিয়োগ করা খুব কার্যকর পন্থা হতে পারে।[৫৭] বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ উন্নয়নকে সমর্থন যোগাতে পারে। এর ফলে শহর এলাকা অভিমুখী জনস্রোতও বন্ধ হতে পারে। এই নীতি পারিবারিক সংহতি বজায় রাখা এবং নৈতিক মান উন্নয়নে এবং অপরাধ দমনে সাহায্য করতে পারে, যেগুলি হচ্ছে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলির মধ্যে অন্যতম।

৪. আর্থিক পুনর্গঠন

ক্ষুদ্র[৫৮] ও কুটীর শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে পল্লী ও শহর এলাকায় বেকারত্ব, সম্পদের কুক্ষিগত হওয়া দূরীকরণ এবং আয় বৃদ্ধি করা এবং মানুষের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে যদি না ঐ শিল্পে অর্থায়নের আয়োজন করা না হয়ে থাকে। ক্ষুদ্র খামার ও কুটীর শিল্পের উন্নয়নে অর্থায়নের অভাব মারাত্মক বাধা সৃষ্টি করে থাকে। কাজ করার অনীহা কিংবা দক্ষতার অভাবে গরীবরা গরীব নয়। বস্তুতঃ তারা ধনীদের চাইতে কঠোর পরিশ্রম করে এবং বেশি দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে।

তাদের আসল সমস্যা হলো আত্মকর্মসংস্থানের জন্য তাদের যে আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন তা তারা পায় না। অথবা তাদের মজুরী ভিত্তিক কাজ তাদের দক্ষতাকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারেনি বা যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজন পূরণের পর তাদেরকে সঞ্চয় করে বিনিয়োগ করার সুযোগ দান করেনি। একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক এবং সামাজিক হাতিয়ার এবং একজন ব্যক্তির ক্ষমতার ভিত্তি, সামাজিক মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক অবস্থা রচনা করার ক্ষেত্রে অর্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সুতরাং ড. মোহাম্মদ ইউনুছ ঠিকই বলেছেন যে, "আত্মকর্মসংস্থানের জন্য অর্থকে অধিকার হিসেবে দেখতে হবে যা দ্বারা অন্যান্য সকল মানবাধিকার অর্জিত হয়।"[৫৯] আর্থিক খাতের সংস্কার সকল আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংস্কারের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করে।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুধার উপর নির্বাচিত কমিটি বলেছে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতিতে অপ্রচলিত খাতের ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানে অল্প পরিমাণ ঋণ সরবরাহ গরীবদের জীবন যাপনের মান যথেষ্ট বাড়িয়ে তুলতে পারে। শুধু তাই নয়, খাদ্য নিরাপত্তা ও স্থানীয় অর্থনৈতিক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন ঘটাতে পারে। ঐ কমিটি আরও বলেছে যে, শুরুতেই নতুন উদ্যোক্তাকে অর্থায়ন করার মাধ্যমে ক্ষুধা এবং দরিদ্র্যতার চক্র সমাপ্ত করতে উন্নয়নশীল দেশগুলির শহর এবং গ্রামীণ ভূমিহীনদেরকে সাহায্য করার একটি পন্থা হতে পারে। সে যাই হোক, কমিটি বলেছে "গরীবদের মালিকানাধীন আয় বর্ধনমূলক প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নের বিষয়টি এসব দেশের সংগঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি তেমন একটা স্বীকৃতি দেয় না।[৬০] এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৬ষ্ঠ বৃহত্তম ব্যাংক মর্গান গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোম্পানী বলেছে যে, উন্নয়নশীল দেশের ব্যাংকিং পদ্ধতি ক্ষুদ্র কোম্পানীগুলোকে সংগঠিত করতে কিংবা প্রথমে ঝুঁকিপূর্ণ পুঁজি যোগান দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তারা নগদ অর্থের মালিক এরকম অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানকে অর্থ যোগান দিয়ে থাকে।[৬১]

এক্ষেত্রে যেটা প্রয়োজন বানিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অর্থ আপামর জনসাধারণের কল্যাণে ব্যয় করা উচিত।[৬২] এছাড়া ব্যাংক ব্যবস্থার ইসলামীকরণ এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে অর্থায়ন করতে হবে। কারণ সম্পদের দক্ষতাপূর্ণ ও ন্যায়ানুগ বরাদ্দকরণে এরূপ সংস্কারের বিরাট অবদান থাকবে। ছাত্রদের অধিকতর ভাল মুসলিম এবং উৎপাদনক্ষম করে গড়ে তুলতে শিক্ষা পদ্ধতির একটি আগাগোড়া সংস্কার প্রয়োজন।

ছয় মাসে, নয় মাসে কিংবা বছরে বছরে নীতি পরিবর্তন হওয়া উচিত নয়। কারণ একটি দেশের সম্পদের প্রেক্ষাপট, প্রয়োজনীয়তা এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঘন ঘন পরিবর্তন হয় না। নীতির সাথে হরহামেশা নতুন কিছু যোগ করলে অনিশ্চয়তা বাড়ে এবং তারাই লাভবান হয় যাদের এ ধরণের পরিবর্তনকারী আভ্যন্তরীন নীতি নির্ধারকদের প্রবনতা সম্পর্কে ধারণা থাকে। কিন্তু পরিকল্পনা তৈরি করতে যে সকল ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে সেগুলো দেরী না করে খোলা মনে সংশোধন করে ফেলা উচিত। যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন মুসলিম দেশের সম্পদ সম্ভার ভিন্ন ভিন্ন রকম, সেহেতু প্রত্যেকের একই কৌশল বা নীতি হবে না বরং বিস্তারিত অর্থে একটু ভিন্ন হবে বৈ কি। তবে যে বিষয়টি সকল নীতি কৌশলের ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হবে তা হলো একই ধরণের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের আবশ্যকতা।

রাজনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী কলাকৌশল

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ব্যর্থতা এবং যেখানে ইসলাম ন্যায় ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য একটি কার্যক্ষম কলাকৌশল এমনকি ঐ ধরণের প্রবৃদ্ধির জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং প্রয়োজনসমূহ পূরণ করতে সক্ষম হয় তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় ঃ কেন মুসলিম দেশসমূহ এ ধরণের কলাকৌশলের আলোকে নীতি সমূহ সংগঠিত ও প্রয়োগ করতে রাষ্ট্র ব্যর্থ হচ্ছে?

যদি ইসলাম ন্যায় ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য একটি কার্যক্ষম কলাকৌশল এমনকি ঐ ধরণের প্রবৃদ্ধির জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং প্রয়োজনসমূহ পূরণ করতে সক্ষম হয় তাহলে প্রশ্ন দাড়ায় ঃ কেন মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

দেশসমূহ এই ধরণের কলাকৌশলের আলোকে নীতিসমূহ সংগঠিত ও প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হলো? এটা একটা কঠিন প্রশ্ন। ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিকসহ অসংখ্য উপাদান সহকারে সম্ভবতঃ অযত্র পরিমাণে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যা এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করে। প্রকৃতপক্ষে এ প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ এবং এ ধরণের উদ্যোগ এ গবেষণার বাইরে। যাহোক, আমরা রাজনৈতিক উপাদানের মত একটি উপাদান চিহ্নিত করব এবং তার উপর জোর দেব যা আমাদের মত মুসলিম দেশসমূহে ন্যায়পরতার সাথে উন্নয়নের কলাকৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য দায়ী একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

শক্তিশালী রাজনৈতিক শৃংখলা প্রয়োজন

যতক্ষণ পর্যন্ত না জনসাধারণ, যারা নানাবিধ বৈষম্যের কারণে কষ্ট পেয়েছে, যে নীতিসমূহ তাদের কল্যাণে কাজ করে তা প্রণয়নে তাদের কোন বক্তব্য না থাকে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে নীতিসমূহের বাস্তবায়নের জন্য প্রেরণা হিসেবে কাজ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত ন্যায়পরতার সাথে উন্নয়ন খুব সামান্যই আশা করা যায়। হাসান আল বান্না সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন যে, সরকার হলো আর্থ-সামাজিক সংস্কারের প্রাণ কেন্দ্র। যদি তারা দূর্নীতি পরায়ণ হয় তবে তারা প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই দূর্নীতি ঢুকিয়ে দিতে পারে এবং সংস্কারবাদী হয় তবে প্রত্যেক জিনিসকে তারা সংস্কার করতে পারে।[৬৩]

যাহোক, যদি না জনসাধারণ মুক্তভাবে রাজনীতিতে অংশ করার সুযোগ পায়, তবে সরকার ন্যায়পরতার সাথে উন্নয়ন ঘটাতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে কমই সক্ষম হবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, ইসলামী বিশ্বে এ ধরণের আদর্শ রাজনৈতিক বাস্তবতার বড়ই অভাব। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ইসলামী প্রতিষ্ঠান ছিল খিলাফত, এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা রাজনীতিতে আদর্শ আকারে প্রতিফলিত হতো।[৬৪] খিলাফতের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে স্বৈরাচারী এবং বংশানুক্রমিক রাজত্বের ধারার সংমিশ্রণে অপসারিত হয় যা শুরায় ইসলামী গণতান্ত্রিক ধারা থেকে সামান্যতম শিক্ষাও গ্রহণ করেনি। ফলে সময়ের আবর্তনে এ ধরণের আইনে দূর্নীতিতে প্রশাসন ভরে যায়।

একটি ত্রুটিমুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপরেখা

একটি ভাল সরকার গঠনের জন্য ইসলামের নিজস্ব রূপরেখা রয়েছে। ঐ রূপরেখার প্রথম কথা হচ্ছে যে, সরকার আল্লাহর নিকট দায়বদ্ধ। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট সরকারকে জবাবদিহি করতে হবে। কেননা আল্লাহই হচ্ছেন চূড়ান্ত অর্থে একমাত্র স্বাধীন সার্বভৌম স্বত্তা যিনি যুগে যুগে নবী রসূল প্রেরণের মাধ্যমে মানুষের আচার-আচরণের রূপরেখা তথা আইন প্রদান করেছেন। তার মানে হলো সরকারের কর্তৃত্ব হচ্ছে সীমিত এবং কিছুতেই নিরঙ্কুশ নয়। সুতরাং প্রথমেই সরকারকে ইসলামী শরীয়তের বিধান মেনে চলতে হবে। প্রয়োজনীয় সম্পদের দক্ষ ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য সরকারকে ব্রতী হতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন:

Dhaka University Institutional Repository

"তোমাদের প্রত্যেকে এক একজন রাখালের মত যাকে তার অধীনস্থদের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।"[৬৫]

"যাকে জনগণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যদি সে তা বিশ্বস্ততার সাথে পালন না করে তবে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।"[৬৬]

"শেষ বিচারের দিন আল্লাহর নিকটতম এবং প্রিয় ব্যক্তি হবে ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং হতভাগ্য যালেম শাসক আল্লাহর নিকট থেকে দূরে থাকবে।"[৬৭]

দ্বিতীয়ত, শাসকগণকে হতে হবে জনগণের নিকট দায়বদ্ধ। কেননা সরকার হচ্ছে একটি ট্রাষ্ট মাত্র। এই ট্রাষ্ট আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং জনগণের পক্ষ থেকেও। জনগণ তাদেরকেই এই ট্রাষ্ট পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে থাকে যারা জনগণের প্রয়োজনীয় সকল কিছুর ব্যবস্থাপনা করে থাকে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই ধারণাটি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন, আবু যার (রাঃ) এর নিকট, যখন তিনি সরকারী উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হতে চেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, আবু যার! এই পদ হচ্ছে একটি ট্রাষ্ট। কিন্তু তুমি দুর্বল। শেষ বিচারের দিন এটা দূর্ভাগ্যের কারণ হবে না তার জন্য যে যোগ্যতা বলে ঐ পদ অর্জন করবে এবং তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে।[৬৮] অতএব, যেখানে সরকার ট্রাষ্টের গণ্ডীর মধ্যে থেকে সফলতা কিংবা বিফলতার জন্য আল্লাহর নিকট দায়বদ্ধ থাকে, সেখানে ঐ সরকার জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকে ট্রাষ্টের আলোকে জনগণের আশা-আকাংখা পূরণ করতে।

মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, সাধারণ মানুষের সমালোচনা ও পরামর্শ ব্যতীত সরকার জনগণের আশা আকাংখা পূরণের জন্য কাংখিত ভূমিকা পালন করতে পারেনি। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এই বলে যে, মুসলিম বিশ্বাসের একটি প্রয়োজনীয় দিক হচ্ছে তাদের শাসককে পরামর্শ প্রদান করা- এমন পরামর্শ যা তাদের শাসককে যথাযথ দায়িত্ব পালনে সহায়তা করতে পারে।[৬৯]

উল্লিখিতভাবে ইসলাম উন্নয়ন, রাজনৈতিক উন্নয়ন, আর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং উন্নয়নের ইসলামী ধারণা ও কলাকৌশল আলোচনা শেষে বলা যায় যে, ইসলাম মানব জীবনের সকল দিকের সঠিক ব্যাখ্যাকারী এক পরিপূর্ণ জীবনবিধান। ইসলামের উন্নয়নের ধারণার সঠিক অনুসরণই পারে মুসলিম বিশ্বের কাঙ্খিত উন্নয়ন অর্জনে সহায়তা করতে। আর তাদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে পাশ্চাত্যে সভ্যতা ইসলামী উন্নয়ন কৌশল অবলম্বতা করে সারা বিশ্বকে উন্নত করতে সক্ষম হবে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

তথ্য নির্দেশিকা

১। Isiah Berlin "*The two concepts of Liberty*" 1995.

২। Mawdudi, Sayyid Abul A'la, *Islam Parichiti*, Published by Adhunik Prokashani, Dhaka, P.1.

Dhaka University Institutional Repository

৩। Bhuiyan, Md. Shafiul Alam, *The Fundamental Principles of Islamic Political System*. A Brief Overview. ড. ইউ এ. বি. রাজিয়া আকতার বানু সম্পাদিত Bangladesh Journal of Islamic Thought, (BIIT). p.68.

৪। প্রাগুক্ত।

৫। Hans Wehr, *A Dictionary of Modern written Arabic*, Macdonald & Evens Ltd., London, P. 424.

৬। আল-কুরআন, (২:১৩১-৩২)

৭। Bhuiyan, Md. Shafiul Alam, The Fundamental Principles of Islamic Politcal System. A Brief Overview. প্রাগুক্ত।

৮। *সহীহ বুখারী ও মুসলিম*।

৯ । প্রাগুক্ত।

১০। প্রাগুক্ত।

১১। *আল-কুরআন*, (৩:১৯)

১২। *আল-কুরআন*, (২২:৭৮)

১৩। *আল-কুরআন*, সূরা আল-মায়েদা, আয়াত-৩।

১৪। আজম, প্রফেসর গোলাম, *Political thoughts of Abul A'la Mawdudi*" Shotabdi Prokashoni, Dhaka, 2002, P.12.

১৫। *আল-কুরআন*, সূরা-আল-বাকারা, আয়াত ২০৮।

১৬। বাদাবী, জামাল আল, *ইসলামী শিক্ষা সিরিজ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২।

১৭। Huq, Kazi Noorul, "*Islamic Administration*" P.1, (Unpublished).

১৮। প্রাগুক্ত।

১৯। তালিব, আবদুল মান্নান, *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ১।

২০। British policy and the Muslims in Bengal 1757-1856 by Dr. Azizur Rahman mallick.

২১। The Indian Mussalmams by W.W. Hunter.

২২। Wolfgang Sachs, *Introduction in the Development Dictionary : A Guide to Knowledge as Power ed.*, Wolfgang Sachs, London, Zed books ltd., 1992, P.1.

২৩। Wolfgang Sachs, ibid., P.1

Dhaka University Institutional Repository

২৪। Human Development Report. 1992, New York:\United Nations Development Programme, 1992.

২৫। The Guardian, London, April 25, 1992.

২৬। খালদুন, ইবনে, মুকাদ্দিমাহ, প্রিন্সটন, ১৯৬৯।

২৭। Gunar Myrdal, *Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations'* Abrdged (London : Allen Lane Penguine Press, 1972) P. 50

২৮। Ann Mattis (ed) *A society for Internation at Developmet: Perspectives 1984* (Durban: Duke University press. 1983), P. xiii

২৯। L.W. Pye, *Aspects of Political Development*, P. 71-88.

৩০। ibid., P. 65.

৩১। S.M. Lipset, "*Some Social Requisite of Democracy. American Political Science Review*: 53 March 1959. P. 69-105.

৩২। Philips Cutright, "*National Political Development in Nelson W. Polsbyet's Politics and social life*, Boston Houghton Mifflting, 1963, P. 57.

৩৩। G.M. Meir and Boldwin. Economic Development, theory H. story. Policy.

৩৪। আমিন, এম রুহুল অনূদিত *ইসলাম ও একটি নয়া আন্তজার্তিক অর্থব্যবস্থা*, পৃ: ১৫০

৩৫। প্রাগুক্ত পৃ: ১৫১।

৩৬। চাপরা, ড. এম উমর, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, বি.আই,আই,টি ঢাকা,২০০০, পৃ:২১।

৩৭। প্রাগুক্ত পৃ: ২৩।

৩৮। ফ্রান্সিস স্টুয়ার্ড, *বেসিক-নিডস ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ*, বাল্টিমোর,মিরল্যান্ড: দি জন হপকিনস ইউনিভার্সিটি প্রেস,১৯৫৩)

৩৯। চাপরা, ড. এম উমর '*ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*'. পৃ:২৬।

৪০। প্রাগুক্ত, পৃ:২৮।

৪১। Millikan, Max F, "*A strategy of Development*", *in UN: The case for Development New York*: Praeger Special Studies, 1973, P: 25

৪২। আহমদ, প্রফেসর খুরশিদ, *উন্নয়ন ও ইসলাম* পৃ:২০।

৪৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩।

৪৪। চাপরা. ড. এম উমর, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, বি.আই.আই.টি. ঢাকা, ২০০০, পৃ:৮৩।

৪৫। মারওয়ান, ইব্রাহীম আল কায়সী, *মোরালস এ্যান্ড মেনারস ইন ইসলামঃ গাইড টু ইসলামিক আদব*। লেস্টার, ইউকে; দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন,১৯৮৬ পৃ: ১৩-৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪৬। আবদ আল সালাম আল আব্বাদী, *আল মিলাকিয়াহ ফি আল শরীয়াহ আল ইসলামিয়াহ* (আম্মান, জর্দান: মকতবা আল আকসা ১৯৭৪-১৯৭৫, খন্ড ২, পৃ: ৪০০।

৪৭। ইউ এস, হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস, *রিপোর্ট অব দি সিলেকট কমিটি অব হায়ার ব্যাংকিং ফর দি পুওর: এলিভিয়েটিং পোভার্টি থ্রো ক্রেডিট এসিস্ট্যান্ট টু দি পুওরেস্ট মাইক্রো এন্টারপ্রেনার্স ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ* (ওয়াশিংটন, ডি.সি.ইউ.এস গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং অফিস, মে ১৯৮৬,পৃ: ১।

৪৮। *হোয়েন দি সল্ট অব দি আর্থ লুজেস ইটস সেভর ইকনোমিস্ট*, ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪,পৃ: ৪৩-৪৪।

৪৯। আবদুর রহমান আল জাজিরি, *কিতাব আল- কি কাহ আলা আল- মাধাবী আল- আরাবাহ* (কায়রো : আল-মকতবাহ আল-তিজারাহ আল- কুবরাহ, ১৯৩৮) খন্ড ৩, পৃ: ৩-২০ এবং খন্ড ২ পৃ: ৩০২-১৮।

৫০। চাপরা, এম. ইউ, *টুয়ার্ডস এ জাস্ট মনিটারী সিস্টেম*, পৃ. ১১০-১৪০।

৫১। হাইকাল, এম,এইচ, আল- ফারুক ওমর কায়রো: *মকতবা আল-নাহদা আল মিসিরিয়া* (১৯৬৪), খন্ড ২, পৃ:২২৯।

৫২। চাপরা ড. এম উমর, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*" প্রাগুক্ত পৃ: ১২৫।

৫৩। আই বি আর ডি, *ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট* ১৯৮৫, পৃ:১২৫।

৫৪। বান্না, হাসান আল, *মাজমু আত রাসাইল আল-ইমাম আল শহীদ হাসান আল বান্না* (আলেকজান্দ্রিয়া দার আল দাওয়াহ, ১৯৮৯) পৃ: ২৬৭।

৫৫। ইউনুস, মোহাম্মাদ,"*দি পুওরস এজ দি ইঞ্জিন অব ডেভেলপমেন্ট*", ওয়াশিংটন কোয়াটারলী, হেমন্ত ১৯৮৭, ইকনোমিক ইমপ্যাক্ট, ২ (১৯৮৮), পৃ: ৩১।

৫৬। কার্ল লিডহোম এবং মেইড, ডোনাল্ড,"*স্মল স্কেল ইন্টারপ্রাইজঃ এ প্রোফাইল*" "*স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ ইন ডেভেলপিঙ কান্ট্রিজ ইর্ম্পিরিকাল ইভিডেন্সেস এন্ড পলিসি ইমপ্লিকেশন*, মিসিগান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ডেভেলেপমেন্ট পেপার, ইন ইকনোমিক ইমপ্যাক্ট, ২(১৯৮৮), পৃ: ১২।

৫৭। চাপরা, উমর "*ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*" প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৩।

৫৮। সুমেকার, স্মল ইজ বিউটিফুল (লন্ডনঃ ব্লাড এন্ড ব্রিগচ, ১৯৭৩), পৃ: ১৮।

৫৯। ইউনুস মোহাম্মদ, *দি পুওর এজর্দি ইঞ্জিন অব গ্রোথ*," প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১।

৬০। *রিপোর্ট অব দি সিলেক্ট কমিটি অন হাংগার* (১৯৮৬)।

৬১। *মর্গান গ্যারান্টি ট্রাস্ট কোম্পানী অব নিউ ইয়র্ক*, ওয়ার্ল্ড ফিনানসিয়াল মার্কেট, জানুয়ারী (১৯৮৭) পৃ:৭।

৬২। ভাট, ভি ভি, '*ইমপ্রভিং দ্যা ফিন্যানসিয়াল স্ট্রাকচার*' ফিন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট, জুন ১৯৮৬, পৃ: ২০।

৬৩। হাছান আল বান্না, *মাজমুআত রাসালি*, পৃ. ২৫৫।

৬৪। শুরা থেকে উত্তরাধিকার এবং স্বৈরাচারী শাসনে পরিবর্তন ঘটাতে যেসব বিষয় খুব প্রভাবশালী ছিল সেগুলির সর্বোত্তম বিশ্লেষণ সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন, সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, *খিলাফত ওয়া মুলকিয়াত* (লাহোর; ইসলামিক পাবলিকেশনস, ১৯৬৬), পৃ. ১০৩-১৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

৬৫। *সহীহ বুখারী ও মুসলিম*।

৬৬। *সহীহ বুখারী*, কিতাব আল আহকাম।

৬৭। *সুনানে তিরমিজি*।

৬৮। *সহীহ মুসলিম*, কিতাব আল আমারাহ।

৬৯। *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

পুঁজিবাদী, সমাজতন্ত্রী ও ইসলামী অর্থব্যবস্থা।

৩.১ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা

৩.২ পুঁজিবাদে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য

৩.২.১ পুঁজিবাদের বর্তমান অবস্থা

৩.৩ সমাজ তন্ত্র

৩.৪ সমাজতন্ত্রের সমস্যা ও বর্তমান অবস্থা

৩.৫ ইসলামী অর্থব্যবস্থা

৩.৬ ইসলামী অর্থব্যবস্থার রূপরেখা

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরণের অর্থব্যবস্থা দেখা যায়। বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে যতগুলি অর্থব্যবস্থা রয়েছে নীতিগতভাবে সেগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

প্রথম- পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা

দ্বিতীয়- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

তৃতীয়- ইসলামী অর্থব্যবস্থা

তিন ধরণের অর্থব্যবস্থার মধ্যে ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট অর্থব্যবস্থা গণ্য করা হয়। কারণ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়েই তাদের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। প্রত্যেকটি অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা থেকে যা পরিষ্কার হবে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির রাষ্ট্রে ধনী- দরিদ্রের ব্যবধান যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে এ ব্যবস্থাকে আর তার প্রাথমিক অবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবার অবকাশ নেই। অপর পক্ষে সমাজতন্ত্র তার গ্রহণ যোগ্যতা বিপুল ভাবে অর্জনের আগেই হারিয়েছে, পৃথিবীর অনেক দেশ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ধরে রাখলেও তা সফলতা অর্জনে অর্থাৎ একটি সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে ব্যর্থ হয়েছে। পৃথিবীর দু-একটি রাষ্ট্র সমাজতন্ত্র ধরে রাখলেও পূর্বের সমাজতান্ত্রিকরা পুঁজিবাদের দিকে ঝুঁকছে। এমতাবস্থায় ইসলামী অর্থব্যবস্থাই পারে পৃথিবীতে সুষম উন্নয়ন ঘটাতে। কারণ পরিপূর্ণভাবে ইসলাম অনুসরণের ফলে যে ইসলামী রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা পৃথিবীর বুকে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করেছিল, সে সম্পর্কে অনেকেই অবগত আছেন।।

বর্তমান পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের চিত্র থেকে সহজেই এদুটো অর্থব্যবস্থার অসারতা ফুটে উঠে। অপরপক্ষে ইসলামী অর্থনীতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আমাদের ভাবিয়ে তুলছে যে, বর্তমান সমস্যা সংকুল বিশ্বে ইসলামী অর্থব্যবস্থাই সবার কাম্য হওয়া এবং গ্রহণ করা যৌক্তিক কি না? আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে ইসলামী মূল্যবোধের অনুসারীরা বিশ্বের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র (মদীনা রাষ্ট্র) উপহার দিতে পেরেছিলেন। এছাড়া পরবর্তী চার খলিফার শাসনও সুশাসনের ইতিহাস রচনা করেছিল যা বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। বর্তমান বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় তেমন সুশাসনের সুযোগ কতটুকু তা ভাবতে হবে বৈ কি?

৩.১ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা

ইসলামী দুনিয়ায় নয় বরং ইউরোপেই পুঁজিবাদের জন্ম। এটা ছিল মেশিন আমদানীর প্রত্যক্ষ ফল। আর ঘটনাক্রমে মেশিন আবিষ্কৃত হয় ইউরোপে এবং সেখান থেকেই এটা দুনিয়ার অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে।[১]

পুঁজিবাদি অর্থব্যবস্থার মূলকথা এ যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই হবে নিজের উপার্জিত ধন সম্পদের মালিক, তার উপার্জিত সম্পদে অন্য কারও কোন অংশ থাকবে না, অধিকারও স্বীকৃত হবে না। তার উপার্জিত সম্পদ যেভাবেই ইচ্ছা ব্যয় ও ব্যবহার করতে পারবে; যে পরিমাণ ধন-সম্পদ ও উৎপাদন উপায় তার হাতে রয়েছে, সে কুক্ষিগত করে রাখতে পারে এবং নিজের ব্যক্তিস্বার্থ ছাড়া অন্য কোন কাজে তা ব্যয় করতে অস্বীকার করতে পারবে। এ ব্যাপারে তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে, বস্তুত প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে স্বভাবতই যে স্বার্থপরতা রয়েছে, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা তা হতেই উৎপন্ন হয়েছে।[২]

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন চিন্তাবিদ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পুঁজিবাদের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, সমাজ বিজ্ঞানী সিডনী ওয়েবস বলেন, "পুঁজিবাদ হলো এমন এক ধরণের ব্যবস্থা, যেখানে শিল্প ও অন্যান্য আইনগত প্রতিষ্ঠান সমূহ এমন এক স্তরে উপনীত হয় এবং অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষ উৎপাদনের উপকরণগুলোর মালিকানা থেকে বঞ্চিত হয়ে দিনমজুরে পরিণত হয়।"

Prof. D.M. Wright বলেন,

"Capitalism is a system in which , an average, much the greater portion of economic life and particularly of new investment is carried on by private units under conditions of active and substantially free competition and avowedly at least under incentive of a hope for Profit,"

সমাজ বিজ্ঞানী স্কেফার ও ল্যাম বলেন, "পুঁজিবাদ এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা,যেখানে উৎপাদনের উপায়সমুহ ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকে, আর অর্থনৈতিক কর্মের মূল উদ্দীপক হলো সঞ্চিত লাভ"।

উল্লিখিত সংজ্ঞার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, পুঁজিবাদ হলো এমন এক অর্থব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপকরণসমুহ ব্যক্তিমালিকানায় ন্যাস্ত এবং ব্যক্তির উদ্যোগে উৎপাদন কর্ম পরিচালিত হয়।

পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য

ব্যক্তিমালিকানা: পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সম্পত্তিতে ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসমুহ এবং উৎপাদন সম্পর্ক ব্যক্তিমালিকানার উপর নির্ভরশীল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তির ইচ্ছায় উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। এখানে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ অনুপস্থিত।

মুনাফা অর্জন: পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন পরিচালনা করা হয়। এ ব্যবস্থায় উৎপাদনকারীর ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত বিধায় ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন অন্যতম লক্ষ্য। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদক সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য মূলধন বিনিয়োগ করে থাকে।

উদ্যোগের স্বাধীনতা: পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে উদ্যোগের স্বাধীনতা। পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের মতে উদ্যোগের স্বাধীনতা হলো পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা এবং শ্রম ও পুঁজির অবাধ গতিশীলতা। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ভোক্তার চাহিদা অনুসারে উৎপাদক পণ্য উৎপাদন করতে পারে।

ভোগের স্বাধীনতা: এ অর্থনীতিতে ভোগের ক্ষেত্রে ভোক্তার অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে। অর্থিক সামর্থ, রুচিবোধ ও চাহিদা অনুযায়ী একজন ভোক্তা তার প্রয়োজন অনুসারে পণ্য ভোগ করতে পারবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতিঃ এখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা স্বীকৃত। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যক্তির সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারবে না। বরং ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চত করণের লক্ষ্যে রাষ্ট্র আইন শৃংখলা রক্ষা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার কাজে নিয়োজিত থাকবে।

অবাধ প্রতিযোগিতাঃ পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। এ ব্যবস্থায় উপাদানের উপকরণ ও উৎপাদন সম্পর্কের উপর রাষ্ট্রীয় কোন নিয়ন্ত্রণ থাকেনা বিধায় পুঁজি ও পণ্য অবাধে চলাচল করতে পারবে। ফলে উৎপাদকদের মধ্যে পণ্য উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকে।

স্বয়ংক্রিয় মূল্যব্যবস্থাঃ পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো স্বয়ংক্রিয় মূল্যব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রিত হয় উৎপাদক কর্তৃক। ফলে ভোক্তার চাহিদা ও উৎপাদকের যোগানের ভিত্তিতে পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। এ ব্যবস্থায় পণ্য মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা অনুপস্থিত।

আয় বৈষম্যঃ এ ব্যবস্থায় আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য বিদ্যমান। এ ব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত বিধায় আয় বৈষম্য সৃষ্টি হয়। কেননা যার সম্পত্তির পরিমাণ বেশি তার আয়ও বেশি, অন্য দিকে যার সম্পত্তির পরিমাণ কম তার আয়ও কম।

শ্রেণী বৈষম্যঃ পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম বৈষম্য হলো শ্রেণী বৈষম্য। এ সমাজে প্রধান দুটি শ্রেণীর উপস্থিতি লক্ষনীয়। যেমন-পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণী। উৎপাদনের উপকরণসমূহ পুঁজিপতি শ্রেণী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিধায় শ্রমিক শ্রেণী বৈষম্যের শিকার হয়।

বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রধান্যঃ পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বুর্জোয়া শ্রেণীর সদস্য সংখ্যা কম হলেও সমাজ ও রাষ্ট্র তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র ও প্রশাসনঃ এখানে রাজনীতি ও প্রশাসন পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। পুঁজিপতি শ্রেণী তাদের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার্থে রাষ্ট্র ও প্রশাসন যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। অনেক সময় শ্রমিক শ্রেণী ন্যায্য দাবী আদায়ের লক্ষ্যে সংগ্রামে লিপ্ত হলে রাষ্ট্র পুঁজিপতি শ্রেণীর পক্ষে ভূমিকা পালন করে থাকে। এ প্রসঙ্গে কাল মার্কস বলেন, "শিল্পপতিরাই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মালিক।"

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বাস্তবায়নঃ পুঁজিবাদ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। মুলতঃ পুঁজিবাদের হাত ধরেই গণতন্ত্রের প্রসার ঘটছে। এ ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে কার্যকর করার জন্য রাজনৈতিক দল, আইনসভা, নির্বাচন প্রভৃতি রাজনৈতিক সংগঠন ও কর্মকাণ্ডের সূচনা করা হয়েছে। আর এসব কর্মকাণ্ডে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিরাই সম্পৃক্ত হয়।

পুঁজির আন্তর্জাতিক যাতায়াতঃ পুঁজিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পুঁজি কোন এক দেশ বা এলাকায় সীমিত থাকে না। বরং বিশ্বের যে স্থানে পুঁজির বিনিময়ে অধিক মুনাফা অর্জিত হয় বহুজাতিক কোম্পানীর মাধ্যমে পুঁজি সেসব স্থানে অবাধে যাতায়াত করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

পুঁজিবাদের এই আলোচনা শেষে বলা যায় যে, পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে গণতন্ত্র বিশ্বব্যাপী প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

৩.২ পুঁজিবাদে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য

সকল অর্থনীতিবিশারদ এ বিষয়ে একমত, এমনকি পুঁজিবাদের মহাশত্রু কার্লমার্কসও একথা সমর্থন করেন যে, প্রাথমিক যুগে সকল মানুষই পুঁজিবাদ দ্বারা বহু উপকৃত হয়েছে, গোটা দুনিয়া তার মাধ্যমে উন্নতি ও সমৃদ্ধির নব নব অঞ্চলের সাথে পরিচিত হয়েছে, উৎপাদন ও ফসল বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, জাতীয় মাধ্যমসমূহের প্রচলন ব্যাপক হয়ে উঠেছে এবং শ্রমিক ও মজুরদের জীবন-যাপনের মান আগের চেয়ে যখন তার একমাত্র ভিত্তি ছিল চাষাবাদ বহুগুণ উন্নত হয়েছে।

অধঃপতনের সূচনা: কিন্তু পুঁজিবাদের এ যুগ শীঘ্রই শেষ হয়ে যায়। কেননা তার স্বাভাবিক উন্নতির আড়ালে ক্রমে ক্রমে সকলের সম্পদ কয়েকজন পুঁজিবাদীর হাতে পুঞ্জিভূত হয়ে উঠে এবং গরীব কৃষক ও শ্রমিকরা উক্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। এতে করে শ্রমিক সংগ্রহ করা পুঁজিপতিদের জন্যে খুব সহজ হয়ে পড়ে এবং তাদের মেহনতের ফলে পুঁজিবাদীদের সম্পদ ও বাণিজ্যে অকল্পনীয় উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু তাই বলে তারা শ্রমিকদের (যারা সমাজতন্ত্রীদের মতে উৎপাদন বৃদ্ধির মূল কারণ) পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করতে আদৌ সম্মত হয়নি। অথচ তাদের পারিশ্রমিক এতকম ছিল যে, নূন্যতম মানসম্পন্ন জীবন-যাপন ও তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাদের মেহনতের ফলে যে মুনাফা হতো তা তাদের মনিবরা হস্তগত করতো এবং নিজেদের আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের জন্য দু'হাতে খরচ করতো।

এভাবে সমাজে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দেখা দেয় এবং তা ব্যাপক হতে ব্যাপকতর রূপ লাভ করে। সমাজ কার্যত দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর একটি ভাগ্যবানের দল-বিপুল ধন-সম্পদের মালিক; আর অপরটি হতভাগ্য দরিদ্রের দল, যাদের দুই বেলা ক্ষুন্নিবৃত্তির পরিমাণ খাদ্য ও জুটে না। বর্তমানে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান আরও বাড়ছে।

পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক কুফল: শিল্প মালিকদের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের এই নামমাত্র পারিশ্রমিক প্রদানের একটি ফল হলো এই যে, পুঁজিবাদী দেশসমূহের ক্রয় ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পায় এবং তাদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী স্তূপ আকারে জমা হতে থাকে। একারণে পুঁজিপতিরা তাদের মাল বিক্রির নতুন নতুন বাজার সন্ধান করতে থাকে। এ সন্ধানের ফলেই একদিন উপনিবেশবাদের সৃষ্টি হয়। উপনিবেশবাদীরা বাজার সৃষ্টি এবং কাঁচামাল সংগ্রহের তাগিদে আন্তর্জাতিক দাসত্বের দ্বার উন্মোচিত করে। আর পরিশেষে যুক্তিসংগত কারণেই মানবতা বিধ্বংসী মহাযুদ্ধের সূচনা হয়। এ কারণেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিনিয়তই মন্দা বাজারের আশংকায় থাকে। যদিও বস্তুবাদী লেখকরা একে স্বাভাবিক বলেছেন, তথাপি এটি তাদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যের ফল।

Dhaka University Institutional Repository

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ভিত্তি

প্রথমত সুদী ব্যাংক এবং ঋণ

অর্থনীতি বিশারদদের মতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যখন প্রাথমিক "উৎকৃষ্ট যুগ" থেকে বর্তমান নিকৃষ্ট যুগে পদার্পণ করে তখন থেকে জাতীয় ঋণদানই তার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলো। ব্যাংক মালিকরা অর্থনৈতিক কার্যক্রম এমনভাবে বিন্যস্ত করলো যে, তারা সুদ গ্রহণ করে সরকারকে ঋণ দিতে শুরু করে। ব্যাংক কার্যক্রমের অর্থনৈতিক ও আনুষ্ঠানিক জটিলতা বাদ দিয়েও যেটা বলা যায় যে, এ ঋণ দান এবং ব্যাংকের অধিকাংশ কার্যক্রমই সুদের ভিত্তিতে চলছে। অথচ ইসলাম এই সুদকে পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষিদ্ধ করে দিয়েছে এবং ব্যবসাকে হালাল করেছে।[৩] এছাড়া ইসলাম দানকে উৎসাহ দিয়েছে, আর পুঁজিবাদীরা দান করলেও তার পিছনে পার্থিব স্বার্থ থাকে। এভাবে ঋণ ও সুদের কারণে শুধু ব্যক্তি নয় বরং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধনী ও দরিদ্র বা অনুন্নত ও উন্নত রাষ্ট্রের মধ্যে বৈষম্য বেড়ে চলছে।

পুঁজিবাদের দ্বিতীয় ভিত্তি

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যবসায় প্রতিযোগিতা। এর ফলে ছোট ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূলে ধ্বংস হয়ে যায় কিংবা ঐগুলো একত্র হয়ে বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতা করতে শুরু করে। এখান থেকেই ইজারাদারী অস্তিত্বলাভ করে। কিন্তু ইসলাম ইজারাদারীরও ঘোর বিরোধী। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, "যে ইজারাদারী কায়েম করে সে পাপী" (আল-হাদীস)

এভাবেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধনীকে আরো ধনী এবং দরিদ্রকে আরো দরিদ্র করার মাধ্যম হিসেবে পৃথিবীতে কাজ করে যাচ্ছে।

৩.২.১ পুঁজিবাদের বর্তমান অবস্থা

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় পুঁজিবাদ সগৌরবে না হলেও টিকে আছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো শুরু থেকেই তার বিপরীত অর্থব্যবস্থার দেশগুলোকে ছলে-বলে কৌশলে পুঁজিবাদ গ্রহণে বাধ্য করেছে। বর্তমান বিশ্বে কিউবাসহ দু-একটি দেশ বাদে সব রাষ্ট্রই মোটামুটি পুঁজিবাদ গ্রহণ করেছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো বর্তমানে নানারকম সমস্যায় পতিত হয়েছে। শুরুতে এর অবস্থা ভাল থাকলেও বর্তমানে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এগুচ্ছে।

স্থায়ী মন্দা বাজার: পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিনিয়তই মন্দা বাজারের আশংকায় ভোগে। অপর্যাপ্ত পারিশ্রমিক এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের বিপক্ষে চাহিদা হ্রাস পাওয়ার ফলে এই মন্দাভাব দেখা দিচ্ছে। বস্তুত এক একটি স্বল্পকালীন বিরতির পরেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এরূপ স্থায়ী সংকটে পতিত হয়।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা: বাজার দখলকে কেন্দ্র করে নানা রকম রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চলছে। যদিও অন্যান্য ব্যবস্থাতে এরূপ হতে পারে কিন্তু পুঁজিবাদীদের বাজার দখলের প্রতিযোগিতা হিংসাত্মক। কারণ এরা

Dhaka University Institutional Repository

সবকিছুর বিনিময়ে চায় পুঁজির প্রসার। আর এটা বাধাগ্রস্থ হলে যে কোন হিংসাত্মক কার্য করে থাকে। রাজনৈতিক গুপ্ত হত্যাসহ এমন কোন হীন কাজ নেই যা তারা করে না।

বাজার অর্থনীতি: মুক্তবাজার অর্থনীতির কবলে পড়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অবস্থা হীন থেকে হীনতর হচ্ছে।

বিশ্বায়ন : বিশ্বখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ নোয়াম চমস্কি বর্তমান বিশ্বের বিশ্বায়নের সমালোচনায় বলেন, অর্থের নয় বরং বিশ্বায়ন হওয়া উচিত মানুষের।

শ্রেণী বৈষম্য: এ অর্থ ব্যবস্থার মালিক কর্তৃক শ্রমিক শ্রেণী শোষিত হয়। এ ব্যবস্থায় মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিশাল বৈষম্য বিদ্যমান।

একচেটিয়া কারবার: এ অর্থব্যবস্থায় সম্পদ ও পুঁজির অতিমাত্রায় কেন্দ্রীকরণের ফলে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হয়। পুঁজিবাদে পূর্ণ প্রতিযোগিতার কথা বলা হলেও প্রকৃত পক্ষে উৎপাদক ও পুঁজিপতি শ্রেণী সংঘবদ্ধ হয়ে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা করে।

পুঁজির কেন্দ্রীকরণ: পুঁজিবাদ পুঁজির কেন্দ্রীকরণের জন্ম দিয়েছে। বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ-এর পাশাপাশি বহুজাতিক কোম্পানী বৈদেশিক বিক্রয় বাণিজ্যের এক চতুর্থাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে।

সম্পদের অপচয়: পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনকারী বাজার দখল করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞাপন ও প্রচারণায় লিপ্ত হয়। ফলে একদিকে সম্পদের অপচয় হয় অন্যদিকে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়।

মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন: পুঁজিবাদে মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদনকার্য পরিচালিত হয়। ফলে উৎপাদকরা বিলাস সামগ্রী উৎপাদনে অধিক মনোযোগী হয়। কেননা বিলাস সামগ্রী উৎপাদন অধিক মুনাফার নিশ্চয়তা দেয়। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ধ্বংস: পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান বিধায় বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পরে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং বেকারত্ব সৃষ্টি হয়। অথচ বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।[৪]

আন্তর্জাতিক বিরোধ: পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা আন্তর্জাতিক বিরোধ সৃষ্টি করে। শিল্পোন্নত দেশসমূহ তাদের পণ্যের বাজার সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের জন্য উন্নয়শীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উপর বিভিন্নভাবে প্রভাব সৃষ্টি করে। তাছাড়া পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও পুঁজি বিনিয়োগকে কেন্দ্র করে শিল্পোন্নত দেশগুলোও বিরোধে জড়িয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ সমাজতন্ত্র

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত যে অর্থব্যবস্থা রয়েছে তা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। এ মতাদর্শের মূলকথা হলো, ধন-সম্পদের যাবতীয় উপায়-উপাদন সমাজের ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত মালিকানায় থাকবে; ব্যক্তির ব্যক্তিগতভাবে তা দখল করা, নিজের ইচ্ছামত তাতে হস্তক্ষেপ করা এবং ব্যক্তিগতভাবে তার মুনাফা গ্রহণ করার কোন অধিকার নেই। আর ব্যক্তিগণ সমাজের মিলিত স্বার্থের জন্য যে কোন কাজ করবে, তারা তার পারিশ্রমিক পাবে মাত্র। তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের ব্যবস্থা সমাজের তরফ হতে করে দেওয়া হবে, আর ব্যক্তিগণ তার বিনিময়ে সমাজের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবে।[৫]

বস্তুত 'সমাজতন্ত্র' বলতে এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপর সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ ও কৃর্তত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে শ্রেণী বৈষম্যের অবসান ঘটানো এবং শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা নিয়ে চিন্তাবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে বিভিন্ন চিন্তাবিদ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

দার্শনিক হ্যামন্ড্রে বলেন, "সমাজতন্ত্র হল এমন এক সমাজব্যবস্থা যেখানে জীবনযাত্রার প্রধান মাধ্যমগুলো রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং যার লক্ষ্য হলো সকলের কল্যাণ সাধন করা।"

দার্শনিক বটোমর বলেন, "সমাজতন্ত্র হলো এমন মতবাদ যা রাজনৈতিক স্বার্থ এবং মূল্যবোধ থেকে সৃষ্ট।

উল্লেখিত সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করে বলা যায়, যে ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বণ্টনের সকল উৎস রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এনে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার সুষম বণ্টন করা হয় তাকে সমাজতন্ত্র বলে।

সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যঃ প্রত্যেক ব্যবস্থার কিছু নিজস্ব স্বকীয়তা রয়েছে। একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্রের যেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলো হল-

১) **রাষ্ট্রীয় মালিকানাঃ** সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো দেশের সকল সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্বীকৃত থাকবে। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পদ ও মুনাফা অর্জন নিষিদ্ধ। সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হবে। ফলে সমাজে শ্রেণী শোষণ বিলুপ্ত হবে।

২) **অর্থনৈতিক পরিকল্পনাঃ** সমাজতন্ত্রে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, বিনিয়োগ প্রভৃতি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে পরিচালিত হয়। সে জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে।

৩) **সামাজিক কল্যাণঃ** সমাজতন্ত্রে দেশের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালিত। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা নিষিদ্ধ থাকায় ব্যক্তিগত মুনাফার কোন স্থান নেই। তাই সমাজতন্ত্রে সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪) **জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন:** সমাজতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন। মূলত জাতীয় আয় ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে শ্রেণী বৈষম্য বিলোপ করা সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি প্রয়োজন অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে।

৫) **সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ:** সমাজতন্ত্রে সামাজিক কল্যাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পদ ও মুনাফা নিষিদ্ধ থাকায় সকল সম্পদের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদিত সম্পদ জনগণের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দেওয়ার ফলে সামাজিক কল্যাণ ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

৬) **চাহিদার ভিত্তিতে উৎপাদন:** সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যক্তিগত মুনাফার কোন স্থান নেই। ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তি বিশেষের চাহিদার ভিত্তিতে পরিচালিত না হয়ে সাধারণ জনগনের চাহিদার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

৭) **মৌলিক চাহিদা পূরণ:** সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। এ সমাজব্যবস্থায় মৌলিক চাহিদাগুলো ব্যক্তি বিশেষ নয় বরং সমগ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদার ভিত্তিতে পূরণ করা হয়।

৮) **সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন:** সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে মার্কসবাদীরা বিপ্লব সাধনের পক্ষে। বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজে পুঁজিপতিদের প্রাধান্য খর্ব হবে এবং শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

৯) **শ্রেণী সংগ্রাম:** সমাজতন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো 'শ্রেণী সংগ্রাম'। সমাজে প্রধানত দুটি শ্রেণী পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম বিদ্যমান। পুঁজিপতি শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীকে উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে বঞ্চিত করলে শ্রমিক শ্রেণী সংগঠিত হয়ে পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং সর্বশেষে উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে পুঁজিপতি শ্রেণীকে উৎখাত করে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব কায়েম করে।

১০) **দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ:** সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূলকথা হলো বিরোধসমূহের মিলনতত্ত্ব। মার্কসের মতে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ হল একটি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন। বস্তুবাদ হলো প্রত্যেক বস্তুই একে অপরের সাথে সম্পর্কিত ও পরস্পর নির্ভরশীল। একটির পরিবর্তন অন্যটিকেও প্রভাবিত করে।

১১) **উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব:** উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব সমাজতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব কার্ল মার্কসের একটি মৌলিক আবিষ্কার। উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। শ্রমিকরা শ্রমের দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে তার মূল্য তারা পায় না। উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময় মূল্য থেকে যে পরিমাণ মজুরি থেকে শ্রমিককে বঞ্চিত করা হয় তাই উদ্বৃত্ত মূল্য।

Dhaka University Institutional Repository

১২) **সর্বহারাদের একনায়কত্বঃ** সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সর্বহারাদের একনায়কত্ব মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রামের অপিরহার্য পরিণতি। মার্কসের মতে, সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত পর্যায়ে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। শ্রেণী সংগ্রামের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থার উপর থেকে পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রভাব কমে যাবে এবং শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

সমাজতন্ত্রের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হলো সকল বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে নাগরিকদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো। সম্পদ ও উৎপাদনের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র বাস্তবে রূপলাভ করবে।

৩.৪ সমাজতন্ত্রের সমস্যা ও বর্তমান অবস্থা

১) **ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধীঃ** সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিমালিকানা নিষিদ্ধ। এ ব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন। তাছাড়া এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রকে অধিক প্রাধান্য দেওয়ায় ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হয়।

২) **ভোগের স্বাধীনতা বিরোধীঃ** সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রকৃতি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে পরিচালিত হয়। ফলে এ ব্যবস্থায় পণ্য ভোগের ক্ষেত্রে ভোক্তার স্বাধীনতা থাকে না।

৩) **কর্মোদ্যম হ্রাসঃ** সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা ও মুনাফা বা সম্পদের স্বীকৃতি না থাকায় শ্রমিকদের কর্মোদ্যম হ্রাস পায়।

৪) **আমলাতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাঃ** সমাজতন্ত্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন বিধায় সকল কর্মকাণ্ডই সরকারি আমলাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। সরকারি আমলাদের দ্বারা পরিচালিত উৎপাদন কর্ম কখনোই ব্যক্তিমালিকানাধীন উৎপাদন কর্মের মতো উন্নত ও নিখুঁত হয় না।

৫) **নতুন শ্রেণীর উদ্ভবঃ** সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রমিক তথা সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার কথা। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা বা কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে শ্রমিক শ্রেণী নয় বরং কমিউনিস্ট পর্টির নেতৃত্বে এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

৬) **ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্তঃ** সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুসারে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কোন ত্রুটি থাকলে বা ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে এর প্রভাব সমগ্র সমাজের উপর পড়ে।

৭) **উৎপাদন ও বণ্টনে অব্যবস্থাপনাঃ** সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বণ্টন কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন। এখানে জনগণ অপেক্ষা রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছাই অধিক মূল্যবান। উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে অনেক সময় জনগণ অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়।

৮) **স্বজনপ্রীতি ও দূর্নীতিঃ** সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত। রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক। কর্মকর্তাদের স্বজনপ্রীতি ও দূর্নীতির ফলে

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদের সুষম বণ্টন যেমন অসম্ভব হয়ে পড়ে তেমনি দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

৯) **গণতন্ত্র বিরোধী:** সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের রীতিনীতিকে অস্বীকার করা হয়। জনমত, ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রভৃতি পদদলিত করে সকল কর্মকান্ডের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ফলে সমাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক মানসিকতার পরিপন্থী।

১০) **যান্ত্রিক ও বস্তুতান্ত্রিক:** সমাজতন্ত্রে বস্তুবাদের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। এ ব্যবস্থায় ভাব বা আবেগের পরিবর্তে সকল কিছুকেই বস্তুতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়।

সমাজতন্ত্রের বর্তমান অবস্থা

সমাজতন্ত্র একটি কার্যকরী স্বচ্ছ ব্যবস্থা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, সম্পদের বরাদ্দ ও বণ্টনের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক পদ্ধতি প্রদানেও সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। সম্পদের এক ধরণের ব্যবহার থেকে অন্য ধরণের ব্যবহারের জন্য সম্পদ স্থানান্তরের সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি ছিল ধীর এবং অকার্যকর। বাজার ব্যবস্থার চেয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার রেকর্ড আরও বেশি খারাপ। যেসব দেশে সমাজতন্ত্র বলপূর্বক চাপানো হয়েছে সে সব দেশে তা ব্যর্থ হয়েছে। যে সমস্ত দেশ সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেছে সে সমস্ত দেশে সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তা মানুষের অভাব যথেষ্টভাবে পূরণ করতে পারেনি। আর্থসামাজিক অসমতাও কার্যকরভাবে হ্রাস করতে পারেনি।[৬] অধিকন্তু, শ্রমিক এবং নির্বাহীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার অভাবে এবং পরিবর্তনশীল বাস্তবতার জন্য কাজ করার অসামর্থ্যের ফলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গতিহীন হয়ে পড়েছিল। এসব দেশে বাইরে থেকে আনা ঋণ গীর্জার চূড়ার ন্যায় উঁচু হয়ে গেছে এবং পরবর্তীতে আরও তীব্র গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে।[৭] এসব দেশ ধর্মনিরপেক্ষতার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার না করে বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেছে। সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করার ফলে এসব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। তথাপি ওসব দেশের মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, বহিরাগত ঋণ এবং বিরাজমান বৈষম্যসহ অসংখ্য অর্থনৈতিক সমস্যা তাদেরকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছে, যা এমনকি বাজার অভিজ্ঞ অর্থনীতির দেশের চেয়েও মারাত্মক।[৮] সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সংস্কারের জন্য সমাজতান্ত্রিক এবং মুক্তবাজার বলয়ের প্রস্তাবিত সংস্কারমূলক কর্মসূচি থেকে দুঃখজনকভাবে একটি বিষয় বাদ পড়ে গেছে। তাহলো, একটি নৈতিক কর্মসূচির প্রয়োগ এটা নিশ্চিত করার জন্য যে, গরীবদের অবস্থা খারাপ হওয়ার চেয়ে ভাল হচ্ছে।[৯]

উন্নয়নশীল দেশের জন্য শিক্ষা

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র এ উভয় পদ্ধতিই অভাব পূরণ, পরিপূর্ণ নিয়োগ এবং আয় ও সম্পদের ন্যায্য বণ্টনে ঘোষিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। এর কারণ হল, তাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত কৌশলের সাথে তাদের ঘোষিত উদ্দেশ্যের মিল ছিল না। উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং অপরের মঙ্গলের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা। যাহোক, বাজার ব্যবস্থার কলাকৌশলগুলোর ভিত্তি ছিল 'যোগ্যতমের বেঁচে থাকা' এবং বাজার পদ্ধতিতে সর্বাধিক অভাব পূরণ।[১০] সমাজতান্ত্রিক কলাকৌশলগুলোর ভিত্তি ছিল 'শ্রেণী সংগ্রাম'[১১] এবং

Dhaka University Institutional Repository

'জীবনের বস্তুগত' অবস্থান। তাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কলাকৌশলের কাঠামোর মধ্যে পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্র প্রবৃদ্ধির সাথে ন্যায়পরায়ণতা এবং স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য মৌলিক গুণগত পরিবর্তন সাধনে অসমর্থ। এ আলোচনার অপরিহার্য উপসংহার টানতে হচ্ছে এ বলে যে, যেসব পদ্ধতি নিজেরাই ন্যায়পরায়ণতা এবং স্থিতিশীলতার সাথে প্রবৃদ্ধি অর্জনে ব্যর্থ হয় তারা উন্নয়নশীল দেশের জন্য উদাহরণ হতে পারে না, বিশেষ করে মুসলিম দেশের জন্য। কারণ আর্থ-সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামের রয়েছে দ্ব্যর্থহীন অঙ্গীকার।[১২]

৩.৫ ইসলামী অর্থব্যবস্থা

ইসলাম পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দুইটি বিপরীত ধরণের ও পরস্পর বিরোধী অর্থব্যবস্থার মধ্যবর্তী এক সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবস্থা পেশ করে। এ অর্থব্যস্থার মূলনীতি এ যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার ব্যক্তিগত ও স্বাভাবিক অধিকার পুরোপুরিই দিতে হবে। সে সংগে ধন বন্টনের ভারসাম্যকেও যথাযথ রূপে রক্ষা করতে হবে। ইসলাম একদিকে ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার ও নিজের ধন-সম্পদে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার দেয়, অপরদিকে এসব অধিকারের উপর অভ্যন্তরীণ দিক হতে কতগুলো নৈতিক বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং বাহ্যিক দিক হতে কতকগুলো আইনের শাসন কায়েম করে। এর ফলে কোন এক স্থানে ধন সম্পদ ও উপায় উপাদান জমাট বাধতে ও স্থবির হয়ে থাকতে পারে না। তা প্রতিনিয়ত আবর্তিত হতে থাকে এবং তার ফলে সমাজের প্রত্যেক মানুষ তা হতে প্রয়োজনীয় অংশ লাভ করার সুযোগ পায়। এ জন্যই ইসলাম গোটা অর্থব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নতুন ধরনে ও নবতর পদ্ধতিতে গড়ে তুলেছে। এটি অভ্যন্তরীণ ভাবধারা, রীতিনীতি ও কর্মপদ্ধতির দিক দিয়ে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয় অর্থব্যবস্থা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্নভাবে ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা দিয়েছেন

ড. এম. আকরাম খান বলেন, "সহযোগীতা ও অংশগ্রহণের ভিত্তিতে জাগতিক সম্পদ সংগঠিত করার মাধ্যমে যে মানবীয় কল্যাণ অর্জন করা যায় সে সম্পর্কীত জ্ঞানই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি।"

ড. খুরশিদ আহমদ বলেন, "ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে অর্থনৈতিক সমস্যা ও ঐসব সমস্যার প্রেক্ষিতে মানবীয় আচরণকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে উপলব্ধি করার পদ্ধতিগত প্রয়াস।"

ড. এম. এ. হান্নান বলেন, "যে সমাজ বিজ্ঞান ইসলামী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক সমস্যা পর্যালোচনা করে তাই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি।"

ড. এম. ওমর চাপড়া বলেন, "ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে জ্ঞানের সেই শাখা যা ইসলামী শিক্ষার সাথে সংগতি রেখে দুস্প্রাপ্য সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টনের মাধ্যমে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা অযথা খর্ব ও সমষ্টি অর্থনীতির কোনরকম ভারসাম্যহীনতা এবং পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি না করে মানবীয় কল্যাণ অর্জনে সাহায্য করে।"

ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্যবলী

১। ক) সর্বাধিক বিনিয়োগ

Dhaka University Institutional Repository

খ) সর্বাধিক উৎপাদন

গ) পূর্ণ কর্মসংস্থান

২। আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন[১৩]

৩। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মৌলিক অধিকার তিনটি:

ক) জরুরীয়াত

খ) হাজিয়াত

গ) তাহসিয়াত

জরুরীয়াতঃ ইমাম শাতিবি; ইমাম গাজ্জালী (র.)-এর দৃষ্টিকোণ থেকে জরুরীয়াত সম্পর্কে এখানে বর্ণনা দেয়া হয়েছে যা বর্তমান বিভিন্ন ব্যবস্থার মৌলিক অধিকার থেকে অনেক বেশি সম্পূর্ণ বিবয়: যেমন:

১) ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংগ

২) সমন্বিত অর্থনীতি

৩) জীবিকা অর্জনের অধিকার উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে অবাধ প্রতিযোগিতা

ক) ধর্ম ও কর্মের মধ্যে সুন্দর ভারসাম্য

খ) জীবিকা অর্জনের প্রচেষ্টায় সকলের সমান অধিকার

গ) মর্যাদাগত কারণে মানুষ কারো কাছে হাত পাতবে না

ঘ) পরশ্রমে নির্ভরশীল হবে না

ঙ) জীবিকার অপরিহার্য উপাদান হতে বঞ্চিত থাকা হারাম।

চ) অক্ষম অসহায়দের ব্যবস্থা বিত্তবানরা করবে

৪) উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টনে হালালকে গ্রহণ ও হারামকে বর্জন

৫) ব্যয় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নীতিমালা

৬) আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠা

৭) সম্পদ বিরষ্ট্রীকরণ ও ইসলামী মিরাসী আইনের প্রতিষ্ঠা

৮) যাকাত ও উশর ভিত্তিক অর্থনীতি

৯) সুদমুক্ত অর্থনীতি

১০) অর্থনৈতিক মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা

১১) জনগণের সহজ জীবন নিশ্চিৎ করা

১২) নির্যাতিত ও বঞ্চিতের সার্থ সংরক্ষণ

১৩) ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

১৪) ইসলামী বিনিয়োগ কোম্পানী, ইসলামী লীজিং কোম্পানী ইসলামী তাকাফুল কোং গঠন

১৫) ইসলামী মানি মার্কেট প্রতিষ্ঠা

১৬) ইসলামী বন্ড মার্কেট প্রতিষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬ ইসলামী অর্থব্যবস্থার রূপরেখা

এক: উপার্জনে বৈধ অবৈধের পার্থক্য

এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা হচ্ছে, ইসলাম এর অনুসারীদেরকে অর্থ উপার্জন করার অবাধ সুযোগ দেয় না: বরং উপার্জনের পন্থা ও উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বৈধ ও অবৈধতার পার্থক্য সৃষ্টি করে। এ পার্থক্যের একটা মূলনীতি রয়েছে। তা হচ্ছে এ যে, ধন উপার্জনের যেসব পন্থা ও উপায় অবলম্বিত হলে এক ব্যক্তির লাভ ও অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ক্ষতি হয় তা সবই অবৈধ। অন্যদিকে যেসব উপায় অবলম্বন করলে ধন-উপার্জন প্রচেষ্টার সাথে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ন্যায়সংগত সুফল ভোগ করতে পারে তা সবই বৈধ। এ মূলনীতিটি কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অবৈধ উপায়ে ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক সম্মতি অনুযায়ী ব্যবসায়িক লেনদেন করতে পারো। আর তোমরা নিজেরা নিজেরদেরকে (অথবা পরস্পর পরস্পরকে) ধ্বংস করো না। আল্লাহ্ তোমাদের অবস্থার প্রতি করুণাশীল। যে ব্যক্তি সীমা অতিক্রম করে যুলম সহকারে এরূপ করবে তাকে আমি আগুনে নিক্ষেপ করবো।[১৪]

কুরআনে বিভিন্ন স্থানে অর্থ উপার্জনের যেসব পদ্ধতিকে হারাম বলে গণ্য করেছেন তা হলো:

- উৎকোচ
- ব্যক্তি, সমষ্টি নির্বিশেষে সবার সম্পদ আত্মসাত
- চুরি
- এতীমের অর্থ অন্যায়ভাবে তসরূপ (ওজনে কম করা)
- চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী উপকরণসমূহের ব্যবসা
- বেশ্যাবৃত্তি ও দেহ বিক্রয়লব্ধ অর্থ
- মদ উৎপাদন, মদের ব্যবসা ও মদ পরিবহন
- জুয়া ও এমন সব উপায় উপকরণ যেগুলোর মাধ্যমে নিছক ঘটনাচক্রে ও ভাগ্যক্রমে একদল লোকের সম্পদ অন্য একদল লোকের নিকট হস্তান্তরিত হয়
- মূর্তি গড়া, মূর্তি বিক্রয় ও মূর্তি উপাসনালয়ের সেবা
- ভাগ্য গণনা ও জ্যোতিষির ব্যবসা
- সুদ খাওয়া

দুই: ধন সঞ্চয়ের নিষেধাজ্ঞা

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হচ্ছে, বৈধ উপায়ে যে ধন উপার্জন করা হবে তা পুঞ্জীভূত করে রাখা যাবে না। কারণ এর ফলে ধনের আবর্তন বন্ধ হয়ে যায় এবং ধন বন্টনে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি ধন সঞ্চয় করে রাশিকৃত ও পুঞ্জিভূত করে রাখে সে নিজে যে কেবল মারাত্মক নৈতিক রোগে আক্রান্ত হয় তাই নয় বরং মূলত সে সমগ্র মানব সমাজের বিরুদ্ধে একটি জঘন্যতম অপরাধ করে। এর ফল তার নিজের জন্যও খারাপ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এজন্য কুরআন কার্পণ্য এবং কৃপণের ন্যায় সম্পদ কুক্ষিগত ও পুঞ্জীভূত করে রাখার বিরোধিতা করেছে কঠোরভাবে।

কুরআনে বলা হয়েছে: "যারা স্বর্ণ রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে (যাকাত আদায়) ব্যয় করে না তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।"[১৫]

তিন : অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ

সঞ্চয় করার পরিবর্তে ইসলাম অর্থ ব্যয় করার শিক্ষা দেয়। কিন্তু ব্যয় করার অর্থ বিলাসিতা ও আয়েশ আরামের জীবন যাপন করে দুহাতে অর্থ লুটানো নয়; বরং ব্যয় করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র পথের শর্ত আরোপ করে। অর্থাৎ সমাজের কোনো ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে সমাজের জন্য কল্যাণমূলক কাজে তা ব্যয় করতে হবে। এটিই হবে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: "তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে, তারা কি ব্যয় করবে? তাদেরকে বলে দাও, যা তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত (তাই ব্যয় কর)।[১৬]

এখানে এসে ইসলাম ও পুঁজিবাদের দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। বিত্তবান মনে করে অর্থ ব্যয় করলে দরিদ্র হয়ে যাবে এবং সঞ্চয় করলে বিত্তশালী হবে। কিন্তু ইসলাম বলে অর্থ ব্যয় করলে অর্থ কমে যাবে না বরং এতে বরকত হবে ও প্রবৃদ্ধি হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের ন্যায় লজ্জাকর কাজের হুকুম দেয়; কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের নিকট মাগফেরাত ও অতিরিক্ত দানের ওয়াদা করেন।"[১৭]

পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এটি আর একটি নতুন মতবাদ। ব্যয় করলে অর্থ বেড়ে যাবে এবং ব্যয়িত অর্থ নষ্ট হবে না। তাই নয়, বরং কিছুটা অতিরিক্ত লাভ ও কল্যাণসহ পূর্ণমাত্রায় ফিরে আসবে; অন্যদিকে সুদী ব্যবসা অর্থবৃদ্ধির পরিবর্তে অর্থহ্রাস ও লোকসানের সূচনা করবে এবং যাকাত ও সাদকার মাধ্যমে অর্থ হ্রাসের পরিবর্তে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে– এ মতবাদটি আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত ও বিস্ময়কর মনে হবে। শ্রোতা মনে করে, সম্ভবত এগুলো নিছক আখেরাতের সওয়াবের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাপার। নিঃসন্দেহে আখেরাতের সওয়াবের সাথে এসব কথার সম্পর্ক রয়েছে এবং ইসলামের দৃষ্টিতে এটিই আসল গুরুত্বের অধিকারী। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এ দুনিয়াতেও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এ মতাদর্শ একটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ধন সঞ্চয় করে সুদী ব্যবসায় নিয়োগ করার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ চতুর্দিক থেকে ধন আহরিত হয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে চলে আসবে। সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা প্রতিদিন কমে যেতে থাকবে। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা সর্বত্র মন্দা ভাব দেখা দেবে। জাতীয় অর্থনৈতিক জীবন ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে যাবে। অবশেষে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যার ফলে পুঁজিপতিরাও নিজেদের সঞ্চিত ধন-সম্পদ অর্থ উৎপাদনের কাজে লাগাবার সুযোগ পাবে না। বিপরীত পক্ষে অর্থসম্পদ ব্যয় করলে এবং যাকাত ও সাদকা

Dhaka University Institutional Repository

দান করলে জাতির সকল ব্যক্তির হাতে এ সম্পদ ছড়িয়ে পরে, প্রত্যেক ব্যক্তি যথেষ্ট ক্রয়-ক্ষমতার অধিকারী হয়, শিল্পোৎপাদন বেড়ে যায়, সবুজ ক্ষেত্রগুলো শস্যে ভরে ওঠে, ব্যবসা বাণিজ্যে অভূতপূর্ব উন্নত সাধিত হয়। এতে হয়তো কেউ লাখপতি- কোটিপতি হয় না, কিন্তু সবার অবস্থা সচ্ছল হয় এবং পরিবার হয় সমৃদ্ধিশালী। এ শুভ পরিণাম-সম্পন্ন অর্থনৈতিক মতাদর্শটির সত্যতা যাচাই করতে হলে আমেরিকার বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার কারণে সেখানে ধন বন্টনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে এবং শিল্প ও বাণিজ্যের মন্দাভাব জাতির অর্থনৈতিক জীবনকে ধ্বংসের প্রান্তসীমায় পৌঁছে দিয়েছে। এর তুলনায় ইসলামী যুগের প্রথম দিকের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যখন সেখানে পূর্নাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তখন মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে জাতীয় সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যার ফলে লোকেরা যাকাত গ্রহীতা খুঁজে বেড়াতো, কিন্তু কোথাও তাদের সন্ধান পাওয়া যেতো না। এমন একজন লোকের সন্ধান পাওয়া যেতো না যে নিজেই যাকাত দেয়ার যোগ্যতা ও ক্ষমতা অর্জন করেনি। এ দুটি অবস্থাকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে আল্লাহ সুদকে কিভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং সাদকাকে ক্রমোন্নতি ও ক্রমবৃদ্ধি দান করেন তা দ্ব্যর্থহীনভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

চারঃ যাকাত

ইসলাম চায় সম্পদ তোমরা কখনো পুঞ্জীভূত করে না রেখে এগুলো ব্যয় করো এবং এমন সব খাতে ব্যয় করো যেখান থেকে ধনের আবর্তনের ফলে সমাজের স্বল্পবিত্তের লোকেরাও যথেষ্ট অংশ লাভ করতে সক্ষম হবে।

যে সকল লোক সম্পদ আহরণ ও পুঞ্জীভূত করে রাখতে অভ্যস্ত হয় অথবা যাদের নিকট কোন না কোনভাবে সম্পদ সঞ্চিত হয়ে থাকে তাদের সম্পদ থেকে সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি বিধানার্থে কমপক্ষে একটি অংশ অবশ্যই কেটে নেয়া হবে। একে যাকাত বলা হয়। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এ যাকাতকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, এমনকি একে ইসলামের একটি মূলতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নামাযের পরে এ যাকাতের উপরই সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া হয়েছে। এবং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অর্থসম্পদ সঞ্চয় করে, যাকাত না দেয়া পর্যন্ত তার ঐ সম্পদ হালাল হতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাদের ধন সম্পদ থেকে একটি সাদকা গ্রহণ কর যা ঐ ধন সম্পদকে পাক-পবিত্র ও হালাল করে দিবে।"[১৮]

পাঁচঃ মীরাসী আইন/উত্তরাধিকার আইন

নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনে অর্থ ব্যয়, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় ও যাকাত আদায় করার পরও যে অর্থসম্পদ কোনো একহাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে যাবে তাকে বিকেন্দ্রীভূত করার জন্য ইসলাম আর একটি পন্থা অবলম্বন করেছে। একে বলা হয় মীরাসী আইন।

Dhaka University Institutional Repository

এ আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি অর্থসম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করবে তা যতো কম বেশী হোক না কেন তা কেটে টুকরো টুকরো করা হবে এবং নিকট ও দূরের সকল আত্মীয়ের মধ্যে ক্রমানুসারে বণ্টন করা হবে।

মীরাস বণ্টনের এ আইনের অস্তিত্ব একমাত্র ইসলামেই দেখা যায়, অন্য কোন অর্থব্যবস্থায় এর অস্তিত্ব নেই। অন্যান্য অর্থব্যবস্থা এ ব্যাপারে যে নীতি নির্ধারণ করেছে তা এক ব্যক্তি যে অর্থ সঞ্চিত করে রেখে যায়, তার মৃত্যুর পর তা এক বা একাধিক ব্যক্তির নিকট কেন্দ্রীভূত রাখতে চায়। কিন্তু ইসলাম সম্পদ কেন্দ্রীভূত করার পরিবর্তে বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতি, এর ফলে আবর্তন সহজতর হয়।

ছয়ঃ গণীমতলব্ধ সম্পদ ও বিজিত সম্পত্তি বণ্টন

এ ক্ষেত্রেও ইসলাম একই দৃষ্টিভংগির অধিকারী যুদ্ধে সেনাবাহিনী যে গণীতমের অর্থ (শত্রুপক্ষের পরিত্যক্ত সম্পদ) হস্তগত করে, সে সম্পর্কে ইসলাম একটি বিশিষ্ট আইন প্রণয়ন করেছে। এ অর্থসম্পদ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়। চারভাগ সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয় এবং অবশিষ্ট একভাগ সাধারণত জাতীয় কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করার জন্য রেখে দেয়া হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "জেনে রাখো, গণীমত হিসেবে তোমরা যা কিছু হস্তগত কর তার এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল, রসূলের নিকটাত্মীয়, এতীম মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য।"[১৯]

আল্লাহ্ ও রসূলের অংশ বলতে এমন অংশকে বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশের আওতাধীন ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে দেয়া হয়েছে। যাকাতে রসূলের নিকটাত্মীয়দের কোন অংশ ছিলো না বলে এখানে তাদের অংশ রাখা হয়েছে। আছে এতীম শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং তাদেরকে জীবন সংগ্রামে অংশ নেয়ার যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য এতে তাদের অংশ রাখা হয়েছে। মিসকীনদের অংশ রাখা হয়েছে (বিধবা মহিলা, বিকলাঙ্গ, অক্ষম, রুগ্ন ও অভাবী প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত)।

সাতঃ মিতব্যয়িতার নির্দেশ

ইসলাম একদিকে ধনসম্পদ সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে আবর্তন করা ও ধনীদের সম্পদ থেকে নির্ধনদের অংশ লাভ করার ব্যবস্থা করেছে, অন্যদিকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অর্থ ও সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হবার নির্দেশ দিয়েছে। এভাবে অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি কখনো প্রান্তিকতার আশ্রয় নিয়ে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করবে না। এক্ষেত্রে কুরআনের মৌলিক শিক্ষা হচ্ছেঃ "আর আল্লাহ্র সৎকর্মশীল বান্দারা যখন ব্যয় করে, অপব্যয় করে না, আবার কার্পণ্যও করে না; বরং এ দুটির মধ্যবর্তী ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করে।"[২০]

নৈতিক শিক্ষা ও সুনির্দিষ্ট আইন-কানুন

ইসলাম একদিকে নৈতিক শিক্ষা ও অন্যদিকে সুনির্দিষ্ট আইন-কানুনের মাধ্যমে মানুষকে সহজ-সরল-অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের নির্দেশ দেয়। এ অনাড়ম্বর জীবনে মানুষের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার সীমানা

Dhaka University Institutional Repository

কোনক্রমেই এতটা ব্যাপকতর হতে পারে না, যার ফলে মধ্যম মানের আয় উপার্জনে সংসার চালানো তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং নিজের স্বাভাবিক সীমার বাইরে গিয়ে তাকে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসাতে হবে অথবা যদি যে মধ্যম মানের অধিক আয় করতে সমর্থ হয় তাহলে নিজের উপার্জিত যাবতীয় অর্থসম্পদ নিজেই ভোগ করবে এবং নিজের অপারগ ভাইদের সাহায্য করবে না, যারা মধ্যম মানের কম উপার্জন করে থাকে।

পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক এবং সবশেষে ইসলামী অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা শেষে দেখা যাচ্ছে যে, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার কিছু সুবিধা বা সুফল থাকলেও এর কুফলই বেশি। যার প্রমাণ বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা। বর্তমান বিশ্বে কাঙ্খিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে কি? বিশেষ করে আমরা যদি বাংলাদেশের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের অবস্থা আশাব্যঞ্জক নয়। স্বাধীনতার পর থেকে কখনও সমাজতান্ত্রিক এবং বেশিরভাগ সময় পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনুসরণ করে চলছে। স্বাধীনতার পূর্বে বা সময়ে বাংলাদেশে যে পরিমাণ কোটিপতি ছিল, বর্তমানে তার তুলনায় অনেক অনেক বেশি কোটিপতি রয়েছে। যেমন-এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ১৯৭১ সালে কোটিপতি ২ জন ছিলেন সেখানে ২০০৩ সালে ৩৫০০০ জন কোটিপতি। কিন্তু সার্বিক উন্নয়ন সে তুলনায় কতটুকু হয়েছে? শিক্ষার নিম্নহার, দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস কারীর সংখ্যা বাড়ছে। অথচ সুলতানী শাসনামলে বা প্রাচীন বাংলায় মানুষের অর্থনৈতিক জীবন ছিল অনেক স্বচ্ছল। বর্তমানে অবস্থার যেখানে আরো উন্নত হওয়ার কথা, সেখানে অবনতির হার বেশি। অথবা ঈসা (আ.)-এর তিরোধানের পর এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের পূর্বে আইয়ামে জাহেলিয়া নামে খ্যাত আরব হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং চার খলিফার শাসনামলে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতির চরম শিখরে উঠে ছিল শুধু ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থা অনুসরণের মাধ্যমে।[২১] তাই বর্তমান ইসলামী বিশ্বে বিশেষ করে বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ইসলাম ধর্ম কোন বাধা নয় বরং একান্ত অনুসরণীয় বলে মনে করেন অনেক ইসলামী ব্যক্তিত্ব।

তথ্য নির্দেশিকা

১। কুতুব মোহাম্মদ, *ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১২৪।

২। এ. মওদুদী, *ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৫।

৩। *আল-কুরআন*, (২:২৭৫-৭৮)

৪। ড. উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, বি.আই.আই.টি, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১০৬।

৫। মাওলানা আবদুর রহীম অনূদিত, *ইসলাম ও আধুনিক আর্থনৈতিক মতবাদ*, পৃ.৭।

৬। চাপরা, উমর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

৭। প্রাগুক্ত।

৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

৯। প্রাগুক্ত।

১০। প্রাগুক্ত।

১১। Marx, karl and Angles, *Communist Manifesto,* Chapter 1, Vol-1, Page-1.

১২। প্রাগুক্ত।

১৩। *আল কুরআন*, ৫৯ :৭।

১৪। *আল কুরআন*, ৪: ২৯-৩০।

১৫। *আল-কুরআন*, ৯ : ৩৪।

১৬। *আল-কুরআন*, ২ : ২১৯।

১৭। *আল-কুরআন*, ২ : ২৬৮।

১৮। *আল-কুরআন*, ৯: ১০৩।

১৯। *আল-কুরআন*, ৮ : ৪১।

২০। *আল-কুরআন*, ২৫ : ৬৭।

২১। মোতেন, আবদুল রশিদ, রাষ্ট্র বিজ্ঞান : ইসলামী প্রেক্ষিত, বি.আই.আই.টি, ঢাকা, এপ্রিল, ২০০৮, পৃ. ১০০-১০১।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাতের ভূমিকা

৪.১ যাকাত কী?

৪.২ যাকাত দাতা

৪.৩ যাকাত ব্যয়ের খাত

৪.৪ যাকাত দান ও গ্রহণ সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক

৪.৫ সামাজিক নিরাপত্তায় যাকাত

৪.৬ শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধিতে যাকাত

৪.৬.১ বাংলাদেশে যাকাত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ মানবজীবনের একমাত্র নয় বরং একটি বিশেষ নিয়ামক। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক লক্ষণীয় বৈষম্য বিরাজ করছে। যার কারণে মানব জীবনের অন্যান্য দিক যেমন- রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে চলছে, এক বিশেষ ধরণের অব্যবস্থাপনা সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ প্রভৃতি অর্থব্যবস্থা নিজ নিজ জৌলুস হারিয়ে এক বিপর্যয়কর অবস্থায় পর্যবসিত হয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে সময় এসেছে নতুন করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার। এক্ষেত্রে ইসলামী অর্থব্যবস্থা নিয়ে গুনরায় ভাবার সময় এসেছে যার ভিত্তিমূলে রয়েছে কুরআন ও হাদীস। কারণ কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা তথা পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা করে বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র পরিচালনার নজীর স্থাপন করেছিলেন ইসলাম ধর্মের পরিপূর্ণতাদানকারী সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)। তাঁর সেই কল্যাণমূলক রাষ্ট্র আর্থাৎ মদীনা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা । তবে সেই সাথে উষর, জিজিয়া, ইসলামী উত্তরাধিকার আইন প্রভৃতিও ছিল। কারণ সমাজের আয় ও সম্পদের বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকরী হবে যদি অন্য সকল ব্যবস্থার পাশাপাশি যাকাত ও ইসলামী উত্তরাধিকার আইনকে ভালভাবে বলবৎ করা যায়।[১] দুর্ভাগ্যজনক হলো মুসলিম দেশগুলির লক্ষ্য অর্জন করার জন্য এবং মসুলমানদের অত্যাবশ্যকীয় করণীয় হিসাবে এই উভয় ব্যবস্থার বাস্তবায়ন বহু আগেই হওয়া উচিত ছিল কিন্তু সুদীর্ঘ কাল ধরে এ দুটো ব্যবস্থা মুসলিম দেশগুলিতে অবহেলিত হয়ে আছে।[২] ফলশ্রুতিতে মুসলিম দেশগুলি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নে সঠিক ভূমিকা রাখতে পারছে না। তারা পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা অনুসরণেএক বিশৃংখল অবস্থায় রয়েছে। যদিও ইসলামী পদ্ধতি অনুসরণ করে হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ও তার নির্বাচিত খলিফারা পৃথিবীতে ইসলামী রাষ্ট্রের এক অনুপম আদর্শ রেখে গেছেন। বিশেষকরে রসূল (সাঃ) প্রতিষ্ঠিত মদিনা রাষ্ট্রের মত উত্তম রষ্ট্র পৃথিবীর ইতিহাসে কোন ধর্মীয় ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা উপহার দিতে পেরেছে কি? সেই রাষ্ট্র যাকাতের অর্থ নেওয়ার মত অভাবী লোক খুঁজে পাওয়া যেত না অথচ আজকের পৃথিবীর তথাকথিত উন্নত রাষ্ট্রে দরিদ্র লোক খুঁজে পাওয়া যাবে কিংবা দুবেলা অন্নের চাহিদা মেটাতে মানুষকে করতে হয় অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট অথচ শুধু যাকাত আদায় এবং সঠিক খাতে তার ব্যবহার পৃথিবীতে আর্থিক বৈষম্য দূর করার মাধ্যমে মানব সমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে বলে ইসলামী পণ্ডিতগণ মনে করেন।[৩]

অর্থনৈতিক উন্নয়নে যাকতের ভুমিকা বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে যাকাত সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন।

৪.১ যাকাত কী?

নির্দিষ্ট মৌলিক পরিমাণ সম্পদের অতিরিক্ত সম্পদের উপর যাকাত প্রদান করা ইসলামে বাধ্যতামূলক।[৪] আর যাকাত বিষয়ে কোরআনে ৮০টিরও বেশি আয়াতে নামাজের সাথে যাকাতের কথাবলা হয়েছে।[৫] এতে বোঝা যায় ইসলামে এর গুরুত্ব কত বেশী। কুরআনে যাকাত দাতাদের উৎসাহ দেয়া হয়েছে। যারা যাকাত দেয়না তাদের হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে। (আল কুরআন ২৪:৫৬, ৯:৩৪, ২:২৬২, ৫১:১৯)

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত শব্দের মূল অর্থ পরিশুদ্ধ বা বিশুদ্ধতা।[৬] এছাড়াও এর অর্থ বৃদ্ধি বা উন্নতি এভাবে বলা যায় যে, যাকাত দেয়ার মাধ্যমে মানুষের সম্পদের পরিশুদ্ধি বৃদ্ধি ও উন্নতি ঘটে। আইনের ভাষায় আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য সম্পদের একটি অংশ প্রাপ্য লোককে দেয়ার নাম যাকাত। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে যাকাত কে সাদাকাহ বলেও অভিহিত করা হয়েছে।[৭] যাকাত প্রদানকারী যাকাত প্রদানের মাধ্যমে তার ঈমানের সত্যতারই প্রমাণ দিয়ে থাকে এবং তার মালকেও পবিত্র করে থাকে।

পারিভাষিক অর্থে যাকাত বলতে সাহেবে নিসাবের ধন-মাল এর সে অংশকে বুঝায় যা ইসলামী শরীয়ত, নির্ধারিত অবশ্য দেয়, যা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ৮ আটটি খাতে ব্যয় করা হয়। (আর কুরআন ৯:৬০)

বস্তুত ইসলামে সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করার কোন অবকাশ নেই। এ কারণে ইসলাম যাকাত আদায়ের জন্য কঠোর ব্যবস্থার বিধান দিয়েছে। যেখানে দুনিয়ায় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ও আখেরাতে কঠিন শাস্তির নির্দেশ রয়েছে।

কুরআন শরীফে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যাকাত না দেয়া কেবল পরকালে অবিশ্বাসী মুশরিকদেরই কাজ। *আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী যাকাত সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে,* 'যাকাত না দিলে কোন লোকই পরকালে অবিশ্বাসী মুনাফিকদের থেকে ভিন্নতর পরিচিতি লাভ করতে পারে না, যাকাত না দিলে কোন লোকই কল্যাণ পেতে পারে না যাকাত না দিয়ে আল্লাহর রহমত পাওয়ার যোগ্য অধিকারীও হতে পারে না।'[৮] আল্লাহর রসূল (সাঃ) হাদীসের মাধ্যমেও যাকাত প্রদানের জন্য বলিষ্ঠভাবে তাগিদ করেছেন এবং যাকাত না দেয়ার ইহ-পরকালীন পরিণাম সর্ম্পকে সর্তক করে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে ইংরেজি শব্দ ***Tithe*** -এর সাথে যাকাতের তুলনা হয়না। কারণ যাকাতের অর্থ সম্পূর্ণভাবে দরিদ্র মানুষের ভাগে যায়। ট্যাক্স শব্দও যাকাতের প্রতিশব্দ হতে পারে না। কারণ এটা রাষ্ট্র জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়। আর জনগণ সব সময় এটা ফাঁকি দিতে চায়। অথচ যাকাত দেবার ব্যাপারে মুসলমানরা সবসময় সচেতন থাকে। দান-দক্ষিণা এই শব্দগুলো যাকাতের কাছাকাছি। কিন্তু যাকাত মানে দান নয় বরং এটা ধনীদের সম্পদে গরীবের অধিকার, বস্তুত যাকাত শব্দটির অনুবাদ না করে এটিকে ধর্মীয় শব্দ হিসেবেই সংরক্ষণ করা উচিত।[৯]

৪.২ যাকাত দাতা

অর্থনীতির ইতিহাসে যাকাতই হচ্ছে পৃথিবীর সর্বপ্রথম নিয়মিত কর । এর পূর্বে করের জন্যে সুনির্দিষ্ট কোন নিয়মকানুনও দুনিয়ায় ছিল না তখনকার শাসকরা তাদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী কর ধার্য করতো এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ ও দরকার মত তারা আদায় করে নিত। আর এই করের সমস্ত বোঝা ধনীদের নয় কেবল গরীবদেরকেই বহন করতে হতো। ইসলাম এসে এই কর আদায়ের নির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি চালু করে। আল ইসলামই সর্বপ্রথম গরীবদেরকে বাদ দিয়ে কেবল ধনী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর কর আরোপ করে।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নোক্ত শর্তগুলো যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাদের যাকাত দেয়া বাধ্যতা মূলক:

সম্পদের উপর পূর্ণ মালিকানা থাকা

হালাল সম্পদ নিজ আয়ত্তে থাকা এবং অন্য কারো অধিকারে না থাকা এবং ইচ্ছেমত সম্পদ ভোগ ও ব্যবহার করতে পারাই হচ্ছে মালিকানা। সম্পদ উৎপাদনক্ষম হওয়া, যে সম্পদ উৎপাদনক্ষম বা বর্ধনশীল অথবা যার বৃদ্ধিপাওয়ার ক্ষমতা আছে সে সব সম্পদের যাকাত দিতে হবে। জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের বস্তুসমূহ যথা পোশাক,খাদ্য,আসবাব,বাড়ি-ঘর ইত্যাদির উপর যাকাত নেই। ভূমিতে উৎপন্ন শস্য, গৃহপালিত পশু, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদির উপর যাকাত ফরজ।[১১]

নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা

সাধারণভাবে ৫২.৫ তোলা রূপা বা সাড়ে ৭. তোলা সোনা কিংবা উভয়ের সম্মিলিত মূল্য ৫২.৫ তোলা রূপার সমান হলে বা উভয়টির সমমূল্যের সম্পদকে নিসাব বলে। এক্ষেত্রে ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে। যে জমিতে বিনা সেচে বা হস্ত চালিত সেচে চাষাবাদ হয় তার ফসলের যাকাত ১০% আর যে জমিতে যান্ত্রিক ভাবে সেচ দিয়ে চাষ করতে হয় তার ফসলের যাকাত ৫%।

মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থাকা

পরিবারের সারা বছরের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর পর অতিরিক্ত সম্পদের নিসাবের উপর যাকাত দিতে হবে। নিসাব পরিমাণ অর্থ হতে এক বছর বা তার বেশি সময় থাকতে হবে।

ঋণমুক্ত হওয়া

নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা যাকাত ফরয হওয়ার জরুরী শর্ত। তবে সংশ্লিষ্ট বৎসরে পরিশোধ যোগ্য ঋণ পরিশোধের পর বা ঋণের সমপরিমাণ সম্পদ বাদ দেওয়ার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলেই যাকাত দিতে হবে।

সম্পদ এক বছর থাকা

নিসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর থাকলেই যাকাত ফরয হবে । ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর ক্ষেত্রে বছর শেষে হিসাব সমাপ্তি দিবসে প্রণীত স্থিতিপত্রে বর্ণিত সম্পদ ও দায়- দেনার হিসাব অনুসারে যাকাত দিতে হবে।

যেসব সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে।

সোনা-রূপা

যেকোন পদ্ধতিতে সংরক্ষিত স্বর্ণ ও রৌপ্য যেমন গহনা, বাসন-কোসন, গোল্ডবার ইত্যাদি বানানোর মজুরীসহ দামের শতকারা ২.৫ ভাগ যাকাত দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

নগদ অর্থ

নগদ অর্থ সঞ্চয়পত্র, সিকিউরিটি, শেয়ার সার্টিফিকেট (ক্রয়মূল্য) বকেয়া পাওনা ঋণ (আদায়যোগ্য) ইত্যাদি। প্রচলিত ব্যাংক ও বীমায় রক্ষিত সঞ্চয়, জীবন বীমা এবং সঞ্চয়পত্র, প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদির প্রাপ্ত অর্থ থেকে সুদ পৃথক করে দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে বাকী টাকার যাকাত দিতে হতে।

ব্যবসায়ের মালমাল

ব্যবসায়ের মালামালের যাকাত নিরূপণ কালে বছরে শেষে হিসাব সমাপ্তি দিবসে যে পণ্য সামগ্রী ও কাঁচামাল মজুদ থাকবে তা সারা বছর ছিল ধরে নিয়ে তার উপর যাকাত দিতে হবে। এছাড়া ব্যবসায়ের উদ্দ্যেশ্যে ক্রীত জমি, মেশিন বা অন্যান্য সম্পদের যাকাত দিতে হবে।

কৃষি ফসল

ফসল কাটার পরই যদি তা নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে তার উপর যাকাত পরিশোধ করা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্তনয়। কৃষি ফসলের নিসাব হচ্ছে ৯৮৮.৮ কেজি বা ২৬ মন ২২ সের ১৫ ছটাক। প্রত্যেক শ্রেণীর ফসলের নিসাব পৃথক পৃথকভাবে হিসাব করে নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে।

গরু-মহিষ

নিজের কাজে ব্যবহৃত হয় বা বিচরণশীল নয় এমন গরু-মহিষ ব্যতীত ৩০ ও তার অধিক গরু মহিষের যাকাত দিতে হবে । প্রতি ৩০টির জন্য ১টি, ১বছর বয়সের গরু এবং ৪০টি বা তার অংশের জন্য ২ বছর বয়সের ১টি গরু।

ছাগল-ভেড়া

ছাগল ভেড়ার সংখ্যা ৪০টি হলে ১টি, ১২০টি পর্যন্ত ২টি, ৩০০টি হলে ৩টি এবং এরপর প্রতি ১০০টি ও তার অংশের জন্য আরো একটি যাকাত দিতে হবে।

লব্ধ গুপ্তধন

লব্ধ গুপ্তধনের ২০% যাকাত দিতে হবে। এক্ষেত্রে কোন নিসাব নেই এবং বছর অতিক্রান্ত হওয়াও জরুরী নয়।

ব্যবহৃত জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরনের বস্তু সমূহ যথা পোশাক, খাদ্য, আসবাব, বাড়িঘর ইত্যাদির যাকাত নেই। ভূমিতে উৎপাদিত শস্য, গৃহপালিত পশু, স্বর্ণ রৌপ্য নগদ অর্থ ইত্যাদির উপর যাকাত ফরজ। ইসলামে এটা স্পষ্ট যে জগতের সব কিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর[১২] তিনি বিশ্ব জাহানের প্রভু। তাই কেউই তাঁর সম্পদের মালিক নন বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে রক্ষক বা আমানতদার একমাত্র আল্লাহ তাঁর অপার মহিমায় বা দয়ায় মানুষকে সম্পদ দেন। কিন্তু এই সম্পদ হচ্ছে এক পরীক্ষা। মানুষকে যোগ্যতা ও পরিশ্রমের পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ সম্পদ দেবেন। আবার মানুষ সম্পদ থেকে আল্লাহর আদেশে দরিদ্রদের প্রাপ্য অংশ দেবে।

Dhaka University Institutional Repository

যারা এটা করবে তারা পুরস্কৃত হবে। আর যারা সম্পদের মোহে আল্লাহর আদেশ ভুলে যাবে তারা আল্লাহর আমানতের খেয়ানত করবে। অবশ্য সম্পত্তির মালিকানা প্রসঙ্গে "UN Universal Declaration of Human Rights Article 17" ঘোষণা করেছে- 'Everyone has the right to own profit properly alone as well as in association with others. No one shall be arbitrarily deprived of his property"[১৩] উল্লেখ্য সম্পত্তি সম্পর্কে ইসলামের প্রথম মৌলিক নীতিমালা হলো যে, সকল সম্পত্তির মালিক আল্লাহ (আল কুরআন ১১:১০৭, ৩১:২০) বস্তুত কোন সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক জীবন কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন তা বিশ্বের অন্যান্য ধর্মের চেয়ে ইসলাম বিশদভাবে বর্ণনা করেছে।[১৪] সুতরাং আল্লাহ যেহেতু অনুগ্রহপূর্বক মানুষকে সম্পদ দেন, তাই মানুষের উচিত আল্লাহ নির্দেশিত পথে অর্থের ব্যয় করা।

৪.৩ যাকাত ব্যয়ের খাত সমূহ

আল কুরআনে নবম সূরার ৬০ নং আয়াতে আটটি খাতের কথা বলা হয়েছে। কুরআন বলছে-"যাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্যে-ঋণ গ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জেহাদ কারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্যে, এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।"

নিম্নে সংক্ষেপে সাদকা বা যাকাত ব্যয়ের খাত সমূহের বর্ণনা দেয়া হলো–

ফকীর

ফকীর ঐ সকল লোক যারা স্বীয় জীবিকার ব্যাপারে অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। ডঃ ইউসুফ আল-কারযাভীর মতে, ফকীর সেই ব্যক্তি যার কাছে কিছুই নেই অথবা যদিও থাকে তা তার এবং তার পরিবারে প্রয়োজনের অর্ধেক পূরণ করে।

মিসকীন

মিসকীন শব্দের মধ্যে দীনতা, দুর্ভাগ্য পীড়িত অভাব,অসহায়তা ও লাঞ্ছনার অর্থ নিহিত রয়েছে। নিম্নোক্ত হাদীসে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে: "যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ- সম্পদ পায়না, যাকে সাহায্য করার জন্য চিহ্নিত করা যায়না এবং যে নিজে দাঁড়িয়ে কারোর কাছে সাহায্যও চায়না, সে-ই মিসকীন।" (আল হাদীস) অর্থাৎ সে একজন সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র গরীব মানুষ।[১৫]

আমিলুন

যাকাত সংগ্রহ, যাকাত বিতরণ, যাকাত তহবিল ও হিসাব পত্র সংরক্ষন এবং যাকাত দপ্তরে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণই আমিলুন। এদের বেতন যাকাত তহবিল থেকে দেয়া যাবে।

মন জয় করার জন্য

ইসলাম বিরোধীদের বিরোধীতা স্তিমিত করতে অমুসলিমদেরকে মুসলমান বানাতে কিংবা নও মুসলিম যাতে আবার কুফরীর দিকে ফিরে না যায় তা নিশ্চিত করতে তাদের মন খুশি করতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

দাসমুক্ত করা

দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্ত করতে কিংবা মিথ্যা মামলার শিকার হয়ে অর্থাভাবে বন্দী জীবন যাপন কারীদের মুক্ত করতে অথবা অন্যায় ভাবে হয়রানির শিকার হলে তাদেরকে যাকাতের অর্থ দেয়া বৈধ।

ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ

ঋণের ভারে জর্জরিত ব্যক্তিদেরকে ঋণমুক্ত করতে এ অর্থ ব্যয় করা যায়, তবে শর্তে এই যে, উক্ত ব্যক্তি অন্যায় ও ভোগ-বিলাসের কারণে ঋণগ্রস্ত হতে পারবে না। এছাড়া এ দিকটিও নিশ্চিত করতে হবে যে, ঐ ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়েছে কিনা। অন্যথায় যাকাত গ্রহণের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ অভ্যাসে পরিণত হতে পারে।

আল্লাহর পথে

কোন রাষ্ট্রে ইসলাম কায়েম করতে কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের ইসলামী হুকুমাতকে মজবুত করার জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে যাকাত দেয়া যায়। একাজে সার্বক্ষনিক নিয়োজিত কোন ব্যক্তি স্বচ্ছল হলেও যাকাত গ্রহণে কোন দোষ নেই।

পথিক প্রবাসী

যতই স্বচ্ছল হোক না কেন মুসাফির ও প্রবাসী পথে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে যাকাত গ্রহণ করতে পারেন।

যাকাত প্রদানের সময়

যাকাত প্রতি বছর প্রদান করতে হয়। তবে গুপ্তধন ও খনিজ সম্পদের যাকাত সাথে সাথে দিতে হবে। জমির শস্যের ক্ষেত্রে ফসল কাটার পর যাকাত দিতে হবে। রমজান মাসে যাকাত যাকাত দেয়া উত্তম। কারণ এটা রহমতের মাস। যাকাত কিস্তিতে দেয়া যাবে।

৪.৪ যাকাত দান ও গ্রহণ সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক

যাকাত দান ও গ্রহণ উভয়ই সামাজের জন্য উপকারী বিষয়। যাকাত গ্রহণে গ্রহীতা যে উপকৃত হচ্ছে সে বিষয়ে কারোরই দ্বিমত থাকার কথা নয়। কারণ পৃথিবীতে আল্লাহর সৃষ্ট জীব হিসেবে সকলে মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।[১৬] আবার পৃথিবীতে কিছু মানুষ জন্মগত ভাবে কিংবা যোগ্যতার তারতম্যে সবসময় আল্লাহর অনুগ্রহ লাভে সক্ষম হয়না। ফলে যারা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রয়োজনের অতিরিক্ত লাভ করে তাদের নিকট থেকে অনুগ্রহ বঞ্চিতরা কিছু সুবিধা পেয়ে থাকে। তবে এ সুবিধা পাওয়া ধনীদের পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহ নয়; বরং তাদের হক।[১৭] এ সুবিধা তারা পায় যাকাত বা সাদকা হিসেবে। এতে তারা জীবন জীবিকার উপাদান সমূহ সংগ্রহ করতে পারে। ফলে সমাজে কোন বিশৃংখলা (চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি) ছাড়াই তারা সম্মানের সাথে টিকে থাকতে পারে যা শান্তিময় পৃথিবী গড়ার জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া যাকাত গ্রহণের ফলে যাকাত গ্রহীতার ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ফলে সে শিল্প বা কৃষিপণ্য অধিক পরিমাণে ক্রয় করতে পারে (যার মালিক হয়ত ঐসব যাকাত দাতাই যারা তাদের যাকাত দিয়েছিল) যা শিল্প ও কৃষি পণ্যের উৎপাদান বাড়িয়ে দিবে। উৎপাদন বাড়লে আয়ও বাড়বে। আয় বাড়লে যাকাতের পরিমাণ বাড়বে ফলে দরিদ্র ও অভাবী লোকদের ক্রয়ক্ষমতা ও ক্রয়প্রবণতা বাড়বে। যা উৎপাদন ও উৎপাদনকারীর আয় বাড়াবে। এভাবে দারিদ্রের দুষ্টচক্র হতে স্বচ্ছলতার শুভচক্র নামক একটি চক্র সমাজ জীবনে প্রতিভাত হবে যা সমাজে সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে। কারণ এভাবে সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমবে। যা বর্তমান বিশ্ব সমাজে প্রকট আকারে বিরাজ করছে। অপর পক্ষে মহান সৃষ্টি কর্তার বিশেষ রহমতে দরিদ্র ও অভাবী লোকেরাও একসময় তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়ে তারাও যাকাত দানের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

উল্লেখ্য স্বীয় জীবিকা উপার্জন করা একজন মুসলমানের দায়িত্ব। যাকাত বিতরণ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন একজন গরীব লোক যাকাতের অর্থ দ্বারা নিজের পায়ে দাঁড়ায়ে যেতে পারে। নিজের চেষ্টায় যারা যথেষ্ট পরিমাণে জীবিকা উপার্জন করতে পারে না তাদের জন্য যাকাত যেন একটি স্থায়ী আয়ের উৎস হয়ে থাকে। এমন একটি আর্থ-সামজিক পরিবেশ যেখানে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে উৎসাহ প্রদান কারা হয়, সেখানে যাকাত ব্যবস্থা আত্ন-কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং বৈষম্য কমাতে মূল্যবান অবদান রাখবে।[১৮]

সোনারূপা এবং জমা টাকাসহ সকল সম্পদের উপর ধার্যকৃত যাকাত যেন যাকাত প্রদান কারীর সম্পদ না কমায় সে জন্য অধিক উপার্জনে সচেষ্ট হওয়ার জন্য যাকাত প্রদানকারীকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। এরূপ উৎসাহের ফলে বিনিয়োগ করার জন্য তহবিল পর্যাপ্ততা বৃদ্ধি পাবে। এমনিভাবে যে সমাজে ইসলামী মূল্যবাধ গেঁড়ে বসবে সেখানে সোনা, রূপার ও জমা টাকার পরিমাণ কমে যাবে এবং বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।[১৯] বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। আর এ উন্নয়ন হবে সুষম। কারণ এ ধরণের অর্থনীতিতে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান কমে যাবে এবং পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে। ধনীদের প্রতি দরিদ্রের ঈর্ষা বা ক্ষোভ প্রশমিত হবে। সবার মাঝে মানসিক প্রশান্তি বিরাজ করবে এবং সমাজ হবে উন্নত। উন্নত সমাজে উন্নয়ন সুষম হবে এটাই সবার প্রত্যাশা।

বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন যা হচ্ছে তা প্রকৃত উন্নয়ন নয়। কারণ কিছু কিছু দেশে উন্নয়ন হলেও তা পৃথিবীর সকল দেশে যেমন হচ্ছে না, তেমনি আমাদের দেশের উন্নয়ন কিছু কিছু হলেও তা সার্বিক উন্নয়ন নয়। কারণ এক অঞ্চলে মানুষ যদি উন্নত হয় তো এর অন্য অঞ্চলের মানুষ অনুন্নত যার পরিণতিতে দূর্ভিক্ষের মত ঘটনা ঘটে। দূর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে অনেকে সম্পদের অভাব মনে করলেও ১৯৯৮ সালে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেন তার লেখা **Poverty and Famine** গ্রন্থে দেখিয়েছেন- সম্পদের অভাব নয় এবং সম্পদ দেশে কম থাকায় নয়; বরং সম্পদ যথাসময়ে যথার্থভাবে প্রয়োজনীয় স্থানে না পৌছানোর কারণে দূর্ভিক্ষ হয়। যেমন ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলের দূর্ভিক্ষের কারণ

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন সম্পদের অভাব নয় বরং যোগাযোগ সমস্যার কারণে যথাসময়ে সম্পদ দুর্গত এলাকায় না পৌছায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। যাহোক বর্তমান সময়েও দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশে কিছু লোক মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় ভোগ ব্যয় করছে। অপর পক্ষে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ যোগাড় করতে অনেককে বেছে নিতে হচ্ছে অন্যায় সব পথ কিংবা অনেকে মানবেতর জীবন যাপন করছে।

এক্ষেত্রে যদি যাকাত পদ্ধতি সঠিকভাবে চালু হয় তাহলে ধনী- দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস পাবে। ফলে বিনিয়োগ, উৎপাদন, আয়, বন্টন সবই হবে সুষম। যা প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে, ত্বরান্বিত করবে। আর একটি দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলে তা রাজনৈতিক উন্নয়নকেও করবে তরান্বিত যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

যাকাত দাতার যাকাত দানের মাধ্যমেও সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। যাকাত দাতার অর্থেরও পরিশুদ্ধি ঘটায়।[২০] তার অর্থে কোন অবৈধ অংশ থাকেনা। কারণ যিনি আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে সঠিক নিয়মে যাকাত পরিশোধ করবেন তিনি কখনও অবৈধ পথে সম্পদ উপার্জন করবেন কি? তিনি সঠিক নিয়মে সবার পাওনা পরিশোধ করবেনা। তার উৎপাদানশীল প্রতিষ্ঠানে যেমন-কল কারখানায় যারা কাজ করবে তিনি তাদের পাওনা সঠিকভাবে পরিশোধ করবেন। ফলে শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে ভাল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং কারখানায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন হবে সুষম। এমন ব্যক্তির সংখ্যা সমাজে যত বৃদ্ধি পাবে সমাজ ততই উন্নত হবে এবং উন্নয়ন হবে সুষম।

যাকাত সম্পদের পরিশুদ্ধি ঘটায়

যাকাত শুধু গরীবদের পাওনাই মিটায় না এটা পরিশুদ্ধিও আনে। যেমন-

১) ধনীরা তাদের সম্পদ থেকে গরীবদের অংশ দিয়ে পুরো সম্পদকে বিশুদ্ধ করে।

২) যারা যাকাত দেয় তাদের অন্তর স্বার্থপরতা কৃপণতা, সমাজ-সচেতনতা ও দুনিয়া প্রীতি থেকে পরিশুদ্ধি হয়।

৩) যাকাত গ্রহীতার অন্তর ধনীদের প্রতিহিংসার ও ঘৃণা থেকে মুক্ত হয়।

৪) সমাজ বহুলাংশে পরিশুদ্ধ হয়। কারণ যাকাতের মাধ্যমে সমাজের দারিদ্রতা, সামাজিক অবিচার।

শ্রেণী-বৈষম্য ইত্যাদি দূর হয়। যদি ধনীরা আরো ধনী আর গরীবরা আরো গরীব হতে থাকে তবে সমাজে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। এমন সমাজে বিশৃংখলা দ্বন্দ্ব- সংঘাত ও ধ্বংসাত্মক প্রবণতা মাথাচারা দিয়ে ওঠে।[২১]

যাকাতের মাধ্যমে যে ধরণের অবস্থার অবতারণা হয় তা অন্য কোন ভাবে হয়না যেমন প্রচলিত কর ব্যবস্থায় দেখা যায় কর দান অপেক্ষা কর ফাঁকির প্রতি সাধারণ মানুষের ঝোক বেশি বিশেষ করে যাদের কর দান যোগ্য সম্পদ বেশি। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা গেছে স্বল্প আয়ের চেয়ে অধিক আয়ের লোকদের কর ফাঁকির প্রবণতা বেশি। তারা বিভিন্ন রকমের দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে এ কাজটি করে থাকে। অথচ এসব ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ সঠিক ভাবে যাকাত প্রদান করে। অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। তাছাড়া যাকাতের অর্থ দরিদ্র ও অভাবী মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারে।

৪.৫ সামাজিক নিরাপত্তায় যাকাত

সামাজিক নিরাপত্তায় যাকাত অনন্য ভূমিকা পালন কারে। আধুনিক সামজের অন্যান্য আত্মঅর্থায়ন কর্মসূচীর সাথে সামাজিক আত্ম-নির্ভরশীলতার এই পদ্ধতি বেকার, দুর্ঘটনা কবলিত বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধীদেরকে সামাজিক বীমা বা নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। যাকাত ব্যবস্থা মসুলিম দেশগুলিকে কর্মচারীদের বেতন থেকে অর্থ কেটে নিয়ে বা তাদের দান গ্রহনের মাধ্যমে সকলের প্রয়োজন পুরণের ব্যবস্থা গ্রহণে সর্মথন যুগিয়ে থাকে। ফলে সরকারি কোষাগারের উপর চাপ সৃষ্টি হয়না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে অনুরূপ খরচ বহনের ক্ষেত্রে সরকারি কোষাগারের উপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি হয়।[২২] যে সমাজে সুষ্ঠু যাকাত ব্যবস্থা কার্যকর থাকে সেখানে প্রচলিত পদ্ধতির জীবন বীমার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ আজ যাদের সামর্থ আছে তারা যাকাত দিবে। আর যাদের সামর্থ নেই রবং যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত তারা যাকাত গ্রহণ করবে। আবার এই দরিদ্র শ্রেণী স্বচ্ছলতা অর্জন করে যাকাত দাতা হতে পারে। অপর পক্ষে পূর্বের যাকাত দাতা শ্রেণী যদি দরিদ্র হয়ে যায় তাহলে তারা যাকাত পাবে।[২৩] অর্থাৎ তাদের সামাজিক নিরাপত্তা যাকাত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে হবে এবং তাদের প্রচলিত জীবন বীমার প্রয়োজন হবে না। মূলত এভাবেই ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা সামাজিক নিরাপত্তা সৃষ্টিকরে।

ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগার

ইসলামী রাষ্ট্রে স্বয়ং সর কারণ গরীব ও অভাবীদের মধ্যে যাকাতের অর্থ বন্টন করে দেয়। ধনী লোকেরা নিজেরা এটা করে না। এ যেন এমন এক প্রকার কর যা স্বয়ং সরকার আদায় করে এবং সরকারই তা সাধারণ লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়। ইসলামী রাষ্ট্রে কোষাগারকেই সেই সকল দায়িত্বই পালন করতে হয় যা বর্তমান সরকারগুলোর রাজস্ব মন্ত্রণালয়কে সম্পাদন করতে হয়। এটা এক দিকে বিভিন্ন অর্থ ও কর জনসাধারণের নিকট থেকে আদায় করে এবং অন্যদিকে তাদেরই সুখ স্বচ্ছন্দ্র ও কল্যাণের জন্যে তার বিলি-বরাদ্দের দায়িত্ব পালন করে। যারা আয়- উপার্জনে অক্ষম, অথবা যাদের আয় অত্যধিক সীমিত বা অপর্যাপ্ত তাদের জীবন জীবিকার প্রতিও উহাকে লক্ষ্য রাখতে হয়। স্মরণীয় যে, সরকার যে এ শ্রেণীর অক্ষম ও অভাবীদের সাহায্য প্রদান করে তাতে অনুগ্রহ বা এহসানের কোন প্রশ্ন নেই। তাই উহা গ্রহণ কারার লাঞ্ছনার বা অবমাননারও অবকাশ নেই। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী- যারা চাকুরী থেকে অব্যাহতি নেয়ার পরেও সরকারের নিকট পেনশন বা গ্র্যাচুয়িটি গ্রহণ করে-এবং যে সকল কারিগর কল্যাণ তহবিল থেকে বা স্যোস্যাল সিকিুইরিটি স্কীমের আওতায় অর্থ সাহার্য্য লাভ করে তাদের সম্পকে তো কেউ এ ধারণা পোষণ করে না যে,খয়রাত গ্রহণ করছে। তাহলে সেই সকল অসহায় শিশু, প্রতিবন্ধী যুবক ও অক্ষম বৃদ্ধ লোকদের সম্পর্কে কেমন করে বলা যেতে পারে যে, তারা ভিক্ষা হিসেবে সরকারি সাহায্য পাচ্ছে? সরকার যখন তাদের

Dhaka University Institutional Repository

অক্ষমতার কথা বিবেচনা করে আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করবে তখন তাতে অসম্মানের কী থাকতে পারে? কেননা সরকার তো জনগণের অর্থ জনগণের সেবায় ব্যয় করে মানবিক দায়িত্ব পালন করছে মাত্র।

সামাজিক কল্যাণ ব্যবস্থা ও ইসলাম

আজকাল কল্যাণ তহবিল প্রতিষ্ঠার যে প্রথা চালু হয়েছে তার পশ্চাতে রয়েছে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার তিক্ত অভিজ্ঞতা, রয়েছে সামাজিক বৈষম্য ও বে-ইনসাফীর এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। ইসলামের একচ্ছত্র গৌরবের একটি বড় প্রমাণ এ যে, ইসলাম এই সামাজিক কল্যাণ ব্যবস্থা এমন এক যুগে চালু করেছে যখন গোটা ইউরোপ সামাজিক দিক থেকে ছিল গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। কিন্তু যারা পাশ্চাত্য বা প্রাচ্যের ধার করা মতাদর্শের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাদের মানসিক গোলামীর বহর এই যে, ইসলাম পূর্ব থেকেই তাদের পছন্দনীয় কোন ব্যবস্থাপনাকে গ্রহণ করে থাকে তবুও ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ বা কুধারণা বিন্দুমাত্রও দূর হয় না। বরং তাকে তারা বর্বরতা, কুসংস্কার বা প্রতিক্রিয়াশীলতা বলে গণ্য করতে থাকে।

যাকাতের বণ্টন ও ইসলাম

ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে যাকাতের হকদার ব্যক্তিরা নিজেরাই যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করতো। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত বণ্টনের একমাত্র রীতি হলো যাকাতের হকদাররাই ঘুরে ঘুরে যাকাতের অর্থ গ্রহণ করবে, অন্য কোন পন্থায় যাকাতের লেন-দেন হতে পারে না। ইসলামী আইনে এমন কিছু নেই যাতে করে এটা প্রমাণিত হতে পারে। ইসলামে যাকাতের অর্থ দ্বারা জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান যেমন–শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপন করা যেতে পারে। পারস্পরিক সাহায্যেও বিভিন্ন সংস্থা কায়েম করা যেতে পারে, কারখানা ইত্যাদিও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, অন্য কথায়, যাকাতের অর্থ সমাজ কল্যাণের যে কোন কার্যেই ব্যয়িত হতে পারে। যাকাতের অর্থ থেকে দ্রব্যে বা নগদ সাহায্য কেবল অসুস্থ, বৃদ্ধ এবং শিশুদেরকে দেয়া হয়। কিন্তু অন্যান্য লোকদের সাহায্য তাদের উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেয়ার কিংবা তাদের কল্যাণের জন্যে যে কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে হয়। কেননা ইসলামী সমাজই এমন একটি সমাজ যেখানে শুধু যাকাত দ্বারা জীবিকা নির্বাহের কোন গরীব শ্রেণীর পৃথক অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ইসলামী সমাজের আদর্শ যুগ

হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রাঃ)- এর খেলাফতকালেও ইসলামী সমাজের আদর্শ যুগ বলে পরিচিত। সে যুগে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা এতদূর উন্নত হয়েছিল যে, যাকাতের অর্থ আদায় করে যাকাত গ্রহীতাকে ঘুরে ঘুরে তালাশ করা হতো। কিন্তু যাকাত গ্রহণ করতে পারে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যেত না। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রাঃ)-এর যাকাত বিভাগের কর্মকর্তা হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বলেন:

"হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রাঃ) আমাকে যাকাত আদায় করার জন্যে আফ্রিকায় প্রেরণ করেন। আমি যাকাত আদায় করে গরীব ব্যক্তিদের খোঁজ করলাম। আমি কোন গরীব লোক পেলাম না এবং

Dhaka University Institutional Repository

যাকাতের এমন কোন হকদারও পেলাম না যে যাকাত নিতে আসে। কেননা হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রাঃ) লোকদের সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী করে দিয়েছিলেন।"

এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে, প্রত্যেক সমাজেই গরীব ও অভাবী লোক থাকবে। সুতরাং তাদের সমস্যার সমাধানের জন্যে যথোপযুক্ত আইনও থাকতে হবে। বিভিন্ন সময়ে ইসলামের সাথে যে সকল জাতি সংযুক্ত হতে থাকে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল বিভিন্ন ধরণের। কাজেই এটাই ছিল একান্ত স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত যে, ইসলাম এমন ভাবে আইন রচনা করবে যাতে করে মদীনা রাষ্ট্র , চার খলিফার শাসনামল ও হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রাঃ)- এর সময়কার সমাজের ন্যায় আদর্শ সমাজ গঠিত হতে থাকবে।

দানের তাৎপর্য

এতক্ষণ আমরা যাকাত সম্পর্কে আলোচনা করেছি। 'সাদাকাত' বা দান যাকাত থেকে পৃথক একটি জিনিস। এ হচ্ছে এমন এক সম্পদ যা ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ব্যক্তি কল্যাণ বা সমাজ সেবার উদ্দেশ্যে প্রদান করে থাকে। ইসলাম 'সাদাকাত'কে শুধু পছন্দই করে না বরং এটাকে উৎসাহিতও করে। ইসলাম এর জন্য বিভিন্ন পন্থা নির্দেশ করেছে যেমনঃ পিতা- মাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করা, সাধারণ অভাবগ্রস্ত লোকদের অভাব মোচন করা। এখানেই শেষ নয়, সৎ ও মহৎ কাজ এবং স্নেহ-মমতা ও সহানুভূতিসূচক কথা-বার্তাও 'সাদাকাত'বলে গণ্য।

দানের মূল প্রেরণা

আমরা যদি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করি কিংবা তাদের সাহায্য করি তাহলে তারা কি মানসিকভাবে আহত হবেন? তাদের আত্মসম্মানে কি আঘাত লাগবে?– কখনো না। আত্মীয়-স্বজনদের জন্যে ভালোবাসা, হামদর্দি ও স্নেহ-মমতা থাকলেই কেবল মানুষ এ ধরণের বদান্যতা প্রদর্শন করতে পারে। অনুরূপভাবে কেউ যদি ভাইকে উপহার দেয় কিংবা কোন বন্ধুকে দাওয়াত দেয় তাহলে এতে করে কারোর এমন অমর্যাদা করা হয়না যে, অবশেষে এটাই এক সময়ে ঘৃণা বা শত্রুতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

নগদ যাকাত

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যাকাতের জন্যে যে বিধান ও নিয়ম চালু ছিল দানের অর্থ নগদ দেয়ার ক্ষেত্রেও তা-ই চালু ছিল। তখন এমনই এক পরিবেশ ছিল যে, নগদ হাদিয়া (বা উপহার) হিসেবে অভাবী লোকদের নিকট তা পৌঁছিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু ইসলামের এমন কোন বিধান ছিল না যার ভিত্তিতে একথা বলা চলে যে, দান শুধু ঐরূপ নির্দিষ্ট নিয়তেই সম্পন্ন করতে হবে। বরং সমাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কাজ করবে সবগুলোর পক্ষ থেকেও এটা আদায় করা যেতে পারবে। অনুরূপভাবে যাকাতের অর্থও ইসলামী রাষ্ট্রকে সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন 'প্রজেক্ট' ও 'স্কীম' বাস্তবায়নের জন্যে দেয়া যাবে। ইসলামের লক্ষ্যই হলো ঃ যতদিন পর্যন্ত সমাজের কেউ গরীব থাকবে ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্র সকল সম্ভাব্য উপায়ে অধিক হতে অধিকতর আর্থিক সুবিধা দানের ব্যবস্থা করতে থাকবে। তবে ইসলাম এটা কখনো চায়

Dhaka University Institutional Repository

না যে, সমাজে গরীব ও অভাবীদের একটি শ্রেণী সর্বদা বর্তমান থাকুক, বরং চায় সমাজে গরীব বা অভাবী বলতে যেন কেউই না থাকে। বস্তুত ইসলামের আদর্শ সমাজে যাকাত বা দান গ্রহণের জন্যে অভাবী লোক তালাশ করা হয়, কিন্তু কাউকেই সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রাঃ)-এর আদর্শ যুগেই আমরা দেখতে পাই ঃ যাকাত বা দান গ্রহণ করা মত কোন অভাবী লোক ইসলামী রাষ্ট্রের কোথাও নেই। গোটা সমাজ থেকে দারিদ্র ও অভাব-অনটন যখন নির্মূল হয়ে যায় তখন যাকাত ও দানের অর্থ সমাজসেবার বিভিন্ন এবং আয়-উপার্জনে অক্ষম সকল প্রকার প্রতিবন্ধীদের সম্মানজনক জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়।

অনুগ্রহ, অবশ্যকরণীয় কর্তব্য

ইসলাম মুসলামানদেরকে শুধু যাকাত ও দানের অর্থ প্রদান করেই ক্ষ্যান্ত থাকতে শিখায় না। এটা রাষ্ট্রকে এ দায়িত্ব অর্পণ করে যে, রাষ্ট্রে বসবাসকারী ঐ সকল নাগরিকদের মানবীয় ও সম্মানজনক জীবনযাপনের ব্যবস্থা করবে যারা–যে কোন কারণেই হোক– উপার্জন করতে অক্ষম। অন্য কথায়, এদেরকে সাহায্য করে ইসলামী রাষ্ট্র কোন অনুগ্রহ প্রকাশ করে না, বরং ইসলাম কর্তৃক অর্পিত গুরুদায়িত্ব পালন করে মাত্র।

৪৩৭৭৪০

উপার্জনের পথ ও ইসলামী সরকার

ইসলামী রাষ্ট্রকে আরো একটি গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয় যে, যারা উপার্জন করতে সক্ষম তাদের সকলের জন্যেই কাজের সংস্থান করে দিতে হবে। হযরত বিশ্বনবী (সাঃ)-এর একটি হাদীস দ্বারাই ইসলামী রাষ্ট্রের এই দায়িত্ব প্রামাণিত হয়। উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "এক ব্যক্তি হযরত (সাঃ)-এর নিকট এসে কিছু সাহায্যেও আবেদন করলো। তিনি তাকে একটি কুঠার ও এক গাছা দড়ি দিয়ে বললেন ঃ জংগলে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করবে এবং তা বিক্রয় করে দিনাতিপাত করবে। তিনি তাকে একথাও বললেন যে, কিছুদিন পরে যেন সে তার অবস্থার কথা তাঁকে জানায়।"

কেউ কেউ হয়ত এই হাদীসকে নিছক একটি ব্যক্তিগত ঘটনা বলে উড়িয়ে দিতে পারে। বর্তমানে বিংশ শতাব্দীর সাথে যাদের কোন সম্পর্ক নেই তারাই এরূপ করতে পারে। কেননা এই হাদীসে একটি কুঠার, এক গাছা দড়ি এবং একজন দরিদ্র বেকার মানুষের কথাই বলা হয়েছে– অথচ আধুনিক যুগে আমরা সামনে দেখছি বড় বড় কারখানা, লক্ষ লক্ষ বেকার শ্রমিক, শৃংখলাপূর্ণ সরকার এবং সাজানো- গুছানো কত বিভাগ-উপবিভাগ। সুতরাং মামুলি একটি হাদীসের অবতারণা নির্বুদ্ধিতা বই কি? কেননা হযরত বিশ্বনবী (সাঃ)–এর পক্ষে এ কাজ সম্ভবপর ছিলনা যে, তিনি সহস্রাধিক বছর পূর্বে দুনিয়ার বুকে যখন কল-কারখানার কোন অস্তিত্বই ছিল না– বড় বড় শিল্প বা কারখানা সম্বন্ধে কোন কথা বলবেন অথবা ঐগুলোর সংশ্লিষ্ট কোন আইন-কানুন রচনা করবেন। তিনি যদি এরূপ করতেন তাহলে ঐ সময়ে কোন লোকই এটা বুঝতে সক্ষম হতো না। এরূপ পদ্ধতি অবলম্বনের পরিবর্তে শরীয়াতের বিধানদাতা কেবল জীবন পদ্ধতির মূল ভিত্তিগুলোরই

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপিত করেছেন এবং বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলোর সামাধান এই মূল ভিত্তির আলোকে বের করার দায়িত্ব ভবিষ্যত প্রজন্মের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

ইসলামী সরকারের কল্যাণকর ভূমিকা

পূর্বে যে হাদীসটির বরাত দেয়া হয়েছে তার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের নিম্নলিখিত দায়িত্বের উপর আলোপাত করা হয়েছে:

১) হযরত বিশ্বনবী (সা.) (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান) এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে, বেকার লোকের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত।

২) হযরত বিশ্বনবী (সাঃ) অবস্থা ও পরিবেশ অনুযায়ী সেই লোকের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

৩) হযরত বিশ্বনবী (সাঃ) যখন ঐ ব্যক্তিকে ফিরে আসার এবং তার অবস্থা জানাবার হুকুম দেন তখন সে ব্যক্তিও নবী (সাঃ)-এর দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে যায়।

রাষ্ট্রপ্রধানের এই দায়িত্ব সচেতনতা- যার উজ্জল দৃষ্টান্ত ইসলাম আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে সমস্ত বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরেছে- সর্বাধুনিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।

ইসলামী রাষ্ট্র যদি বেকার নাগরিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারে তাহলে তাদের অর্থনৈতিক দূরবস্থা দূর না হাওয়া পযর্ন্ত তাদের জীবন ধারণের যাবতীয় ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সরকারি বায়তুলমালের উপর অর্পিত হয়। এর একমাত্র কারণ হলো ঃ মুসলমানগণ তো নিজেদের ব্যাপার হোক কিংবা রাষ্ট্র তথা অন্যান্য নাগরিকদের বিষয় হোক সকলের সাথে মহত্ব ও উদারতা প্রদর্শনের আদর্শই স্থাপন করে এসেছে।[২৪]

যাকাত আল্লাহর পথে ব্যয়

যাকাত শব্দটি দ্বারা স্বত:ই প্রমাণিত যে, ধনীদের নিকট যে সম্পদ সঞ্চিত হয়ে আছে তা থেকে নির্দিষ্ট হারে আল্লাহর পথে ব্যয় না করলে তার সম্পদ পবিত্র ও হালাল হয় না (৯:১০৩)

আল্লাহর পথে ব্যয় অর্থ এই নয় যে আল্লাহ সরাসরি তা গ্রহণ করবেন। কারণ আল্লাহ সকল প্রয়োজনের উর্দ্ধে। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন বরং আমরা সবাই তার মুখাপেক্ষী। তার পথ এই যে, সম্পদশালী নিজের অর্থ ব্যয়ের সাহায্যে নিজেই গরীব ও অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে সচ্ছল করতে চেষ্টা করবে এবং এমন কল্যাণকর কাজের উন্নতি বিধানে তা ব্যয় ও বিনিয়োগ করবে, যার কল্যাণ নির্বিশেষে গোটা জাতিই লাভ করতে সমর্থ হবে।

সামাজিক নিরাপত্তা যেভাবে

আল কুরআন নির্দেশিত আটটি খাতে যাকাত ব্যয় যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এভাবেই যাকাত হচ্ছে মুসলমানদের সমবায়, পারস্পরিক-সাহায্য সংস্থা। আর এটাই তাদের "জীবন বীমা। এটা তাদের প্রভিডেন্ড ফান্ড- এর কাজ করে থাকে। এটা তাদের বেকার উপার্জনহীন লোকদের জন্য সঞ্চিত সাহায্য ফাণ্ড। তাদের

Dhaka University Institutional Repository

অক্ষম, পংগু, লুলা, রুগ্ন, ইয়াতীম ও বিধবাদের লালন- পালনের উপায়। সর্বোপরি যাকাত এমন এক ব্যবস্থা যা একজন মুসলিমকে ভবিষ্যতের চিন্তা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত করে। এর সহজ সরল নিয়ম এইযে, তোমরা- যারা এখন সম্পদশালী অপর লোকদের সাহায্য কর। ভবিষ্যতে তোমরাও যদি দরিদ্র হয়ে পড়, তাহলে অপর লোকেরা তোমার সাহায্য করবে। গরীব হয়ে গেলে যে কি অবস্থা হবে, মারা গেলে স্ত্রী-সন্তানের কি দশা হবে, আকস্মিক কোন বিপদ আসলে, রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে, আগুনে ঘর-বাড়ি জ্বলে-পুড়ে গেলে, বন্যায় ভেসে গেলে কিংবা দেউলিয়া হয়ে গেলে যে কি অবস্থা হবে কি ভাবে এই কঠিন বিপদসমূহের সাথে মুকাবিলা করা যাবে, বিদেশে পাথেয়হীন হয়ে পড়লেই বা কি অবস্থা দেখা দিবে কিভাবে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব হবে, সেই সম্পর্কে কারো চিন্তা-ভাবনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা এই সকল প্রকার চিন্তা-ভাবনা হতে একমাত্র যাকাতই মানুষকে নিষ্কৃতি দিতে পারে এবং নিশ্চিন্ত করতে পারে। মানুষের কাজ শুধু এতটুকু যে, তারা নিজেদের সঞ্চিত ধন-সম্পদ হতে শতকরা আড়াই টাকা দান করে আল্লাহ্‌র জীবনবীমা কোম্পানীতে নিজের জন্য বীমা করে নিবে। কেননা এখন এ টাকা তার না হলেও চলতে পারে। এখন এটা অপরাপর অভাবগ্রস্তদের কল্যাণে ব্যয়িত হবে। আর ভবিষ্যতে যে যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে কিংবা তার সন্তান-সন্ততি কঠিন অভাবে পড়ে যায়, তবে কেবল তার দেওয়া সম্পদই নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি ফিরিয়ে দেয়া হবে।

পুঁজিবাদের সাথে ইসলাম

উল্লেখিত বর্ণনায় অনেকে বিশেষ করে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বক্তারা বলতে পারেন-এটা সম্ভব নয়। কিন্তু তাদের জ্ঞাতার্থে বলা যায় যে একমাত্র ইসলামী অর্থনীতিতে এটা সম্ভব তবে বর্তমানে মুসলিম অর্থনীতিত নয়। কারণ ইসলামী-রাষ্ট্র এবং মুসলিম রাষ্ট্র এক নয়। যা পূর্বে আলোচনা হয়েছে। পুঁজিবাদ ও ইসলামের রীতি-নীতি ও কর্ম পদ্ধতির মধ্যে সামগ্রিক বিরোধ ও বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। পুঁজিবাদের লক্ষ্যে হচ্ছে ধন-সম্পদ সংগ্রহ-সঞ্চয় করা, এর বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সুদ গ্রহণ যেন এসব লোকদের নিকট বিচ্ছিন্ন ভাবে বর্তমান ধন-সম্পদ একত্রীভূত হয়ে এক স্থান পুঞ্জিভূত হয়। ইসলামের লক্ষ্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে আরোপিত। ইসলামের লক্ষ্য এই যে, ধন- সম্পদ এককেন্দ্রীক ও পুঞ্জিভূত হবে না। যদি হয়ই তবে তার সরোবর হতে যাকাতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করতে হবে। যেন আশে-পাশের যে শুষ্ক ও রুগ্ন ক্ষেত খামার রয়েছে, তা পরিসিক্ত হতে পারে এবং চতুর্দিকের সমগ্র যমীনই যেন শষ্য-শ্যামল ও ফুলে-ফলে ভরপুর হতে পারে। পুঁজিবাদী সমাজে ধন-সম্পদের বিনিময় অবরুদ্ধ, ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ; কিন্তু ইসলামে তা মুক্ত, অবাধ ও অবারিত। পুঁজিবাদী সমাজের ধন- সম্পদের পুকুর হতে পানি নিতে হলে আপনার 'পানি' সেখানে পূর্ব হতে মওজুদ রাখতে হবে। অন্যথায় একফোঁটা পানিও কেউ সেখানে হতে পেতে পারে না; কিন্তু ইসলামে পানি কেন্দ্রের নিয়মকানুন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে যার নিকট অতিরিক্ত পানি আছে, তাকে তা পুকুরে ঢালতে হবে। আর এর প্রয়োজন যার হবে, সে সেখান হতে পানি গ্রহণ করবে। সুতরাং এ দুটি ব্যবস্থার পার্থক্য সুস্পষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া যাকাতের মত ইসলামের উত্তরাধিকার আইনও সামাজিক নিরাপত্তায় ভূমিকা রাখতে পারে যা উমর চাপড়ার লেখায় পাওয়া যায়।

৪.৬ শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধিতে যাকাত

শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধিতেও যাকাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। যাকাত দানের মাধ্যমে যাকাত দাতার অর্থের পরিশুদ্ধি ঘটে। সম্পদ এক যায়গায় স্তূপীকৃত হয়ে যেতে পারে না। যাকাত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে। যাকাত দানের ফলে যাকাত দাতার অর্থসম্পদ যাতে না কমে সেজন্য তাকে অধিক উপার্জনে সচেষ্ট হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করতে হবে। এর ফলে বিনিয়োগ যত বেশি হবে ততই শিল্প উৎপাদন বাড়বে। উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে আয়ও বাড়বে। ফলে যাকাত দানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আবারো আয়, বিনিয়োগ, উৎপাদন বৃদ্ধি চক্রাকারে চলতে থাকবে। অপর পক্ষে যাকাত দান দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সুস্পর্ক তৈরি করবে। সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস পাবে।

যাকাতের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য

১.দারিদ্র বিমোচন।

২.ঋণগ্রস্ততা দূর কার।

৩. যাকাত টাকাকে বসিয়ে রাখতে দেয়না, বিনিয়োগে উৎসাহিত করে।

৪. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

৫. আয় বৃদ্ধি পাবে।

৬. আত্মকর্মসংস্থান হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাকাত ব্যক্তিকে দেয়া হয়। যাকাত ডিমান্ড বাড়ায় যা অর্থনীতিকে সাহায্য করে।[২৫]

যাকাত বিনিয়োগ বাড়ায়

যাকাত টাকাকে বসিয়ে রাখতে দেয়না, বিনিয়োগে উৎসাহিত করে। একজন যাকাত দাতা তার সঞ্চিত অর্থে যখন প্রতি বছর শেষে যাকাত দিবে তখন তার সঞ্চিত অর্থ কমতে থাকবে এবং একসময় সে হয়ত যাকাত দান করার মত প্রয়োজনীয় সম্পাদ পাবে না। কিন্তু যারা যাকাত গ্রহণ করছে তাদের ডিমান্ড বা চাহিদা বেড়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে দেশে ভোগ্য পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে অধিক উৎপাদনের প্রয়োজন দেখা দিবে। ফলে সম্পদশালীরা অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ করবে উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদে আর এভাবেই শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির সাথে আয় বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

যাকাত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে তার উদাহরণ এভাবেও হতে পারে যে,যাকাত দাতা ভবিষ্যতে আরো অধিক পূণ্যের আশায় আরো অধিক যাকাত দানের উদ্দেশ্যে আয় বৃদ্ধির পন্থা হিসেবে শিল্পোৎপাদনে বিনিয়োগ বাড়াবে। কোন সমাজে যখন এভাবে বিনিয়োগ, শিল্পোৎপাদন ও আয় বাড়বে, তখন সে সমাজে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এটা সহজেই অনুমেয়। ফলে রাজনৈতিক উন্নয়ন সহজ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

পুঁজিবাদে শিল্পোৎপাদন ও বিনিয়োগ

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ঠিক এর বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এখানে সবকিছুই হবে শুধু ব্যক্তির স্বার্থে। বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের কথা এখানে ভাবা হয় না। এখানে ব্যক্তির নিকট পাহাড়সম সঞ্চিত অর্থ থাকলেও তা ব্যক্তি বিনা লাভে কোন দরিদ্রকে দেয়না। অর্থের লেনদেন এখানে হবে তবে তা হবে সুদ ভিত্তিক। অথচ আল কুরআন সুদকে হারাম আর ব্যবসাকে হালাল করেছে।[২৬] ফলে পুঁজিবাদে উৎপাদন বাড়লেও উৎপাদিত পণ্যের পর্যাপ্ত ক্রেতা পাওয়া যায় না। কারণ পুঁজিবাদী সমাজে দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণী অর্থাভাবে অধিক পন্য ক্রয় করতে পারে না ইসলামী অর্থব্যবস্থার সাধারণ দরিদ্রের মত। ফলে তাদের শিল্পোৎপাদিত পণ্য নিজ নিজ দেশের বাইরে এক সময়ের কলোনি এবং বর্তমান সময়ের নিও কলোনীতে বিক্রি করার প্রচেষ্টা চালায় যা এই সমস্ত উন্নয়নশীল দেশের শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যহত করে। অর্থাৎ এক অঞ্চলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বাড়লেও অন্য অঞ্চলে উৎপাদন ও বিনিয়োগ ব্যাহত হয়। সার্বিকভাবে মানব সমাজে বিনিয়োগ ও উৎপাদান কম হয়। অথচ যাকাত ভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতিতে প্রকৃত বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি হয় যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

পুঁজিবাদে উৎপাদন ব্যাহত অন্যভাবেও হতে পারে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সার্বিক উৎপাদন ও বিনিয়োগ যেভাবে ব্যাহত হতে পারে তা হলো– পুঁজিবাদে অবিক্রিত শিল্পোৎপাদিত পণ্য যত বাড়তে থাকবে বিনিয়োগ এবং উৎপাদন ততই কমতে থাকবে। অথচ যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতিতে দরিদ্র সমাজের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ার কারণে শিল্পোৎপাদিত পণ্যের বিক্রি বাড়বে যা উৎপাদন ও বিনিয়োগ বাড়াবে।

সুতরাং যাকাত শিল্পোৎপাদন যে বাড়বে সে বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকার কথা নয়। কিন্তু এখানে যে বিষয়টি খেয়াল করতে হবে তা হলো– ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র নিজ উদ্দ্যোগে যাকাত সঠিক ভাবে আদায় করবে এবং আল কুরআন নির্দেশিত পথে বণ্টন করবে। কর ফাঁকির মত যাকাত ফাঁকির ব্যবস্থা যেন না হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি যদি আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সর্বোপরি ইসলামী মূল্যবোধ দ্বারা চালিত হয় তাহলে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন পরেনা । কারণ নৈতিক উন্নয়ন ছাড়া ন্যায়ভিত্তিক বস্তুগত উন্নয়ন সম্ভব নয়। ন্যায় ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য সকল সম্পদের বণ্টন, দক্ষতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে হতে হবে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে নৈতিকতা দ্বারা ভরে দেওয়া ছাড়া দক্ষতা ও ন্যায়পরায়নতাকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না এবং অর্জন করাও যায় না।[২৭]

৪.৬.১ বাংলাদেশের যাকাত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন

অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, যাকাত ব্যবস্থা যদি সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়-বিশেষ করে রাষ্ট্রীয়ভাবে, তাহলে এর মাধ্যমে আমাদের মত উন্নয়শীল দেশের আর্থিক সংকট মোকাবিলা করা অনেক সহজ হবে। আর আর্থিক উন্নয়ন হলে রাজনৈতিক উন্নয়নও হবে ত্বরান্বিত। কারণ অর্থনৈতিকভাবে দেশ যখন পরনির্ভরশীল হয়, তখন সেখানে রাজনৈতিক উন্নয়নও সহসা ঘটে না। বর্তমান বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল

Dhaka University Institutional Repository

দেশগুলোর রাজনৈতিক ক্ষমতায় উন্নত বিশ্বের সমর্থিত পুতুল সরকার অধিষ্ঠিত থাকায় রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সহিংসতা লেগেই আছে। ফলে দেশগুলি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে না। তাদেরকে নির্ভর করতে হয় বিদেশী সাহায্য ও অনুদানের উপর, যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কঠিন শর্তযুক্ত। ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে এবং দেশ আরো অধিক পরিমাণ বিশ্বব্যাংক, আই.এম.এফ এবং এসব সংস্থার প্রতিষ্ঠাকারীদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় দেশে অনুন্নয়নের দুষ্টচক্র চলতে থাকে যা কারোর কাম্য হওয়া উচিত নয়। এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বে বিশেষ করে আমাদের দেশে ইসলামী অর্থনীতির বিশেষ ব্যবস্থা যাকাত পদ্ধতি সঠিক নিয়মে, রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করতে পারলে অনুন্নয়নের দুষ্টচক্র হতে বেরিয়ে আসা অবশ্যই সম্ভব হবে বলে অভিজ্ঞ- মহল বিশ্বাস করেন।

উল্লেখ্য বর্তমানকালে বিশেষত: বাংলাদেশে অনেক যাকাত দাতা (যাকাত দানের যোগ্যতা সম্পন্ন কিন্তু যাকাত দেয়না-এমন ব্যক্তিসহ) যাকাত দানের পদ্ধতি ও যাকাত গ্রহীতার কুরআন নির্দেশিত আটটি খাত সর্ম্পকে অবহিত নন। ফলে যাকাতের প্রকৃত হকদার বহুলোকই যাকাতের অর্থ-সম্পদ প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হন। পরিণামে তাদের বঞ্চনা ও সংকট হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে তা আরও ঘনীভূত হয়।

বর্তমান প্রেক্ষাপট:

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বর্তমানে মুষ্টিমেয় কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্রেই মাত্র সরকারি উদ্যোগে যাকাত সংগৃহীত ও ব্যয়িত হয়ে থাকে। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে-সৌদি আরব ও কুয়েত এবং আংশিকভাবে পাকিস্তান ও মালয়েশিয়া। অন্যান্য মুসলিম দেশগুলিতে যাকাত আদায় ও বন্টনের দায়িত্ব ব্যক্তি মুসলিমের। অর্থাৎ সাহিবে নিসাব (পুরুষ বা মহিলা) নিজ দায়িত্বেই প্রদেয় যাকাতের হিসাব করবে এবং নিজ দায়িত্বেই তা বিলি বন্টন করে দেবে। এক্ষেত্রে তিনটি সমস্যার সৃষ্টি হয়:

প্রথমত: খুব কম লোকই রয়েছেন যারা নিছক আল্লাহকে রাজী খুশী করার জন্য সঠিক হিসেবে যাকাত আদায় করে থাকেন। অনেকে যাকাত দিলেও পুরোটা যথাযথ আদায় করেন না। একমাত্র রাষ্ট্রই পারে প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যমে সকল সাহিবে নিসাব ব্যক্তিকে যাকাত প্রদানে বাধ্য করতে। যারা রাষ্ট্রের এই নির্দেশ মানবে না তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা। এই পথেই রাষ্ট্র সকল সাহিবে নিসাব ব্যক্তিকে যাকাতের হকদারদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে বাধ্য করতে পারে।

দ্বিতীয়ত: একজন ফকীর ব্যক্তিকে একাধিক ব্যক্তি যাকাত দেবে, অন্যদিকে ভিক্ষা করতে বের হয় না এমন মিসকীনের প্রতি কারোরই নজর নাও পড়তে পারে। উপরন্তু একজন ব্যক্তির পক্ষে দেশের সার্বিক অবস্থা জানা বিশেষত: যারা যাকাতের হকদার তাদের সকল শ্রেণী সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। একমাত্র রাষ্ট্রই পারে পরিকল্পিত ও সুবিন্যস্তভাবে যাকাতের হকদারদের মধ্যে পৌঁছে দিতে ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়তঃ আমরা সকলেই জানি-

"মিলি ক্ষুদ্র বারি বিন্দু
রচনা করিছে সিন্ধু,
অণুতে গঠিত হিমাচল।"

আসলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় যেমন একত্রিত হয়ে বিশাল পুঁজি গড়ে তুলতে পারে তেমনি যাকাত সূত্রে ব্যক্তির প্রদেয় অর্থ সম্পদও রাষ্ট্রীয়ভাবে সংগৃহীত হলে বিশাল তহবিল গড়ে উঠতে পারে। সহস্র সহস্র কোটি টাকা একত্রে পরিকল্পিত ব্যয়িত হলে যে বিশাল সামাজিক সুরক্ষা বলয় তৈরি হতে পারে, ব্যক্তি এককভাবে তার ভগ্নাংশও করতে সক্ষম নয়। সুতরাং, ব্যক্তির যাকাত প্রদানে অনীহা ও যাকাত ফাঁকি দেবার প্রবণতা রোধ এবং একই সাথে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত সংগ্রহ করার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রতি বছরই জাতীয় আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ যোগান দিতে সক্ষম। কোন কোন অর্থনীতিবিদের মতে, এই পরিমাণ কোনক্রমেই জাতীয় আয়ের পাঁচ শতাংশের কম তো নয়ই বরং যথাযথভাবে সংগৃহীত হলে এই পরিমাণ দশ শতাংশের পৌঁছাতে পারে।

বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের কথাই ধরা যাক। বহুলোকই তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যাংকে মেয়াদীআমানত হিসেবে সঞ্চয় করেন। এর মেয়াদ ন্যূনতম এক বছর, সর্বোচ্চ পাঁচ বছর। অর্থের পরিমাণও সাধারণত লক্ষাধিক টাকা হয়। শরীয়াহর বিধি অনুসারে এই মজুদ অর্থের যাকাত দেওয়া বাধ্যতামূলক এখন যদি সরকার আইন করে যে, এই মেয়াদী আমানত হতে ব্যাংক প্রতি বছর ২.৫% হারে যাকাত নগদ আদায় করে সরকারের যাকাত তহবিলে জমা দেবে তাহলে একদিকে যেমন ব্যক্তির যাকাত আদায় হয়ে যাবে তেমনি অন্যদিকে বিনা ঝামেলায় ও বিনা অর্থব্যয়ে এই সূত্রে আদায় হবে কয়েক হাজার কোটি টাকা। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক–বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় প্রকাশিত 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (পৃষ্ঠা ২২২) সূত্রে জানা যায় যে, মার্চ ২০০৭ সময়কালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মেয়াদী আমানতের মোট পরিমাণ ছিলো-১,৫৩,৬৭৫ কেটি টাকা।[২৮] এই অর্থ হতে ২.৫% হারে যাকাত আদায় হলে তার পরিমাণ দাঁড়াবে ৩,৮৪২ কোটি টাকা (প্রায়)। এই সঙ্গে ব্যাংকসমূহের লকারে রক্ষিত সোনার গহনার যাকাত ও ফসলের উশরের মূল্য ধরলে আদায়যোগ্য যাকাত ও ফসলের উশরের মোট আর্থিক পরিমাণ যে অনায়সে পাঁচ হাজার কোটি টাকার উর্ধ্বে চলে যাবে তা বলাই বাহুল্য। প্রসঙ্গত: স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে, খাদ্যশস্যের মূল্য ক্রমশই বাড়ছে এবং বহুলোকের হাতে বছর শেষে বিস্তর নগদ অর্থ থাকে। এর ফলে আদায়যোগ্য যাকাতের মোট পরিমাণ আরো অনেক বেশি হবে সে বিষয়ে কোন চিন্তাশীল মানুষেরই সংশয় থাকার কথা নয়।

সুতরাং, বাংলাদেশে এনজিওদের উপর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর দায়িত্বভার ছেড়ে না দিয়ে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে বিদেশ হতে চড়া সুদ প্রদানের শর্তে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ না নিয়ে দেশের অভ্যন্ত রেই যে সহজলভ্য ও শরীয়াহসম্মত আদায়যোগ্য অর্থ রয়েছে সরকারের উচিৎ তা সংগ্রহের জন্য যথোচিত

Dhaka University Institutional Repository

পদক্ষেপ গ্রহণ করা। অব্যাহতভাবে প্রাপ্তব্য এই অর্থ দিয়ে কমপক্ষে দশবছর মেয়াদী একটি কর্মসংস্থানমুখী, দারিদ্র নিরসনধর্মী সামাজিক সুরক্ষা বলয় কর্মসূচী প্রণয়ন করা যেতে পারে। উপযুক্ত মনিটরিং ব্যবস্থাসহ পর্যায়ক্রমে এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে যেতে পারলে বর্তমানে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসরত প্রায় সাত কোটি লোকের জীবনে যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে অন্যকোনভাবেই তা অর্জন সম্ভবপর নয়।

উল্লেখ্য, ২০০৮-২০০৯ সালের বাজেটে শুধু বিদেশী ঋণের সুদ বাবদেই পরিশোধ করতে হয় বাজেটের মোট বরাদ্দের ১২.৬%।[২৯] এনজিওগুলো তাদের মাইক্রো ক্রেডিটের ফাঁদে ফেলে গ্রামের অসহায় মানুষগুলোর অবস্থা ক্রমাগত শোচনীয় করে তুলছে। এরা দারিদ্র্য বিমোচন না করে প্রকারান্তরে দারিদ্র্যের চাষ করে চলেছে।[৩০] গ্রাম্য মহাজনের হাতে বাধা পড়ে আছে লক্ষ লক্ষ পরিবার যাদের পক্ষে গৃহীত ঋণ কখনোই পুরোপুরি শোধ করে দায়মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। মুসাফির ও নওমুসলিমদের দুদর্শনার কথা না বলাই ভালো।

এই অবস্থা হতে পরিত্রাণ পেতে হলে অবশ্যই শরীয়াহর মূলনীতি অনুসারেই যাকাত আদায় ও বণ্টন করতে হবে। ব্যক্তির ইচ্ছার উপর যেমন তা ছেড়ে দেওয়া যায় না, তেমনি এই দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রকেও বিমুখ থাকতে দেওয়া যায় না। এজন্যে আজ দেশের তৌহিদবাদী জনতা বিশেষত: ইসলাম প্রিয় যুবগোষ্ঠীকেই সচেতন ভূমিকা পালন করতে হবে। জনসচেতনতা সৃষ্টি ও সরকারকে যথাযথ দায়িত্ব পালনে বাধ্য করতে তাদেরকেই উপযুক্ত কর্মকৌশল উদ্ভাবন ও বাস্তাবায়ন করতে হবে। তবেই যাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র্যমুক্ত সুখী বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে।[৩১] সম্ভব হবে তৃণমূল পর্যায়ে সমাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সুযোগ পৌঁছে দেওয়া। দেশে কাঙ্খিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

সুতরাং আমরা বলতে পারি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে যাকাত একটি কার্যকর ব্যবস্থা হতে পারে যা ইসলাম ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। অর্থাৎ ধর্ম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা নয় বরং সহায়ক।

তথ্য নির্দেশিকা

১। চাপরা, উমর, রচিত আহমেদ, মাহমুদ অনূদিত, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, বি.আই.আই.টি, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১০৮।

২। প্রাগুক্ত।

৩। আব্দুর রহমান রাকিব ও অন্যান্য ইসলামী পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে দৃঢ় মত ব্যক্ত করেছেন।

৪। চাপরা, উমর, প্রাগুক্ত।

৫। ড. জামাল আল বাদাবী রচিত, মাহমুদ, আবু খালদুন ও মাহমুদ, শারমিন ইসলাম অনূদিত, *ইসলামী শিক্ষা সিরিজ*, ১ম খ., বি.আই.আই.টি. ঢাকা, অক্টোবর, ২০০৯ পৃ. ১৩৫

৬। আল কুরআন, ৯:১০৩।

৭। প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৮। আল্লামা ইউসূফ আল-কারযাভী 'ইসলামের যাকাত বিধান' পৃ. ১০০-১০১।

৯। ড. জামাল আল বাদাবী, প্রাগুক্ত।

১০। কুতুব মুহাম্মদ, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনি, ঢাকা, আগষ্ট, ২০০৭, পৃ. ১৫।

১১। ড. জামাল আল বাদাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

১২। আল-কুরআন, ১১ :১০৭, ৩:২০।

১৩। Muhmed Shafiq Ahmed, "Right to own Property and Sceurity of Property in Islamic law" Journal Islam and the Modern Age, Volume xxxv, No-1, February-2004.

১৪। প্রাগুক্ত।

১৫। Maudoodi, "*Tafheemul Quran*" 5th Volume, Adhunik Prokashani, P.46.

১৬। আল-কুরআন, ১১২:২।

১৭। আল- কুরআন, ৭০:২৪-২৫।

১৮। চাপরা, উমর, প্রাগুক্ত।

১৯। প্রাগুক্ত।

২০। আল- কুরআন, ৯:১০৩।

২১। বাদাবী, ড. জামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫-৩৬।

২২। চাপরা, উমর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

২৩। মওদুদী, প্রাগুক্ত।

২৪। কুতুব মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।

২৫। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, *যাকাত ও ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন*, পৃ. ৮।

২৬। *আল- কুরআন*, ২:২৭৬-২৮০।

২৭। চাপরা, উমর প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬।

২৮। *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা*, ২০০৭, পৃ.২২২।

২৯। *বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট*, ২০০৮-২০০৯, ১১-০৬-২০০৮ তাং, দৈনিক ইত্তেফাক।

৩০। রহমান, শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর, *যাকাত: মূলনীতি ও বর্তমান প্রেক্ষাপট*, সেপ্টেম্বর, ২০০৮, মাসিক পৃথিবী, পৃ.৬৬।

৩১। প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় : উন্নয়ন ও নারী

৫.১ বিভিন্ন সভ্যতায় নারী

৫.২ বিভিন্ন ধর্মে নারী

৫.৩ নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন ঃ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের আলোকে

৫.৪ ইসলামে নারী

৫.৫ ইসলামী অর্থনীতি ও রাজনীতিতে নারী স্বাধীনতা এবং নারী উন্নয়নে বাধা নয় বরং সহায়ক প্রমানে ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন ও নারী এটি একটি ব্যতিক্রমী বিষয় হিসেবে মনে হতে পারে। কারণ বিশ্বের বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সভ্যতায়, বিভিন্ন ধর্মে নারীকে মানুষের মর্যাদা যেখানে দেয়া হতো না; তাকে ইতর প্রাণী কখনও বা পুরুষের তুলনায় নীচু প্রাণী ভাবা হতো, সেখানে নারীকে উন্নয়নের অংশীদার কিংবা নারীর উন্নয়ন সবই ব্যতিক্রমী বিষয় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ইসলাম নারীকে উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে দেখিয়ে কিংবা মানুষ হিসেবে নারীর উন্নয়ন ঘটিয়ে সত্যিই এক অনন্য নজীর স্থাপন করেছে। কিন্তু অজ্ঞতা বা বিদ্বেষের আধিক্য কিংবা উপলব্ধির স্বল্পতার কারণে ইসলামের অবস্থানকে বারংবার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।

এই পৃথিবীতে নারীর জন্ম হয় মানুষ হিসেবে, নারী হিসেবে নয়। বিশ্ব-সভ্যতায় কখন থেকে নারীকে মানুষ হিসেবে না ভেবে নারী হিসেবে ভাবা হয় সে সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা আমাদের নেই। তবে এটা জানা যায় যে, নারীর দাসত্ব শুরু হয়েছিল ইতিহাসের দাস প্রথা শুরু হওয়ারও পূর্বে এবং আদি যুগের নারীর সেই দাসত্ব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে এসেছে।[১]

৫.১ বিভিন্ন সভ্যতায় নারী

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জ্ঞাত ইতিহাসের সকল অধ্যায়ে নারীর অবমাননা এবং বঞ্চনার কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। তার আত্মা আছে কি-না সে ব্যাপারে সন্দেহ করা হয়েছে; ফলে পুরুষের মত তাকে দেওয়া হয়নি আত্মিক উন্নতির সুযোগ। তাকে দেওয়া হয়নি সম্পত্তির উত্তরাধিকার; বরং নিতান্ত অস্থাবর সম্পত্তির মত তাকে যথেচ্ছা হস্তান্তর বা বিক্রয় করা হয়েছে। নারীর ন্যায়বিচার লাভের আশা চিরদিন রয়ে গেছে সুদূর পরাহত। কোন কোন সভ্যতায় নারী শুধু মাতা হিসেবে সন্তানদের ভক্তি লাভ করেছে। এছাড়া কন্যা, স্ত্রী, ভগ্নী, সমাজের সদস্য কোন রূপেই সে তেমন কোন সম্মান বা অধিকার পায়নি। তাকে মনে করা হত ইতর প্রাণীর চেয়ে কিছুটা উন্নত অথচ মানুষের চেয়ে কিছুটা নিচু- স্তরের জীব। এ-ক্ষেত্রে ইসলামী সভ্যতা ব্যতিক্রমধর্মী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রদানে তৎকালীন সকল সভ্যতার চেয়ে ইসলাম যে কত অগ্রগামী ছিল তা অনুধাবন করার জন্যই বিভিন্ন সভ্যতায় নারীর মর্যাদা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন।

প্রাচীন প্রাচ্য দেশীয় সভ্যতাসমূহে নারীর অবস্থান।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় নারী

প্রাচীন এই সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান, তার সবচেয়ে বড় উৎস হল রাজা হাম্মুরাবীর আইন। এই আইনের বিভিন্ন ধারা থেকে আমরা তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি, হাম্মুরাবীর বিধানে পুরুষ ছিল নারীর উপর পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী। পরিবারের সকল সিদ্ধান্ত এবং বিচারের পূর্ণ এখতিয়ার ছিল তার এমনকি ঋণ পরিশোধের টাকা সংগ্রহের প্রয়োজনে পুরুষ তার স্ত্রীকে দাসী হিসেবে বিক্রয় করতে পারত। স্বামীর সম্মান এবং সন্তানের বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য হাম্মুরাবী বিধান দিয়েছিলেন,

Dhaka University Institutional Repository

ব্যভিচারিনী স্ত্রী এবং তার অপকর্মের সঙ্গীকে একত্রে বেঁধে পানিতে ডুবিয়ে মারতে হবে। অথচ এ ধরণের কাজ পুরুষের জন্য ছিল আইন ও শাস্তির উর্ধ্বে (Traditions Encounter. P-45)। এছাড়া একই রকম বিষয় উল্লেখ আছে Western Civitization. P-54 তেও।

গ্রীক সভ্যতায় নারী

প্রাচীন গ্রীকরা ছিল যুদ্ধবাজ; যুদ্ধের মধ্য দিয়েই তারা সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়। নারীকে তারা পুরুষের তুলনায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে কম উপযোগী মনে করত। দুর্বল শারীরিক গঠনের জন্য তাদেরকে কৃপার পাত্রী ভাবা হত। বরং বলা যায়, নারীকে নিম্নস্তরের প্রাণী বিবেচনা করা হত। (Western Civitization. P-142)

গ্রীক সভ্যতায় নারী ছিল পিতা, চাই বা অন্য পুরুষ আত্মায়ের অধীনা, কেননা তাদেরকে Minor মনে করা হত। বিয়ের সময় তাদের মতামতের কোন প্রয়োজন হত না এবং পিতার কাছ থেকে সে যেত তার স্বামী নামক পশুর ঘরে।[২] অর্থাৎ নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না।

রোমান সভ্যতায়

রোমান সভ্যতায় নারী যে পৃথকভাবে কিছু করতে সক্ষম তাই বিশ্বাস করা হতো বা (regarded as babes)। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা অনুসারে কোন মহিলা বিয়ে করলে স্বাভাবিকভাবেই তার সম্পদের মালিক হতো তার স্বামী। সেই সম্পত্তি আর সে ফেরত নিতে বা স্বামীর অনুমতি ছাড়া খরচ করতেও পারত না। মহিলারা কোন উইল বা চুক্তি করতে পারত না, এমন কি নিজের সম্পদের ব্যাপারেও না।[৩] নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে এই সভ্যতা দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করত। পুত্র-সন্তানের জন্মকে স্বাগত জানানো হলেও অনেক সময় কন্যা সন্তানকে সাদরে বরণ করা হত না। অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে বাড়ির বাইরে ফেলে রাখা হত (expose) ধুকে মরার জন্য। (The west in the world P-123) নর-নারীর খাদ্য বিচারেও ছিল বৈষম্য। পুরুষদের মধ্যে মদ্যপানের ব্যাপক প্রচলন থাকলেও; নারীর জন্য তা ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। (The west in the world P-125) রোমান আইনে মৃতের সম্পত্তিতে পুরুষের উত্তরাধীকার থাকলেও নারী এ অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। (Traditions Encounters. P-285)

প্রাচীন প্রাচ্য দেশীয় সভ্যতা সমূহে নারী

নারীদের প্রতি প্রাচীন চীনাদের আচরণের উদ্ধৃতি পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে হুসুয়ান নামক কবির লেখায়, "নারী হওয়া বড় দুঃখের, পৃথিবীতে কোন কিছুই নারীর মত এত সস্তা নয়।" কনফুসিয়াস বলেন, "নারীর মুল কাজ আনুগত্য, শৈশব কৈশোরে পিতার বিয়ের পর স্বামীর এবং বিধবা হবার পর পুত্রের" তিনি আরও বলেন যে, এই আনুগত্য হবে প্রশ্নাতীত এবং একচ্ছত্র (অথচ ইসলামে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো প্রশ্নাতীত ও একচ্ছত্র আনুগত্য হারাম)।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যে নারীর অবস্থান

প্রাচীন আরবে হিক্র এবং আরবী রীতি চালু ছিল। প্রাচীন কালে আরবরা যখন শুনতো তার কন্যা সন্তান হয়েছে তখন রাগে তাদের মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করতে। এটা ছিল এমন একটা যুগ যখন কন্যা শিশুদের জীবন্ত মাটি চাপা দিয়ে হত্যা করা হত। ধারণা করা হতো যে কন্যা শিশু পিতার অসম্মানের কারণ হবে। পক্ষান্তরে পুত্রের জন্ম সংবাদে তারা আনন্দে মাতোয়ারা হত। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সন্তানরা পিতার বিধবা স্ত্রীদেরও মালিক হত।[৪]

ঢালাওভাবে এটা বলা ভুল হবে যে, সকল প্রাচীন সভ্যতাই সকল ক্ষেত্রে নারীকে অবমূল্যায়ন করত বা তার প্রতি নেতিবাচক আচরণ দেখাত। কোন কোন সমাজে ভদ্র ঘরের নারীদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। স্বীয় অধ্যবসায় ও মেধার গুণে কোনো কোনো নারী সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আবিষ্কৃত বেশ কিছু সভ্যতায় দেখা যায় প্রভুকে নারীর আকৃতিতে কল্পনা করা হয়েছে। মিশর, বেবিলন, গ্রীস, সুমারিয়া ও রোমে একজন মহিলা দেবীর পূজা করা হত যা থেকে দেব-দেবীর সৃষ্টি। এসব মিথলজির সাথে বাইবেলে বর্ণিত গড-দি-মাদার এবং তার পবিত্র পুত্রের মিল লক্ষ্য করা যায়।[৫] তবে মধ্যযুগ ও আধুনিক কালেও নারী স্বাধীনতা হরণের ইতিহাস কম নয়। ১৫৩৮ সালের পূর্বে ফ্রান্সে মেয়েদের মানুষ বলেই গণ্য করা হত না। তারা ছিল শুধু পুরুষের সেবাদাসী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়ে টাকা খাটানো তার জন্য ১৯৩৮ সন পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার মেয়েদের অবস্থাও সামগ্রিকভাবে এর চেয়ে উন্নত ছিল না। বিংশ শতাব্দীতেই তারা ভোটাধিকার তথা রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। কোন কোন দেশের যেমন সুইজারল্যান্ডের মেয়েরা সামাজিক, রাজনৈতিক বা ভোটের অধিকার পেয়েছে কেবল উনিশ শতকের সত্তর দশকে।[৬]

ভারতে নারীর অবস্থা আরও খারাপ ছিল বিধবা হবার পর পুণর্বিবাহ বা সম্পত্তির অধিকার তো দূরের কথা, স্বামীর সাথে এক চিতায় সহমরণই ছিল তার একমাত্র পরিণতি। শুধু জননী হিসেবে সন্তানের ভক্তি ও ভালবাসার পাত্রী ছিল সে। ইদানিং অনেক ক্ষেত্রে ভারতের অন্তঃসত্তা মহিলাদের গর্ভের সন্তান পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। যদি দেখা যায় গর্ভে মেয়ে সন্তানের ভ্রূণ, সেক্ষেত্রে গর্ভপাত ঘটানো হয়। আধুনিক কালেও সুকৌশলে চীনারা মেয়ে জন্মের নীচু হার অব্যাহত রেখেছে। চীনা পুরুষ বিয়ে করার জন্য মেয়ে খুঁজে পাচ্ছে না।[৭]

শতাব্দীর পর শতাব্দীর পথ পরিক্রমায় নারীদের অবস্থা উন্নতি হলেও নারী-পুরুষের বৈষম্য পবর্তপ্রমাণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জনসমষ্টির অর্ধেক বাদ দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয় বিধায় সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে মেয়েরা ঘরের বাইরে কাজ করছে। উনিশ শতকের আশির দশকে মহিলা শ্রমজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। শতকরা ৭০ ভাগ উন্নয়নশীল দেশেই এই পরিবর্তন ঘটেছে।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ বিভিন্ন ধর্মে নারী

ইসলাম ধর্মে এবং অন্যান্য ধর্মে নারীকে কেমন অধিকার দেয়া হয়েছে তা বিভিন্ন ধর্মে নারী আলোচনায় বোঝা যাবে।

হিন্দু ধর্মে

হিন্দু ধর্মে নারীর অবস্থা এতই খারাপ যে, তাদের বিদ্যার্জন, ধর্মগ্রন্থ পড়া বা ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে কোন ভূমিকা ছিল না।[৯] তবে বর্তমানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের কিছু অধিকার দেয়া হচ্ছে। যেমন-সম্পত্তিতে।

ইহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মে নারী

ইহুদী ও খ্রিস্টান এ দুটি ধর্মে নারীকে তেমন কোন মর্যাদা দেওয়া হয়নি। বরং তাকে পাপের উৎস বা জননী মনে করা হয়েছে। আদি পিতা-মাতা জন্ম প্রসঙ্গে কুরআন ও বাইবেল একই মত পোষণ করে যে, প্রথমে আদম (আ.)- কে সৃষ্টি করা হয়, অতঃপর বিবি হাওয়া (আ.)-এর সৃষ্টি। এখানে বাইবেল আরো একটু বর্ণনা দেয় যে, আদম (আ.) পাঁজরের হাড় থেকে বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়। যার ভিত্তিতে অনেকে নারীকে বাঁকা ও ভঙ্গুর স্বভাবের বলে থাকে। কিন্তু কুরআনে এ রকম কিছুর উল্লেখ নেই। বরং কুরআনে বলা হয়েছে আল্লাহ্ প্রথমে এক আত্মার সৃষ্টি করেন এবং তা থেকেই উভয়ের সৃষ্টি। কাজেই এ ক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনায় নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা এবং সম-অধিকারের ইঙ্গিত আছে।[১০]

প্রথম পাপ (আদি পাপ) এর জন্য ইহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মে হাওয়া (আ.) কে দায়ী করে পুরো নারী জাতিকে এই দোষে দোষী করা হয়। অথচ ইসলামে এমন ধারণা নেই। বরং কোরআনে বলা হয়েছে তাদের দুজনেই আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন পর অনুতপ্ত হলে আল্লাহ্ তাঁদের ক্ষমা করেন।[১১] এছাড়া বিয়ে, গর্ভধারণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহুদী ও খ্রিস্টান ধর্ম নারীকে অনেক হেয় করেছে। যেখানে কুরআন নারীকে করেছে সম্মানিতা।[১২]

৫.৩ নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন: মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের আলোকে

বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের মানদণ্ড নির্ধারণের জন্য মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন উল্লেখযোগ্য। উৎপাদন ও আয় নির্ভর সূচকসম্বলিত এইচ,ডি, আই ইনডেক্সের মাধ্যমে উন্নয়নের র‍্যাঙ্কিং করা হলেও সম্প্রতি উন্নয়নের পূর্নাঙ্গ মাত্রা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন সূচক সম্বলিত আরো কয়েকটি ইনডেক্স করা হয়েছে। বিশেষ করে নারীকে উন্নয়নের পরিধিতে দেখার জন্য বিভিন্ন সূচক সম্বলিত আরো কয়েকটি ইনডেক্স নির্ধারণ করা হয়েছে-যেমন, লিঙ্গ উন্নয়নসূচক বা ডি,ডি,আই এবং লিঙ্গ ক্ষমতায়ন পরিমাপক বা জি,ডি, এম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও পুরুষের সাথে তুলনা সাপেক্ষে অর্থনৈতিক কর্মের হিসাব, কর্মের অন্তর্ভুক্ত এবং কর্মের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কাজের হিসাব গ্রহণ করে একাধিক ইনডেক্স নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী লিঙ্গ বৈষম্যের চিত্রকে তুলে ধরার জন্য মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী এবার বিভিন্ন সারণীর সাহায্যে অবস্থান বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে:

Dhaka University Institutional Repository

Table:5 .1Gender Gaps in Political participation.

HDI Rank	Year women received right		Year first women elected(E) or nominated(N) to parliament	Women in governme		
	To vote	to stand for election		at all level s	At ministerial level	
High human development						
1. Canada	1950	1960	1921[E]	17.7	18.5	1
2.Norway	1913	1913	1911[N]	24.1	28.6	2
3. United States	1920	1788	1917[E]	33.1	14.3	3
4.Japan	1947	1947	1946[E]	9.3	5.9	1
5.Belgium	1948	1948	1921[N]	6.6	11.1	4
6.Sweden	1921	1921	1921[E]	30.8	38.1	27.3
7.Australia	1962	1962	1943[E]	22.6	14.7	25.8
8. Netherlands	1919	1917	1918[E]	16.7	23.5	14.3
9.Iceland	1915	1915	1922[E]	8.2	15.4	6.7
10.United Kingdom	1928	1928	1918[E]	6.9	8.3	6.6
11.France	1944	1944	1945[E]	10.8	14.7	9.7
12Swizelland	1971	1971	1971[E]	7.1	15.4	5.9
13.Finland	1906	1906	1907[E]	20.4	36.4	15.5
14.Jermany	1918	1918	1919[E]	6.1	10.7	5.3
15.Denmark	1915	1915	1918[L]	13.9	29.2	10.3
Low human development						
165.Cen. African republic	1986	1986	1987[L]	4.9	8.0	2.4
166. Mali	1956	1956	1964[T]	6.2	10.0	0.0
167.Eritria	1955	1955	1994[T]	7.8	18.8	4.2
168.Guini Bisau	1977	1977	1972[N]	11.9	8.0	13.2
0169.Mozambiq	1975	1975	1977[E]	12.8	4.0	14.7
170.Burundi	1961	1961	1982[T]	5.4	10.3	0.0
171.Burkinfaso	1958	1958	1978[E]	11.5	9.1	11.9
172.Ethiopia	1955	1955	1957[T]	8.9	9.1	11.9
173.Nizer	1948	1948	1989[E]	10.9	14.3	10.0
174Siaralione	1961	1961	[C]	5.9	3.8	6.5
150.Bangladesh	1972	1972	1973[T]	1.9	7.7	0.0

Source: Human Development Report-1999

Dhaka University Institutional Repository

5 .2 Gender gap in economic activity.

HDI rank	Female economic activity rate		Unemployment rate %	Female unpaid family workers(as of total)1990 199-
	Rate(%) 1997	as % of M.rate 1997	Total[a] (age15-64)	
High human development	41.2	71.5	8.3-7.1	..
1. Canada	47.9	81.4	9.2-9.4	74
2.Norway	47.1	83.8	4.3[c] - 4.0[c]	63
3. United States	45.7	81.1	5.1[c] -4.9[c]	62
4.Japan	43.3	67.3	3.6-3.5	83
5.Belgium	32.9	65.3	11.6-7.1	86
6.Sweden	51.2	90.0	7.5-8.5	60
7 Australia	43.6	75.4	8.2-8.8	58
8. Netherlands	36.9	65.5	7.2- 4.4	82
9.Iceland	50.9	83.2	4.4[c] - 3.3[c]	..
10.United Kingdom	42.6	74.3	5.8[c] - 8.2[c]	72
11.France	39.1	76.5	10.9-14.2	
12Swizefland	42.5	65.7	3.9-4.4	71
13.Finland	47.3	87.3	15.1-13.9	33
14.Jermany	41.7	69.5	11.0-9.0	82
15.Denmark	51.2	84.7	6.5-4.6	95
Low human development				
170.Burundi	51.3	91.5	- -	60
171.Burkinfaso	46.4	86.8	- -	66
172.Ethiopia	35.6	69.7	- -	-
173.Nizer	41.4	77.6	- -	24
174Siarahone	26.6	55.2	- -	74
150.Bangladesh	44.4	77.2	2.3-2.7	71
World	40.2	69.8		

- c=data refer to the age group 16-64

Bangladesh-unemployment rate F=2.3, M 2.7(extended)
F=6.3, M=2.7 (usual)

Dhaka University Institutional Repository

Under employment rate: F=70.7, M=12.4(extended) (usual)
Source: Labour Force Survey Bangladesh & Human Development Report-1999

5/.3 Gender empowerment measure:(GEM)

HDI rank	Gender empowerment measure(GEM) Rank- Value	Seats in parliament held by women(as % of total)[a]	Female administrators and managers (as % of total)[b]	Female professional and technical workers (as % of total)[b]	Women's real GDP per capita (ppp$)[b]
High human development	-	17.31	-	-	15827
1. Canada	4	23.3	42.2	51.1	17254[c]
2.Norway	1	36.4	30.6	58.5	20872[d]
3. United States	8	12.5	44.3	53.1	23540
4.Japan	38	8.9	9.3	44.1	14625
5.Belgium	17	15.8	18.8	50.5	15249
6.Sweden	2	42.7	27.9	63.7	17829
7.Australia	9	25.9	43.3	35.5	16526
8. Netherlands	10	31.6	16.8	44.8	14483
9.Iceland	7	25.4	33.1	53.2	19183[c]
10.United Kingdom	16	12.3	33.0	43.7	15736
11.France					
12Swizefland					
13.Finland	6	33.5	26.6	62.5	15045
14.Jermany	5	29.8	26.6	49.0	16780
15.Denmark	3	37.4	20.0	62.8	19733
Low human development	- -	8.9	-	-	691
165Central african republic	94	6.4	9.0[f]	18.9[f]	1032
166Mali	74	12.2	19.7	19.0[f]	583[c]
167Eritria	50	21.0	16.8	29.5	568
168Guini Bisau	-	10.0	-	-	[illegible]
169Mozambiq	59	[illegible]			
170.Burundi	-				

Dhaka University Institutional Repository

171.Burkinf aso	77	10.5	13.5 [f]	25.8 [f]	[illegible]
172.Ethiopia	-	2.0	-	-	349
173.Nizer	102	1.2	8.3	8.0	636
174Siaralione	-	-	-	-	246 [c]
150.Bangladesh	83	9.1	[illegible]	34.7	767

c-No wage data available. An estimate of 75%, the mean for all countries with wage data available was used for the ratio of the female non agricultural wage to the male non agricultural wage

d-The manufacturing wase was used for the Czech Republic, Greece, Ireland and Norway.

e- Real GDP per capita (ppp$)----

Source: Human Development Report-1999

Table:5 .4 Gender gaps in work burden and time allocation.

	Burden of work				Time allocation %	
	Work time(mint. per day)		Total work time		market activities	non mar. activities
	F - M	F. as % of M	market activities	non mar. activities	F- M	F - M
Selected developing countries						
Urban						
Average	481-453	106	54	46	31-79	69-21
Rural						
Average	617-515	120	59	41	38-76	62-24
Bangladesh	545-496	100	52	48	35-70	65-30

Source: Human Development Report-1999

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫ Comparative chart of different country-depends on gender inequality

Name of the country	HDI Rank	GDI rank	GEM rank	G. gaps in political participation			G. gaps in ecomic activiy				G. gaps in education			
				Women in Government			Fe eco act rate		Unemploy. rate%	Fem unpaid Fam wokers	Fem pri net enrt		Fem sec net enrt.	
High human sevelopment				Seats in parliament	Al ministerial level	Al sub-ministerial level	Rate% 1997	as% of M1997	Total. Age (15-64)F	(as% of total) 1990-97	Ratioas% ofrelv.ag	as of% M. ratio1997	Ratioas% ofrelv. age	as of% alcatol 1997
Canada	1	1	4	17.31	18.5	17.6	3	6	8	8	1	1	7	6
Norway	2	2	1	23.3	28.6	22.7	4	4	2	5	1	1	3	3
United States	3	3	8	36.4	14.3	34.5	5	6	3	4	1	1	4	4
Japan	4	8	38	12.5	5.9	10.1	7		1	10	1	1	1	4
Belgium	5	6	17	8.9	11.1	4.6			10		1	1	1	4
Sweden	6	5	2	15.8	38.1	27.3	1	1	6	3	1	1	1	4
Australia	7	4	9	42.7	14.7	25.9	6	8	7	2	1	1	4	4
Netherland	8	9	10	25.9	23.5	14.3	10		6	9	1	1	1	4
Iceland	9	7	7	31.6	15.4	6.7	2	5	2	---	1	1	9	3
United Kingdom	10	11	16	25.4	8.3	6.6	8	9	4	7	1	1	8	1
France	11	10	6	12.3	14.7	9.7	9	7	9	---	1	1	2	4
Swizerland	12	12	5		15.4	5.9	8		1	6	1	1	10	7
Finland	13	13	3		36.4	15.5	4	2		1	1	1	4	2
Germany	14	14		33.5	10.7	5.3	8	10	9	9	1	1	6	5
Denmark	15	15		29.8	29.2	10.3	1	3	5		1	1	5	3
I.Dev. countries														
Burundi	170	140	---	6.0	10.3	0.0	1	1	-	2	2	1	2	1
Burkinfaso	171	141	77	10.5	9.1	11.9	2	2	-	3	4	3	3	2
Ethiopia	172	142	---	2.0	9.1	11.9	4	4	-	—	3	4	1	3
Nizer	173	143	102	1.2	14.3	10.0	3	3	-	1	5	5	4	4
Searalionc	174	---	---	---	3.8	6.5	5		-	4	1	2		
Bangladesh	150	123	86	9.1	7.7	0.0	44.4	77.2	2.3-2.7	71	69.6	87	15.6	58

Source: Human Development Report-1999

সাধারণভাবে দেখা গেছে এইচ,ডি, আই এর প্রথম ১০টি দেশ অন্যান্য সবদিক থেকেই অগ্রসর অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে যে, যে সব রাষ্ট্রে নারীরা রাজনীতিতে নীতি-নির্ধারণের জায়গায় অধিক হারে পৌঁছাতে পেরেছে, সেসব রাষ্ট্রে নারীরা লিঙ্গভিত্তিক সূচকে তুলনামূলকভাবে বেশী অগ্রগামী। জাপান এইচ, ডি, আই ইনডেক্সে প্রথম দিকে থাকলেও আইনসভায় নারীর স্বল্প প্রতিনিধিত্বের (১২.৫) প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে লিঙ্গ ক্ষমতায়ন পরিমাপকে ৩৮ তম অবস্থানের মাধ্যমে। যদিও জাপানের নারীরা ব্যাপক হারে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করছে, কিন্তু এখনো তাদের অ-মুজুরীভুক্ত গার্হস্থ্য কাজের হার ৮৩ শতাংশ এবং সেখানকার নারীদের আয়ও তুলনমূলকভাবে কম। অন্যদিকে যে সব রাষ্ট্রে নারীরা আইনসভায়

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য হারে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে পেরেছে সেসব রাষ্ট্রে নারীরা কার্যক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও পেশাভিত্তিক উভয় ধরণের কাজে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছে। ব্যতিক্রম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে নারীদের আইনসভার প্রতিনিধিত্ব মাত্র ১২ শতাংশ কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ রয়েছে এবং তাদের মাথাপিছু জাতীয় আয়ও তুলনামূলকভাবে বেশী। কিন্তু নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব পর্যাপ্ত নয়।

রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব অর্জন একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, ধীরে ধীরে চর্চার মাধ্যমে রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জন সম্ভব। দেখা গেছে যে, সকল রাষ্ট্রে যত আগে নারীর ভোটাধীকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেসব রাষ্ট্রে নারীরা ধারাবাহিকভাবে নির্বাচনে দাঁড়ানোর অধিকার অর্জন, আইন সভায় অধিক হারে প্রতিনিধিত্ব অর্জন, মন্ত্রীসভায় বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনীতিতে লিঙ্গ বৈষম্য কমিয়ে আনতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পেরেছে। পাশাপাশি এও লক্ষণীয় যে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নারী গতিশীলতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

৫.৪ ইসলামে নারী

ইসলামে নারী বলতে এখানে ইসলাম নারীকে কি ধরণের অধিকার দিয়েছে, নারী কেমন মর্যাদা ও সম্মান পাচ্ছে, উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলাম নারীর অংশ গ্রহণকে কিভাবে দেখছে, নারীর উন্নয়নে, ইসলাম কেমন ভূমিকা রাখছে ইত্যাদি বিষয়ই বোঝাবে। এসব বিষয় আলোচনার পূর্বে কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করছি:

এক. আনুমানিক পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ মুসলিম। তবে মুসলিম সমাজ বিভিন্ন রকমের। কোন কোন সমাজ ইসলামের কাছাকাছি আবার কোন কোন সমাজ অনেক দূরে অবস্থান করে (ব্যবহারিক দিক দিয়ে)।

দুই. "ইসলামে নারীর অধিকার" এর বিচার হবে ইসলামের মূল সূত্রের আলোকে-মুসলমানরা কী করে এবং মুসলিম কী করে এর উপর ভিত্তি করে নয়।

তিন. ইসলামের মূল সূত্রগুলো হলো, পবিত্র কুরআন-আল্লাহ্‌র বাণী এবং সুন্নাহ্ যা আমাদের প্রিয়নবী করীম (সা.) এর বাণী।

চার. কুরআন নিজের সাথে বৈপরীত্য করে না এবং সহীহ হাদীসেও অন্য হাদীসের সাথে বৈপরীত্য নেই, এমনকি এ দুই মূল সূত্র কখনো একে অপরের সাথে বৈপরীত্য করে না।

পাঁচ. অনেক সময় পণ্ডিতগণ মতানৈক্য করেন, এ মতানৈক্য কুরআনের সামগ্রিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দূর করা যায়, তবে একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে এটা দূর করা সম্ভব নয়। কারণ যদি কুরআনে নির্দিষ্ট কোন আয়াত যদি জটিল হয় তাহলে অনেক সময়ই কুরআনেরই অন্য কোথাও তার সমাধান আছে। কিছু লোক হয়তো এক সূত্র উল্লেখ করে অন্যগুলোকে অবহেলা করতে পারে।

ছয়. সর্বশেষ হলো, প্রত্যেকটি মুসলিম নারী-পুরুষ যাই হোক তার কর্তব্য হলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং তার প্রতিনিধি হিসেবে এ দুনিয়ায় কাজ করা। নিজের মতে সন্তোষ অর্জন ও খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা করা উচিত নয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম নারী-পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করে। এখানে সমতা মানে অভিন্নতা নয়।

ইসলামে নর-নারীর ভূমিকা সম্পূরক, বৈপরীত্যের নয়; সম্পর্ক অংশীদারীত্বের বিরোধিতার নয়, যা শ্রেষ্ঠত্বের সংগ্রামে লিপ্ত করে।[১৩]

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

ইসলাম নারীকে সম্মানিত করেছে এবং তার মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করেছে। যদিও কোন কোন 'মুসলিম সমাজ অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে নারীর ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ও মর্যাদা দিচ্ছে না' তথাপি কুরআন এবং হাদীস বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, একমাত্র ইসলামই নারীকে আধ্যাত্মিক, আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, মানবিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে অনুপম মর্যাদা দিয়েছে।[১৪] বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অধিকার ও মার্যাদাকে ডা. জাকির নায়েক ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন:

১. আত্মিক অধিকার

২. অর্থনৈতিক অধিকার

৩. সামাজিক অধিকার

৪. শিক্ষার অধিকার

৫. আইনগত অধিকার

৬. রাজনৈতিক অধিকার

আত্মিক অধিকার

প্রথমত: ইসলামে কোন আদি পাপের ধারণাই নেই এবং এর দায়ভার বিবি হাওয়া (আ.) থেকে সকল মহিলাদের উপর আসারও কোন সুযোগ নেই। দ্বিতীয়: যখন খ্রিস্টান বিশ্ব-নারীর আত্মা আছে কিনা এবং নারী মানব প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত কিনা এই বির্তক ছিল; তখন ইসলামই ঘোষণা করে যে, প্রথম মানব-মানবী একই রূহ (Essence) থেকে সৃষ্টি। আল্লাহ মানব-মানবী উভয়কে সৃষ্টি করে নিজের নূর থেকে তাদের রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। এভাবে ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে মূলত: একই মর্যাদা দেয়।

ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমাদের ভুল ধারণা এই যে, তারা চিন্তা করে ইসলামে জান্নাত শুধু পুরুষদের জন্য। কিন্তু আল-কুরআনে নারী-পুরুষে সমান পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে:

"তোমাদের যে কেউ সে নারী হোক বা পুরুষ মুমিন সৎ আমল করলে জান্নাতে প্রবেশ করার এবং সামান্যতম অবিচারও তাদের প্রতি করা হবে না।"[১৫]

"যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, সে পুরুষ হোক কি নারী, যদি সে মুমীন হয় আল্লাহ্ তাকে দুনিয়ায় পবিত্র জীবন-যাপন করাবেন, আর (পরকালে) এ ধরণের লোকদেরকে উত্তম আমল অনুপাতে প্রতিফল দান করবেন।"[১৬] এছাড়া নারী পুরুষের আধ্যাত্মিক সমতার কথাও বলা হয়েছে ইসলামে।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য একই ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে বলা হয়েছে। ঈমান নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত উভয় (সামর্থবানদের জন্য)-এর জন্যই সমানভাবে ফরজ। অবশ্য মহিলাদের কিছু প্রাকৃতিক অসুবিধার জন্য কিছু ছাড় দেয়া হয়েছে। কিন্তু এসব ছাড় বা সুবিধা মহিলাদের মর্যাদা নিচু করে না। বরং এসব ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করে এক অর্থে ইবাদতই করে থাকেন।[১৮]

ইসলামে নারীর মর্যাদা অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত

ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা দিয়েছে। যদিও বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থা আশাব্যঞ্জক নয়। প্রথমেই বলা যায় বেতনের কথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের তুলনায় কম মজুরী পেয়ে থাকেন। ইংল্যান্ডে আশি লক্ষ বেতনভুক্ত মেয়ে কর্মচারীর মধ্যে মাত্র দশ লক্ষ পুরুষের সমান বেতন পান। সুইডেন ও জার্মানীর মত দেশেও প্রায় ৭০ শতাংশ শ্রমজীবী মহিলা একই কাজের জন্য পুরুষের চেয়ে ২০ থেকে ২৫ ভাগ কম বেতন পায়।[১৯] পৃথিবীর জন সংখ্যার অর্ধেক মহিলা। কিন্তু তারা কাজ করে মোট কর্ম-ঘন্টার দুই-তৃতীয়াংশ। এই দুই-তৃতীয়াংশ কাজের জন্য তারা আয় করে পৃথিবীর মোট আয়ের মাত্র ১০ শতাংশ। আর প্রহসনের মত শোনালেও পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের মাত্র ১ শতাংশ রয়েছে মেয়েদের দখলে।[২০] আধুনিক কালেই নারীর অর্থনৈতিক চিত্র যখন এ রকম, তখন প্রাচীন কালের নারীর অর্থনৈতিক চিত্র কেমন হবে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম নারীর জন্য যে ব্যবস্থা রেখেছে তা সর্বকালের সেরা হিসেবে বিজ্ঞজনেরা বিশ্বাস করেন।

নারীর সম্পদ অর্জন প্রসঙ্গে ইসলাম

ইসলামী মতে একজন নারী বিয়ের পূর্বে বা পরে যে কোন পরিমাণ সম্পদ অর্জন করতে পারেন। তাঁর সম্পদ তিনি কারো পরামর্শ ছাড়া ইচ্ছেমতো বিক্রি করতে, ভাড়া দিতে, ঋণ দিতে, দান করতে পারেন। ইসলাম আরও বলে যে, বিয়ের পর মেয়েদের স্বামীর নামে নাম রাখার প্রয়োজন নেই। এটি একটি প্রতীকী প্রমাণ যে, ইসলাম তার ব্যক্তিত্ব সবসময়েই হেফাজত করে।

নারী ও তার সম্পদের ব্যাপারে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি

এনসাইক্লোপেডিয়া আমেরিকার মতে ইংরেজ সাধারণ আইনে একজন মহিলার যাবতীয় সম্পত্তি তার বিয়ের পর স্বামীর মালিকানায় চলে আসত। স্বামী তার জমি থেকে ভাড়া গ্রহণ বা যে কোন লাভ তোলার সামর্থ্য রাখতেন। পরবর্তীতে ১৮৭০ সালের পর ইংল্যান্ডে; তারও পর ইউরোপে এই আইনের সামান্য সংশোধন করা হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া এই সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবেন না। এই সংশোধনীর পর বিবাহিত মহিলারা সম্পত্তির ক্রয় ও চুক্তি করার অধিকার পায়।[২১] ফ্রান্সে ১৯৩৮ সালের পূর্বে এ অধিকার স্বীকৃত ছিল না। অথচ সপ্তম শতকের অন্ধকার যুগে ইসলাম নারীকে এর চাইতে অনেক বেশী অধিকারই দিয়েছিল। তা দেখে অনেক পশ্চিমা লেখকই অবাক হন যে, সেই অন্ধকার যুগে মুহাম্মদ (সা.) কিভাবে এত সুন্দর আইন প্রণয়ন করলেন।[২২] তারা জানতেন না যে, এ আইন মুহাম্মদ (সা.) প্রণয়ন করেননি; এই আইন সমগ্র বিশ্ববিধাতা আল্লাহ্ সুবহানাহুতায়ালার যিনি সুবিচক্ষণ ও সুবিচারক।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদে মুসলিম নারীর উত্তরাধিকার

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আগমনের সময় সম্পত্তিতে নারীর তো কোন অধিকার ছিলই না বরং নারী নিজেই ছিল সম্পত্তির অংশ। স্বামীর মৃত্যুর পর তার ছেলে সন্তানরা অন্য সম্পত্তির সাথে স্ত্রীদেরও ভাগ করে নিত। শুধু যে আরবদের মধ্যেই এমন ছিল তা নয়। অথচ সে যুগেই কুরআন সম্পদে নারী পুরুষ উভয়ের ন্যায্য অধিকার ঘোষণা করে। তাদের পাওনা অংশ স্বয়ং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত, যা কারো পক্ষে বদলানো সম্ভব নয়। কেউ চাইলে তার কোন বংশধরকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। আরও লক্ষ্য করার বিষয়, কুরআনে যে আয়াতে সম্পদ বণ্টন সংক্রান্ত আলোচনা এসেছে তা নাযিল হয়েছিল একজন মহিলার অভিযোগের প্রেক্ষিতে।[২৩] মুসলিম উত্তরাধিকার আইন কুরআনেই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। তার দু'টো প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

ক) এখানে সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্পদ বণ্টিত হয়।

খ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের অংশ মহিলাদের দ্বিগুণ, এটা পুরুষের বহুমুখী দায়-দায়িত্বের কারণেই হয়েছে।[২৪]

সম্পদে নারীর অংশ অর্ধেক হওয়া জুলুম কিনা

শুধুমাত্র সম্পদ বণ্টনে প্রাপ্ত অংশের ভিত্তিতে এমন মন্তব্য করা অজ্ঞতাপ্রসূত এবং অন্যায়। কারণ নারী শুধু এই এক উৎস থেকেই সম্পদ পায় না। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তাকে আরও আয়ের উৎস দিয়েছেন। দিয়েছেন অনেক দায়িত্ব থেকে মুক্তি, পক্ষান্তরে পুরুষের রয়েছে অনেক আর্থিক দায়িত্ব। নীচে নারীর আর্থিক সুবিধাগুলো উল্লেখ করা হল:

ক) বিয়ের পূর্বে বাগদানে (Engagement) নারী যা উপহার পায় তা সবই তার ।

খ) বিয়ের সময় সে স্বামীর কাছ থেকে মোহরানা পায়, যা সাধারণত: নগদ অর্থে দেয়া হয়। (মোহরানা বকেয়া থাকলে তা স্বামীর সম্পদ থেকে দিতে হবে এবং এটা তার নিজের সম্পত্তি।)

গ) বিয়ের পূর্বে সে কোন সম্পদের মালিক থাকলে সে মালিকানা বিয়ের পরও অব্যাহত থাকবে। তার স্বামী ঐ সম্পদ দাবি করতে পারবেন না।

ঘ) স্ত্রী যদি আর্থিকভাবে স্বামীর চেয়ে ধনীও হন তবুও তার উপর সংসারের কোন খরচের দায়িত্ব নেই। তার এবং সন্তানদের খাবার, পোশাক, বাসস্থান, নিরাপত্তা, চিকিৎসা, বিনোদনসহ সকল খরচের দায়িত্ব স্বামীর।

ঙ) বিবাহিত জীবনে সে চাকরী করে বা টাকা খটিয়ে যা আয় করবে তা সবই তার এবং নিজের ইচ্ছেমতো তা খরচ করতে পারবে।

চ) কোন কারণে তালাক হলে মোহরানার অবশিষ্ট অংশ সে তাৎক্ষণিকভাবে পাবে।

ছ) তালাকের পর ইদ্দত কালে সে পুরো-ভরণ-পোষণ পাবে এবং পরবর্তীতেও সন্তানদের পুরো খোরপোষের খরচ পেতে থাকবে।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, সার্বিকভাবে ইসলাম নারীকে আর্থিকভাবে লাভবান করেছে। পুরুষের উপর সব আর্থিক দায়িত্ব দিয়ে নারীকে তা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। পুরুষের এত সব দায়িত্বের জন্যই পিতার সম্পদ বন্টনের সময় তার অংশ একটু বেশী ধরা হয়েছে। এ দায়িত্ব কেবল পরিবার ভরণ-পোষণের জন্যেই নয়, দরিদ্র আত্মীয়দের ক্ষেত্রেও বর্তায়। মনে রাখা দরকার যে, এই বন্টন ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ্ করেছেন। যিনি নারী বা পুরুষ নন। যিনি সারা জাহানের প্রভূ, সর্বস্রষ্টা ও ন্যায়ের প্রতীক। (আল-মীজান)।

মেয়েদের কাজ করা প্রসঙ্গে

ইসলামে একজন নারী যদি কাজ করতে চায় তাহলে করতে পারে, এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞামূলক কোন দলিল নেই, যতক্ষণ না তা হারাম হবে, সে বাইরেও যেতে পারবে তবে (তার মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে) শরীয়াহ সমর্থিত পোশাক পরিধান করে যেতে হবে। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহ মতে মেয়েদের কাজ করায় কোন বাঁধা নেই। বরং একটি আদর্শ ইসলামী সমাজে কিছু কাজ মেয়েদের জন্যই বেশী উপযুক্ত। যেমন, প্রাইমারী স্কুল (যেথায় বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা তাদের শিক্ষিকা থেকে জ্ঞান অর্জন করবে) থেকে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়া মেয়েরাই করাবে; এছাড়া নার্সিং, চিকিৎসা ইত্যাদি। ইসলামী আইনে নারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে মাতৃত্ব, শিশু পালন ও সংসার পরিচালনা। যদি বাইরের কাজ ও ঘরের কাজে দ্বন্দ্ব বাধে তবে সামাজিক গুরুত্বের কথা ভেবে, ঘর রক্ষাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। এছাড়া সামগ্রিকভাবে মেয়েদের চাকরী বাকরী করায় ইসলামে কোন বাধা নেই। কর্মস্থলে তারা পুরুষদের মতো একই হারে মজুরী পাবে।[২৬]

কিন্তু প্রকৃতিগত কারণে তিনি তাঁর দেহ ও সৌন্দর্যের প্রদর্শনীমূলক কোন কাজে অংশ নিতে পারবেন না। যেমন- মডেলিং, অশ্লীল সিনেমা এবং এ ধরণের নানাবিধ কাজে। আরো কিছু নিষিদ্ধ কাজ আছে যা নারীর জন্য হারাম, পুরুষের জন্যও হারাম। যেমন- সুরা ও মদ সরবরাহ করা। জুয়া খেলা, অন্যান্য অসৎ ব্যবসা এ সকল কাজ নারী-পুরুষ সকলের জন্যই নিষিদ্ধ। সত্যিকার মুসলিম সমাজ নারীদের ডাক্তারী পেশা গ্রহণে উৎসাহিত করে। আমাদের মহিলা গাইনোকোলজিস্ট দরকার। আমাদের মহিলা নার্স দরকার, মহিলা শিক্ষিকা দরকার।[২৭]

কিন্তু একজন মহিলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন বাধ্য-বাধকতা বা দায়-দায়িত্ব নেই। অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব পরিবারের পুরুষের ওপর ন্যাস্ত। অতএব জীবিকার্জনের জন্য তার কোন দায়-দায়িত্ব নেই। বাস্তব ক্ষেত্রে যেখানে অর্থনৈতিক সংকট আছে, সেখানে তার কাজ করার সুযোগ আছে। এখানেও তাকে কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না, তিনি তার নিজস্ব সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছায় কাজ করবেন।

আমি যে সকল পেশার কথা উল্লেখ করলাম এর বাইরে তিনি ঘরে দর্জির কাজ করতে পারেন। এমব্রয়ডারী, কুমারের কাজ বা ঝুড়ি তৈরির কাজসহ তার সাধ্যানুযায়ী যে কোন বৈধ কাজ করতে পারেন। তিনি ফ্যাক্টরি বা ছোট আকারের কারখানা যেগুলো নারীদের জন্য করা হয়েছে, সেখানেও কাজ করতে পারেন। তিনি এমন

Dhaka University Institutional Repository

স্থানে কাজ করতে পারেন যেখানে নারীদের জন্য পৃথক সেকশন করা আছে। কেননা ইসলামে নারী-পুরুষে মেলামেশার বিধি-নিষেধ রয়েছে। তিনি ব্যবসা করতে পারেন, যেখানে লেনদেনের প্রশ্ন আসে, বিশেষ করে বিদেশী কোন পুরুষ বা গায়রে মাহরামের সাথে লেন-দেনের প্রশ্ন আসে সেখানে তিনি পিতা, ভাই, স্বামী অথবা পুত্রের মাধ্যমে এগুলো করতে পারেন।[২৮]

সর্বোত্তম উদাহরণ বিবি খাদীজা (রা.)-এর আমাদের প্রিয়নবী করীম (সা.)-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাঁর সময়ের সবচেয়ে সফল ব্যবসায়ী মহিলা ছিলেন এবং তিনি তাঁর লেন-দেন তাঁর স্বামী নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে করতেন।[২৯]

বর্তমানে সামাজিক উন্নতি ও উৎপাদনকে যারা শুধু টাকা উপার্জনের মাপকাঠিতে বিবেচনা করেন তারা মনে করতে পারেন মাতৃত্ব অনুৎপাদনশীল কাজ। কিন্তু যখন মানবিকতা ও নৈতিকতার বিবেচনায় এটা মাপা হয় তখন শিশু পরিচর্চা ও সংসার রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ঘর সংসার অরক্ষিত রেখে ক্যারিয়ার গড়তে গেলে তাকে উৎপাদনশীল কাজ আর ঘর রক্ষাকে অনুৎপাদনশীল কাজ বলা হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের বিপর্যয় হয়েছে এখানেই যে, মাতৃত্বের দায়িত্বকে ছোট করে দেয়া হচ্ছে। যদি মাতৃত্ব, শিশু পালন ও ঘর রক্ষার জন্য পারিশ্রমিক দেয়ার বিধান থাকত তাহলে একজন স্বামী তার স্ত্রীর পারিশ্রমিক দিতে গিয়ে দেউলিয়া হয়ে যেতেন। আধুনিক ডে কেয়ার সেন্টারগুলোর কথাই যদি ধরা যায় তাহলেও বিষয়টি অনেক বোধগম্য হয়। পারিবারিক কাঠামো ভেঙ্গে যাওয়ায় আদমের সন্তান পথে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, দুষ্টু লোকের শিকারে পরিণত হচ্ছে। ড্রাগ এবং মাদকসক্তিসহ বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে।

ইসলামে নারীর অধিকার সামাজিক প্রেক্ষিত

ইসলামে নারীর সামাজিক অধিকারকে চারটি উপবিভাগে ভাগ করে দেখানো যেতে পারে কন্যা, মাতা, স্ত্রী ও বোন হিসেবে।

কন্যা সন্তান জন্ম সম্পর্কে ইসলাম

ইসলামের আবিভাবের পূর্বে আরবে কন্যা সন্তান হত্যা করা হত অন্যান্য স্থানেও কন্যা সন্তানকে অশুভ ভাবা হত এখনও ভারত ও চীনের মত দেশে সুকৌশলে কন্যা শিশু ভ্রূণ হত্যা করে মেয়ে শিশু জন্মের হার নীচু রেখেছে।[৩০] ইসলাম এই খারাপ চর্চাকে শুধু বন্ধই করেনি বরং কুরআন একে সরাসরি 'খুন' বলে ঘোষণা করেছে এবং মানুষকে এই ধারণায় দীক্ষিত করেছে যে, পুত্র-কন্যা দুই ধরণের সন্তানই আল্লাহ্‌র উপহার। (আল-কুরআন, ৮১:৮-৯, ১৬:৫৮)।

ইসলামে মেয়েদের প্রতি সদয় হবার নির্দেশনা

হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তানকে লালন পালন করে বড় করবে, "সে এবং আমি এমনই কাছাকাছি থাকব" (এই বলে তিনি তার হাতের পাশাপাশি দু'আঙ্গুলের অন্তরঙ্গতাকে দেখালেন) তিনি আরও বলেন যে, যার একটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাকে জীবন্ত কবর দিল না, তাকে অপমানিত

Dhaka University Institutional Repository

করল না এবং পুত্রদেরকে তার উপর প্রধান্য দিল না, আল্লাহ্ তাকে বেহেশতে দাখিল করবেন। মুহাম্মদ (সা.) তাঁর নিজের জীবনে তিনি এসব শিক্ষার বাস্তাব প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

স্ত্রী হিসেবে নারীঃ ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গি

পূর্ববর্তী সকল সভ্যতাই নারীকে 'শয়তানের যন্ত্র' হিসেবে বিবেচনা করত। কুরআন নারীকে 'মুহসানী' আখ্যা দিয়েছেন যার অর্থ "শয়তান থেকে সুরক্ষিত।" ভাল নারীকে একজন বিয়ে করলে সে তাকে খারাপ পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং সিরাতুল মুস্তাকীম এর ওপর টিকিয়ে রাখে যেটা হচ্ছে সঠিক পথ। হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এরশাদ করেন, "ইসলামে কোন বৈরাগ্যবাদ নেই।"

"যাদের বিয়ের সামর্থ আছে, তারা যেন বিয়ে করে। এটা তাদের চক্ষুকে অবনত রাখে এবং লজ্জা স্থানকে রক্ষা করে।"[৩১] হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত অপর এক হাদিসে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, যে বিয়ে করে সে তার দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করে।"

ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে এক পবিত্র বন্ধন। বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রী তার স্বামীর দাসী-বা স্বামী তার প্রভুতে পরিণত হয় না। ইসলামে আল্লাহ্ই একমাত্র প্রভু এবং সকল মানব মানবী তার দাস-দাসী। কুরআন বিবাহ বন্ধনকে আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত বলেছেন যা হচ্ছে স্থিতিশীলতা, শান্তি, পারস্পরিক ভালবাসা ও আকর্ষণের উৎস। এজন্যই ইসলামে বিয়ের ব্যাপারে সম্মতি (Consent)-এর এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।[৩২] স্ত্রীর সাথে ব্যবহারে রসূলুল্লাহ্ (সা.) কথা এবং জীবন ছিল অনুপম আদর্শ। নারী পুরুষের একের উপর আরেক জনের ন্যায়ানুগ অধিকার রয়েছে। (২:২২৮)

ইসলামে মায়ের অগ্রাধিকার

কুরআন আল্লাহ্র এবাদতের পরেই পিতামাতার প্রতি বিশেষভাবে মায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সদয় হতে পরামর্শ দেয়। মুসলমানের জন্য পাশ্চাত্যের মতো বৃদ্ধ পিতামাতাকে নার্সিং হোম বা বৃদ্ধ আশ্রমে রাখা নিষ্ঠুর, নির্দয় ও অনৈসলামিক আচরণ। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, "মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত।" তিনি আরও বলেন, উত্তম চরিত্রের মানুষ মহিলাদের প্রতি দয়াশীল হয় এবং একমাত্র খারাপ লোকেরাই তাদের অপমান করে।

শুধু তাই নয় হাদিসে এসেছে একদা এক লোক নবী কারীম (সা.)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, এ দুনিয়ায় কে আমার সদ্ব্যবহার ও সম্মান পাওয়ার বেশি হকদার? রসূলুল্লাহ্ (সা.) উত্তর দিলেন, তোমার মাতা, তারপর কে? তোমার মাতা তারপর কে? তোমার মাতা। লোকটি চতুর্থবার জিজ্ঞেস করল তারপর কে? নবী (সা.) বললেন, তোমার পিতা।[৩৩] অর্থাৎ ৭৫% সম্মান মায়ের জন্য এবং পিতার জন্য ২৫% সম্মান। বস্তুত এভাবেই ইসলাম নারীকে মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন। যা অন্য কোন ধর্ম বা সভ্যতায় এত অধিক পরিমাণ দেখা যায় না।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

বোন হিসেবে নারী ইসলামী প্রেক্ষিত

বোন হিসেবেও ইসলামে নারীর রয়েছে উল্লেখযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক।" (সূরা তওবা, ৯:৭১)

অর্থাৎ তারা একে অপরের সহায়ক, ব্যবস্থাপক, তারা ভাই বোন সদৃশ। এছাড়া আরো অনেক বিষয়ে যেমন- বহু বিবাহ, তালাক, প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীকে অনেক মর্যাদা ও সুবিধা দেয়া হয়েছে ইসলামে।

ইসলামে নারীদের শিক্ষা গ্রহণের অধিকার

বিশ্বের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআনের প্রথমে নাযিলকৃত পাঁচটি আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন:

"পড় বা তেলাওয়াত কর তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এক বিন্দু রক্তপিন্ড দ্বারা। পড়, তোমার প্রভু বড়ই সম্মানিত। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন যিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।"[৩৫]

আল-কুরআনের প্রথম নির্দেশনা যেটা মানবতার প্রতি নাযিল হয়েছিল তা নামায নয়, রোযা নয়, যাকাত দান নয়- তা ছিল পড়া- ইসলাম শিক্ষার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে। শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে যেয়ে নারী বা পুরুষের জন্য শিক্ষা নয় বরং সকল মানবজাতির জন্য শিক্ষার কথা বলা হয়েছে।

নবী করীম (সা.) পিতা-মাতাকে সর্বাধিক তাগিদ দিয়েছেন যেন তারা কন্যা সন্তানকে শিক্ষা দেয় স্বামীদেরকে স্ত্রীদের শিক্ষার সুযোগ দিতে বলা হয়েছে ইসলামে। নবী (সা.) নিজে এবং সাহাবা (রা.) নির্দিষ্ট নারীদের শিক্ষা দিতেন।

উল্লেখ্য ১৪০০ বছর পূর্বে যখন নারীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হতো, তাদের শিক্ষা তো দূরের কথা তাদেরকে পণ্য দ্রব্যের মতো অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হতো। সে মুহূর্তে নারীর শিক্ষাদানের প্রতি কতই না তাকীদ।

ইসলামে জীবিকার প্রয়োজনে নারীর যে কোন বৈধ কাজ করতে বাধা নেই। বরং ইসলামী রাষ্ট্রে কিছু কাজে মহিলাদেরই অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এসব প্রয়োজনেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ নারীর জন্য আবশ্যক। যে সব কাজে মেয়েদের অগ্রাধিকার থাকে তার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে শিক্ষকতা, চিকিৎসা, নার্সিং, ইত্যাদি। ইসলামে জ্ঞানার্জন শুধু প্রত্যেক নারী পুরুষের অধিকার নয় বরং তা বাধ্যতামূলক কর্তব্য। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ। কুরআনেও এর সমর্থনে বলা হয় জ্ঞানীদের আল্লাহ্ বিশেষ মর্যাদা দেবেন।

মেয়েদের কোন বিষয়ে শিক্ষ গ্রহণে কোন বাধা বা সীমাবদ্ধতা আছে কী?

ইসলামে এমন কোন আইন নেই যা বিশেষভাবে মেয়েদের কোন বিষয়ে জ্ঞানর্জনের সুযোগ নষ্ট করে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য যার চর্চা নিষিদ্ধ এমন দু'একটি বিষয় আছে যেমন যাদুবিদ্যা। আবার কয়েকটি

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় আছে যার জ্ঞান অর্জন নারী পুরুষ উভয়ের জন্য ফরজ, তা হচ্ছে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় কাজগুলো, নৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি। কিছু বিষয় আছে যা বিশেষভাবে মেয়েদের শিখতে উৎসাহিত করা হয় বা তাদের আল্লাহ্ প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে দক্ষ করে, যেমন-শিশু পরিচর্যা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, নার্সিং, চিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদি। এছাড়া বিজ্ঞান, কলা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে জ্ঞানের সুযোগ পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্য উন্মুক্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো উপকারী ও প্রয়োজনীয়।

ইসলামে নারীর আইনগত অধিকার

ইসলামী আইন অনুযায়ী নারী-পুরুষ সামান্য হত্যাকারী যদি পুরুষ হয় সে যেমন শাস্তি পাবে নারী হলেও তেমনি। (২:১৭৮-১৭৯) চুরির ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে "চোর যে নারী বা পুরুষ যাই হোক না কেন, তার হাত কেটে দাও, তার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দৃষ্টান্ত।[৩৬] অনুরূপভাবে ব্যভিচার-এর ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের একই শাস্তির কথা বলা হয়েছে।[৩৭] আধুনিককালে ইহুদি পুরোহিতরা বিবেচনা করছে যে, নারীদের সাক্ষ্যদানের অধিকার দেয়া হবে কিনা[৩৮] অথচ ইসলাম ১৪০০ বছর পূর্বে সে অধিকার দিয়ে রেখেছে এছাড়াও আরো অনেক ক্ষেত্রেই ইসলাম নারীর মর্যাদা দিয়েছে।

ইসলামে নারীর মর্যাদা রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, যাতে আছে নৈতিক, অধ্যাত্মিক, সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক বিষয়সহ জীবনের সব কিছুর পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা। কুরআন এবং হাদীস থেকে এটা নিশ্চিত যে, শান্তিপূর্ণ সমন্বিত ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠা মুসলিম নারী এবং পুরুষ উভয়ের দায়িত্ব। সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা বন্ধু এবং অভিভাবকের মতো একে অপরকে সহযোগিতা করবে। এই সহযোগিতা আর সবক্ষেত্রের মতো রাজনীতিতেও প্রযোজ্য। কুরআন ও হাদীসে যেসব স্থানে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে বলা হয়েছে, তা নারী পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য।[৩৯] আর এই সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ ব্যক্তি জীবন থেকে রাজনৈতিক জীবন পর্যন্ত সর্বত্র ব্যাপ্ত। প্রত্যেক মুসলমান নর ও নারীর সামাজিক কার্যকলাপে সক্রিয় ভূমিকা রাখা আবশ্যক।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে মুসলিম মেয়েদের নিজের মত তুলে ধরা প্রসঙ্গে

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবদ্দশায় এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মুসলমানরা নিজেদের পুরোপুরি ইসলাম সম্মতভাবে পরিচালিত করত। সেই সময়ের ইতিহাসে দেখা যায় মুসলিম মেয়েরা সমাজে তাদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন ছিল এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামত ও অভিযোগ তুলে ধরত। কোরআনের ৫৮ নং সুরার প্রথম কয়েক আয়াত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে একজন মহিলার আনীত অভিযোগ প্রসঙ্গে নাযিল হয়। আল্লাহ্ তা'আলা সেই মহিলার বক্তব্য শুনেছেন এবং গ্রহণ করেছেন। ওসমান (রা.)-এর শাসনকালে বিভিন্ন বিষয়ে আয়েশা (রা.) সরকারের কঠোর সমালোচনা করতেন। কিন্তু ওসমান (রা.) বা কেউ সে সমালোচনার জবাবে একথা বলেননি যে নারী রাজনৈতিক বিষয়ে বক্তব্য দিতে পারে না। ওসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর আলী (রা.)-এর খলিফা হিসেবে মনোনয়নের বিরুদ্ধে আয়েশা (রা.) দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন, কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

কেউই তার মতামতের অধিকারের বিপক্ষে কিছু বলেননি। যদিও পরবর্তী সময়ে আয়েশা (রা.)-এর জন্যে অনুশোচনা করেন, কেননা আলী (রা.)-এর বিরোধিতা করা ভুল (bad judgement) ছিল। একবার ওসমান (রা.)-এর স্ত্রী রাজনৈতিক বিষয়ে বলতে চাইলে তাঁর একজন সহযোগী বাধা দিলে ওসমান (রা.) বলেন, "তাঁকে বলতে দাও, সে তাঁর উপদেশ প্রদানে তোমার চেয়েও আন্তরিক।" কাজেই মুসলিম মেয়েরা রাজনৈতিক বিষয়ে অংশ নিতে পারে। যদিও তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব ঘর রক্ষা, তবুও এটা তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেয় না।[৪০]

মেয়েদের ভোটাধিকার প্রসঙ্গে ইসলাম

রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রতিষ্ঠিত ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভোটের প্রচলন ছিল না। তখন জনগণের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ব্যক্তি জনগণের কাছে বাইয়াৎ (আল্লাহ্র অনুগত শাসক হিসেবে তার আনুগত্যের শপথ) আহ্বান করতেন। কুরআন এবং হাদীসে দেখা যায় তখন মেয়েরাও বাইয়াত করতেন। ৬০ নং সূরার ১২ নং আয়াতে দেয়া যায় একদল নারী রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাতে বাইয়াত নিতে চাইলে কুরআন নবীকে 'তাদের' বাইয়াত নিতে আদেশ করে।[৪১] ইতিহাস থেকে এটাও জানা যায় যে, আকাব নামক স্থানে একদল মদিনাবাসী তাঁর নিকটে বাইয়াত হন। তাদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও ছিলেন।[৪২]

বাইয়াত ও ভোট প্রয়োগ

যখন মহিলারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে বাইয়াত নিচ্ছিলেন তখন তারা শুধু মুহাম্মদ (সা.)-এর আল্লাহ্র রসূল হবার স্বীকৃতিই দিচ্ছিলেন না বরং মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র প্রধানের স্বীকৃতিও দিচ্ছিলেন। তাদের এ বাইয়াত শুধু এই স্বীকৃতিই ছিল না যে, তারা ইসলামের নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা মেনে চলবে বরং এই শপথ ছিল যে, তারা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সকল আদেশ (যার অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক ও সমাজিক আদেশও) নির্দ্বিধায় মেনে চলবে। বস্তুত: ইসলামে ধর্মকে রাজনীতি ও সমাজনীতি থেকে পৃথক করার কোন উপায় নেই।

আইন প্রণেতা ও নেতা হিসেবে মেয়েদের নির্বাচিত হওয়া প্রসঙ্গে

যদিও ইসলামে নেতা নির্বাচনে নিয়ম ভিন্নতর তবুও পাশ্চাত্য নির্বাচন পদ্ধতির সাথে এর কিছু মিল আছে। ইসলামে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত শুরা অর্থাৎ পরামর্শের মাধ্যমে করতে হয়। যদিও প্রথমিক যুগের মুসলমানরা কোনো বিশেষ ভবন তৈরি করেনি যার নাম 'পার্লামেন্ট' বা সংসদ ভবন বলবে- যেখানে সংসদীয় আলোচনা ও মিটিং হবে, খলিফারা জনগণকে ডাকতেন এবং কোন বিষয়ে পরামর্শ নিতেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর পর, খলিফারা একদল লোকের পরামর্শ নিতেন, যাদের সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেয়ার অভিজ্ঞতা, ক্ষমতা ও দক্ষতা ছিল। মুসলমানদের জন্য সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করার গুরুত্ব আরো ব্যাপকতর হয় এ হাদীসে, যেখানে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, "সত্য ঈমান হচ্ছে উপদেশ দেয়া" (True faith is advice)। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময়েও কোন কোনো বিষয়ে মহিলাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেবার নজির আছে। মহিলাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেবার ব্যাপারে কেউ বৈধতার প্রশ্ন তুলেছে এমন নজির নেই। তবে পরামর্শ নেবার পদ্ধতি ছিল ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী।[৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম যুগের মুসলিম নারীদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উদাহরণ

দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.) যখন দেখলেন যে, জনগণ বেশী অংকের মোহরানা (কাবিন) দিচ্ছে, তখন তিনি মোহরানাকে সর্বোচ্চ ৪০০ দিরহামে স্থির করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এর বেশী যেই দেবে সেই টাকা বায়তুল মালে জমা করার সিদ্ধান্ত তিনি দিলেন। তিনি যখন মসজিদুন নববীতে এই ঘোষণা দিচ্ছিলেন তখন একজন মহিলা আপত্তি করে বললেন, 'হে ওমর তোমার এ কাজের অধিকার নেই"। এ প্রসেঙ্গে মহিলা কুরআনের একটি আয়াত উদ্ধৃত করলেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, স্বামী যদি স্ত্রীকে অঢেল স্বর্ণ পরিমাণ মোহরানা দেয় তবুও সে তা ফিরিয়ে নিতে পারবে না। রাষ্ট্রপ্রধানের মুখের উপর এই কথা বলার জন্য মহিলার বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করেনি। বরং ওমর (রা.) আরও আক্ষেপ করে বললেন, "হে ওমর, তোমার চেয়ে অনেকে বেশী জানে"। এভাবেই প্রাথমিক যুগের মহিলারা রাষ্ট্রীয় পলিসি নির্ধারণেও ভূমিকা রাখতেন।[৪৪]

ওমর (রা.) এবং উক্ত মহিলার যুক্তিতর্ক আধুনিক পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার প্রতীক

ওমর (রা.)-এর সময়কার উল্লিখিত ঘটনার সাথে আধুনিক পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার অনেক মিল আছে। যেমন-

ক) ওমর (রা.) কর্তৃক মসজিদে দাঁড়িয়ে মোহরানার সীমা নির্ধারণ করার প্রস্তাব আধুনিক পার্লামেন্টে সংসদ নেতা কর্তৃক কোন আইন সংশোধন প্রস্তাব আনার অনুরূপ।

খ) এই প্রস্তাব আনার স্থানটি আধুনিক পার্লামেন্ট ভবনে ছিল না। এটা মসজিদে ছিল। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, ইসলামে মসজিদ শুধু নামাজেরই স্থান নয় বরং খেলাফতের যুগে রাষ্ট্রীয় কাজ নেতারা মসজিদে বসেই করতেন। মসজিদে বসেই যুদ্ধ পরিচালনা, বিদেশী কূটনৈতিক মিশনকে গ্রহণ করা, সবই হত।এখানে জনগণ যেতেন রাষ্ট্র নায়কদের কথা শুনতে ও প্রয়োজনে পরামর্শ দিতে। কাজেই সব মুসল্লীই পার্লামেন্ট সদস্যদের সমান মর্যাদা পেতেন।

গ) ওমর (রা:) জনগণের কাছে তাঁর প্রস্তাব রাখায় বোঝা যায় তাঁর সিদ্ধান্তের উপর মতামত দেবার অধিকার জনগণের ছিল।

ঘ) সমাজের সব স্তরের মানুষই মসজিদে উপস্থিত থেকে তাদের মতামত সমানভাবে প্রয়োগের সুযোগ পেত।

ঙ) উক্ত মহিলা ওমর (রা:)-এর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন যে, ঐ প্রস্তাব সংবিধান পরিপন্থী। ইসলামী রাষ্ট্রে কুরআনই হচ্ছে সংবিধান, যা কোনো মানুষ পরিবর্তন করতে পারে না।

চ) মহিলার সংশোধনী শুনে তার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে ওমর (রা:) সঙ্গে সঙ্গে তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

এ ঘটনার বর্ণনাকারী তার বর্ণনায় মহিলার নাম উল্লেখ করেননি। তাতে প্রতীয়মান হয় মহিলা তদানীন্তন সমাজের কোনো উল্লেখযোগ্য কেউ ছিলেন না। তখন মসজিদে সমবেতদের মধ্যে রসূল (সা:)-এর পরিবারের সদস্য এবং অনেক সাহাবাও ছিলেন। কিন্তু কেউ কোনো মহিলার রাজনৈতিক মত প্রদানের বৈধতার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেননি। এতে বুঝা যায় তখনকার সমাজে আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

মেয়েরা স্বাধীনভাবে তাদের মত দিতে পারত। শুধু এই ঘটনাতেই নয় এমন আরও অনেক ঘটনারই উল্লেখ পাওয়া যায়। ওমর (রা:)-এর শাহাদাতের পর নতুন খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা:) মহিলাদেরও পরামর্শ নিয়েছিলেন।

বিভিন্ন জনপ্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে নারী

সাধারণ অর্থে 'নেতৃত্ব' বলতে কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে বুঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে নেতৃত্ব বলতে যে কোনো গুরুত্বপুর্ণ ও জনগণকে নিয়ন্ত্রণকারী পদকেই বুঝায়। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম মেয়েদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কিছু কাজের দায়িত্ব দেয়া হয় যেমন চিকিৎসা, শিক্ষা, নার্সিং ইত্যাদি এসবই গুরুত্বপূর্ণ, দায়িত্বসম্পন্ন ও নেতৃত্বদানকারী কাজ।[৪৫] এগুলো সমাজ তথা রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণকারী পদ নয়? এসব পদে অধিষ্ঠিত থেকে জনগণকে নেতৃত্ব দেয়া যায়। শুধু এসব পদ কেন, যে মহিলা ঘরে বসে জাতির ভবিষ্যত প্রজন্মকে গড়ে তুলছেন তিনি কি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্ব পালন করছেন না?

ব্যাপকভাবে নেতৃত্বের এই আলোচনার পরও বলা যায় নির্দিষ্টভাবে কোনো জন প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে নারীদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শরীয়তে কোনো সর্বসম্মত বাধা নেই। বরং চিকিৎসা শিক্ষাসহ কিছু বিষয়ে দায়িত্ব ও নেতৃত্ব মেয়েদেরই থাকা উচিৎ। অন্যদিকে বেশীরভাগ আলেমের মতে যে তিনটি পদে নারীর অধিষ্ঠিত হতে বাধা আছে তা হচ্ছে-

ক) রাষ্ট্রপ্রধান

খ) বিচারক

গ) সেনা প্রধান[৪৬] (অবশ্য এই বিষয়ে আলেমদের মধ্যে ভিন্নমতও আছে)

এই নিষেধাজ্ঞার পক্ষে দলিল আছে কি না-

যদিও কুরআনে নারীর রাষ্ট্রীয় শীর্ষপদে আসীন হবার বিপক্ষের কোনো দলিল পাওয়া যায় না, তুবও আলেমরা একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দেন যেখানে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, সে জাতি উন্নতি করতে পারে না যারা তাদের নেতা হিসেবে একজন নারীকে নির্বাচিত করেন। পারস্যের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে শাহজাদী 'পুরান'-এর মনোনয়নের প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এই মন্তব্য করেন বলে উল্লেখ করা হয়। (যদিও এই হাদিসের যথার্থতা এবং এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে বেশ কিছু আলেম দ্বিমত পোষণ করেছেন)।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক নারী নেতৃত্ব সম্পর্কে এই মন্তব্যের কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে প্রথমত: এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) ইসলামী রাষ্ট্রে নেতৃত্ব সম্পর্কে বলেছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রের নেতা শুধু জনগণের মুখপাত্রই নন; তিনি প্রধান নামাজের জামাতেরও ইমাম এবং সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে, নামায এমন একটি কাজ যাতে নারীর ইমামতি করা তো দূরের কথা, পুরুষের সামনে মেয়েদের দাঁড়ানোটাই দৃষ্টিকটু। আর সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে নারীকে এখনো পর্যন্ত খোদ পাশ্চাত্যও

Dhaka University Institutional Repository

মনোনীত করেনি। আরও একটা বিষয় উল্লেখ্য যে, ইসলামী মতে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব কোন পুরস্কার তো নয়ই বরং চরমতম পরীক্ষা ও বোঝা।[৪৭] কেউই এই দায়িত্ব আগ্রহ করে নেয় না।

মেয়েদের বিচারক হতে বাধা প্রসঙ্গে

এ বিষয়ে আলেমদের ঐকবদ্ধ কোন মত নেই। যারা এর বিপক্ষে বলেন তাদের যুক্তি হচ্ছে:

ক) বিচারকদের দায়িত্বটা তাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বের অনুরূপ এবং যেহেতু মেয়েদের রাষ্ট্রপ্রধান হতে বারণ করা হয়েছে সেহেতু তাদের বিচারক হওয়াও নিষেধ।

খ) যেহেতু পরিবারের প্রধান হিসেবে ইসলামে পুরুষকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেহেতু বিচারকের আসনে নারী বসাটা এই শৃঙ্খলার পরিপন্থী। কিন্তু এর বিপক্ষে মত হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধান বাদে আর সব পদ এমনকি বিচারক পদেও নারী আসীন হতে পারবে (আত-তাবারী) অন্যদিকে ইমাম আবু হানীফা বলেন, যেহেতু মেয়েদের আদালতে সাক্ষী হবার অনুমতি দেয়া হয়েছে সেহেতু তারা বিচারকও হতে পারবে।

নারীর সাক্ষ্য পুরুষের অর্ধেক-নারীর প্রতি অবজ্ঞা কিনা

কুরআনের আর্থিক লেনদেন ও চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে নারীর সাক্ষ্যকে পুরুষের অর্ধেক ধরা হয়েছে। এর মানে এই নয় যে, নারীর মান পুরুষের অর্ধেক। মনে রাখা দরকার যে, তখন সময়টা এমন ছিল যে, মেয়েরা মূলতঃ ঘর গৃহস্থালীর কাজেই ব্যস্ত থাকতেন। অর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁরা বেশী জড়িত হতেন না। এ ধরণের চুক্তির খুঁটিনাটি বিষয় ঘরোয়া কাজের ব্যস্ততয় মনে নাও থাকতে পারতো। তাই বলা হয়েছে, "... কারণ তাদের একজন ভুলে গেলে আর একজন মনে করিয়ে দিতে পারবে"[৪৮] এখানে বলা হয়নি নারীর স্মরণশক্তি কম। এখানে মূলত: অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বলন করা হয়েছে, কেননা মানুষের কাছে ঋণ ও অর্থনৈতিক বিষয় খুবই স্পর্শকাতর এবং একজন নারী, যে ঘরের কাজে ব্যস্ত, তার পক্ষে আর্থিক চুক্তির জটিল ধারাগুলো সব মনে নাও থাকতে পারে। এছাড়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণে ইসলাম খুব বেশী উৎসাহ দেখায় না। তবে প্রয়োজনে চিকিৎসা সেবার জন্য যেতে পারে। যুদ্ধ পুরুষের জন্য। আধুনিক যুগে আমেরিকার নারীরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাওয়ায় পরিণাম কেমন হচ্ছে তা অনেকেই জানেন।

ইসলামে নারীর অধিকার প্রেক্ষিত আত্মিক, সামাজিক, আর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি আলোচনা শেষে বলা যায়, ইসলাম নারী উন্নয়নে বাধা নয় বরং সহায়ক। বিশ্বের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীকে উন্নয়নের বাইরে রেখে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম, সভ্যতা ও ইসলাম ধর্মের ভুল ব্যাখ্যাকারীদের কারণে নারী সব সময়ই বৈষম্যের শিকার হয়। ফলে বিশ্বে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রেই নারীর ক্ষতিই করেছে। যেমন আমেরিকার নারীদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের দাবী তাদের জন্য মন্দ বৈ ভাল কিছু বয়ে আনেনি।

ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। নারীর আয়ের বৈধ খাত রয়েছে অনেক অবৈধ ও নৈতিকতা বিরোধী কোন কাজ না করেও নারী প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করতে পারে এবং তার ইচ্ছামত যে কোন বৈধ কাজে অর্থ ব্যয় করতে পারে। আর এসব অধিকারই ইসলাম নারীকে দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫ ইসলামী অর্থনীতি ও রাজনীতিতে নারী স্বাধীনতা এবং নারী উন্নয়নে বাধা নয় বরং সহায়ক প্রমাণে ইসলাম

ধর্ম রাজনৈতিক উন্নয়নে বাধা কিনা-এ বিষয়ে আলোচনায় মানব সম্পদের অর্ধাংশ নারী রাজনৈতিক উন্নয়নে বাধা কিনা এবং ইসলাম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর অংশ গ্রহণকে কতটুকু স্বীকৃতি দেয় সে বিষয়টি এখানে বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে। এ ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে মুসলিম নারীর পেশাগত তথা অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণের ঘটনাবলী প্রণিধানযোগ্য।

রসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে মসুলিম নারীর পোশাগত কাজে অংশগ্রহণের ঘটনাবলী

হেদায়াতের যে নূর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে এবং রসূল (সা.) তাঁর সুন্নায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন মুসলিম নারী তার জীবনে সেই নূরের পথেই চলে থাকে। নারীর পেশাগত কাজ সম্পর্কিত যে সব বাস্তব ঘটনাবলী আমরা এখানে পেশ করছি তা পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কোন প্রসংগে কেবল উদাহরণ হিসেবে এসেছে। মহানবী (সা.) ও অন্য সকল নবী রসূলদের যুগে মুসলিম নারিগণ ব্যবহারিক জীবনে এসবের যে চর্চা করেছেন তা যদি একত্র করা হয় তবে দেখা যাবে সেগুলি মূলত আল্লাহ্ প্রদত্ত হেদায়েতের প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়। এভাবে আমাদের তথা সর্ব যুগে প্রয়োগের ক্ষেত্র বিস্তৃততর হতে থাকবে এবং তার নতুন নতুন রূপ সামনে আসবে, যা হবে সকল যুগের পরিবেশ ও অবস্থার উপযোগী।

আমরা এ অধ্যায়ে যে সব ঘটনা তুলে ধরেছি তার কোন কোনটিতে নারীর কাজ ছিল নিছক স্বেচ্ছামূলক। শরীয়ত প্রণেতা যখন এ ধরণের কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সাক্ষাতের অনুমতি দিয়েছেন তখন সে কাজ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হোক বা স্বেচ্ছামূলক হোক তাতে কিছু আসে যায় না। প্রয়োজনে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সাক্ষাত যে শরীয়ত সম্মত তা প্রমাণ করাই আমাদের এ আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয়।

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে যে সব ক্ষেত্রে নারীরা কাজ করেছে আমরা এখন সে বিষয়েই আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে যাচ্ছি।

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দুধপান করানো ও লালন পালন করা

মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: "তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী নিজেরা যে স্থানে বাস করো তাদেরকেও সেখানে বাস করতে দাও। অসুবিধায় ফেলার জন্য তাদেরকে কষ্ট দিয়োনা। তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তাদের জন্য খরচ করতে থাক। তারা যদি তোমাদের সন্তানদের স্তন্যদান করে থাকে তাহলে তাদেরকে পারিশ্রমিক প্রদান করো এবং সন্তানের কল্যাণের জন্য নিজদের মধ্যে উত্তম পন্থায় পরামর্শ করো। আর তোমরা নিজ নিজ দাবীতে অনড় থাকলে অন্য স্ত্রীলোক স্তন্য দান করবে।"[৪৯]

রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, হযরত আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, আজ রাতে আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করেছে। আমার পিতার নামানুসারে আমি তার নাম

Dhaka University Institutional Repository

রেখেছি ইবরাহীম। তারপর তাকে আবূ ইউসুফ নামের এক কর্মকারের স্ত্রী উম্মে সাইফের কাছে স্তন্য দানের জন্য অর্পণ করলেন। .... আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে। তিনি বলেছেন, আমি নিজের সন্তান-সন্ততির প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সা.) চেয়ে অধিক দয়ালূ ও স্নেহশীল লোক আর দেখিনি। তিনি বলেছেন, মদীনার আওয়ালী অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইবরাহীম স্তন্য পানের জন্য ধাত্রী মাতার কাছে ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে যেতেন। আমরাও তাঁর সাথে যেতাম। তিনি তার বাড়িতে প্রবেশ করতেন। তিনি সেখানে আগুন জ্বালাতেন। তার স্বামী ছিল কর্মকার। নবী (সা.) তাঁকে (ইবরাহীম) কোলে নিয়ে চুমু খেতেন এবং তারপর ফিরে আসতেন...।[৫০]

পশুচারণ

"মু'আবিয়া ইবনে হাকাম আসসালমী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার একজন দাসী ছিল। সে মদীনার পার্শ্ববর্তী ওহোদ ও জাওয়ানিয়া এলাকায় আমার বকরী চরাতো। একদিন সে আমাকে জানালো যে, হঠাৎ একটি বাঘ এসে তার বকরীর পাল থেকে একটি বকরী নিয়ে গেছে। আমি এমন একজন লোক যে অন্যদের মত শুধু আফসোস করলাম। তবে আমি তার গালে সজোরে একটি চপেটাঘাত করেছিলাম। পরে আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমার এ কাজকে গুরুতর বলে মনে করলেন। আমি বললাম হে আল্লাহ্র রসূল! আমি কি তাকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেবো? তিনি বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে তাঁর কাছে নিয়ে এলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্ কোথায়? সে বললো, আসমানে। তিনি বললেন, আমি কে? সে বললো, আপনি আল্লাহ্র রসূল। তিনি বললেন, সে মুমিন, তাকে মুক্ত করে দাও।"।[৫১]

"সা'দ ইবনে মু'আয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কা'ব ইবনে মালেকের এক দাসী সালা' পর্বতের পাদদেশে বকরী চরাতো। একটি বকরী হঠাৎ করে আহত হলে সে সেটিকে ধরে পাথর দ্বারা যবেহ করলো। এ বিষয়ে নবী (সা.) কে জিজ্ঞেস করলে তিন বললেন? তোমরা তা খেতে পার।"[৫২]

হাফেজ ইবনে হাজার মায়মূনা বর্ণিত হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেছেন যে হাদীসটি তার দাসীকে মুক্ত করে দেয়া সম্পর্কে 'খাস' বা নির্দিষ্ট। নাসায়ীর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তুমি তোমার ভ্রাতৃকন্যার বকরী চরানোর বিনিময়ে কি তা তাকে দিয়ে দাওনি?[৫৩]

চাষাবাদ ও বৃক্ষরোপন

"হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার খালাকে তালাক দেয়া হলে তিনি তার খেজুর বাগান থেকে ফল সংগ্রহের ইচ্ছা করলেন। এতে এক ব্যক্তি তাকে নিষেধ করলো। তখন তিনি নবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে ঘটনা বললে তিনি বললেন, কোন ক্ষতি নেই। তুমি গিয়ে তোমার বাগান থেকে খেজুর সংগ্রহ করো। কারণ তুমি হয়তো তা দান করবে কিংবা তার সাহায্যে কল্যাণকর কোন কাজ করবে।"[৫৪]

Dhaka University Institutional Repository

"জাবের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সা.) উম্মে মুবাশশির আনসারীর খেজুর বাগানে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই খেজুর বাগান কে করেছে, মুসলমান না কাফের? সে বললো, মুসলমান এ খেজুর বাগান তৈরি করেছে। তিনি বললেন, কোন মুসলমান যদি বৃক্ষ রোপন করে কিংবা চাষাবাদ করে ফসল ফলায় আর তা থেকে কোন মানুষ, জীবজন্তু বা অন্য কিছু খেয়ে থাকে তাহলে তা তার জন্য সাদকা বলে গণ্য হয়।"[৫৫]

"আবু হুমাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সা.)-এর সাথে তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তিনি ওয়াদিউল কুরা নামক স্থানে পৌঁছে এক মহিলাকে তার খেজুর বাগানে দেখতে পেলেন। নবী (সা.) তাঁর সাহাবাদের বললেন, তোমরা এই বাগানে খেজুরের পরিমাণ অনুমান করো। রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজে দশ ওয়াসাক পরিমাণ অনুমান করলেন। তিনি বাগানের মালিক মহিলাকে বললেন, বাগানে কি পরিমাণ খেজুর উৎপন্ন হয় তার হিসেব রেখো। আমরা তাবুকে পৌঁছলে তিনি বললেন, আজ রাতে প্রচন্ড বাত্যা প্রবাহিত হবে। কাজেই কেউ যেন রাতের বেলা উঠে না দাঁড়ায় এবং যার সাথে উট আছে সে যেন তা বেঁধে রাখে। তাই আমরা উটগুলো বেঁধে রাখলাম। রাতে প্রচন্ড ঝন্‌ঝা প্রবাহিত হলো। সেই সময় একব্যক্তি উঠে দাঁড়ালে বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে 'তাই' পাহাড়ে নিক্ষেপ করলো। সেই সময় আইলার শাসক নবী (সা.) কে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিলেন। নবী (সা.)ও তার জন্য একখানা চাদর পাঠালেন এবং তাকে ঐ এলাকার শাসক হিসেবে বহাল রেখে ফরমান লিখে দিলেন। ফেরার পথে তিনি ওয়াদিউল কুরায় পৌঁছলে সেই মহিলাকে তার বাগানে উৎপন্ন খেজুরের পরিমাণ জিজ্ঞেস করলেন। সে বললো, দশ ওয়াসাক, যা রসূলুল্লাহ্ (স.) অনুমান করেছিলেন...।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

কুটির শিল্প

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যয়নাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একদা মসজিদে নববীতে ছিলাম। তখন আমি নবী (সা.) কে দেখলাম। তিনি মেয়েদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের অলংকারাদি হলেও দান করো। যয়নব তার স্বামী আবদুল্লাহ্ ও পোষ্য ইয়াতীমদের জন্য ব্যয় করতেন। তিনি (যয়নাব) আবদুল্লাহ্ (ইবনে মাসউদ) কে বললেন, আপনি রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে জিজ্ঞেস করুন আমি আপনার এবং আমার পোষ্য ইয়াতীমদের জন্য যেসব ব্যয় করেছি তা কি দান হিসেবে আমার জন্য গণ্য হবে?"[৫৬]

ইবনে মাজার একটি হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে ঐ মহিলা হস্তশিল্পী ছিলেন। এ ছাড়া তাবাকাতুল কুবরা গ্রন্থে বলা হয়েছে: "আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের স্ত্রী ও তার সন্তানদের মা ছিলেন একজন কারিগর মহিলা। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমি একজন (হস্ত) শিল্পী মহিলা। শিল্পকর্ম বিক্রি করে উপার্জন করে থাকি। এ ছাড়া আমরা, আমার স্বামীর ও আমার সন্তানদের জন্য উপার্জনের আর কোন উপায় নেই। আমি তাদের জন্য ব্যয়ের ব্যাপারেও তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তুমি তাদের জন্য যা ব্যয় করবে সে জন্য পুরস্কার লাভ করবে।"[৫৭]

Dhaka University Institutional Repository

"সা'দ ইবনে সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক মহিলা চতুর্দিকে নকশা করা একখানা 'বুরদাহ' নিয়ে নবী (সা.)-এর কাছে আসলো। সাহল ইবনে সা'দ জিজ্ঞেস করলেন, বুরদাহ কাকে বলে তা কি তোমরা জান? তাকে বলা হলো, হ্যাঁ জানি। নকশা করা পাড় বিশিষ্ট কাপড়। মহিলাটি বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এ কাপড় খানা আমি নিজ হাতে তৈরি করেছি...।"[৫৮]

কুটির শিল্প অন্য একটি পেশাগত কর্ম সম্পর্কে তাবাকাতুল কুবরায় উল্লেখিত আমাদের একটি সরস কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়। সেটিও ছিল এক ধরণের ব্যবসায় যা অনেক সময় গৃহাভ্যন্তরে প্রস্তুত করা হয়। রুবাই' বিনতে মু'আওয়েয ইবনে আফরা থেকে আবু উবায়দা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আম্মার ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন। রুবাই' বিনতে মু'আওয়েয বলেছেন, আমি একদল আনসার মহিলার সাথে উমর ইবনুল খাত্তাবের শাসন যুগে আবু জাহলের মা আসমা বিনতে মাখরাবার কাছে গেলাম। তার পুত্র আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু রাবী'আহ ইয়ামন থেকে তার কাছে আতর পাঠাতো এবং সে তা বিক্রি করতো। আমরা তার নিকট থেকে আতর কিনতাম। আমার শিশিতে আতর ঢালার পরে সে আমার সঙ্গী সাথীদের যেমন ওজন করে দিয়েছিল আমরটাও তেমনি ওজন করে দিয়ে বললো, লিখে দাও, তোমাদের কাছে আমার পাওনা রইলো। আমি বললাম, ঠিক আছে তাকে লিখে দাও যে রুবাই' বিনতে মু'আওয়েযের কাছে তার পাওনা রইলো। সে বললো, রাখো, তুমি তো এমন ব্যাক্তির কন্যা যে তার প্রভুর হত্যাকারী (রুবাই' এর পিতা মুআওয়েয ইবনে আফলা বদর যুদ্ধে আবু জাহলকে হত্যায় অংশগ্রহণ করেছিলেন)। আমি বললাম, না, আমি বরং এমন এক ব্যক্তির কন্যা যিনি তার ক্রীতদাসের হত্যাকারী। তখন সে বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনো তোমার কাছে কোন জিনিস বিক্রি করবো না। জবাবে আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমিও তোমার নিকট থেকে কখনো কোন জিনিস কিনবো না। আল্লাহ্‌র কসম! তোমার আতর মোটেই ভাল নয় এবং তাতে কোন সুগন্ধও নেই। বেটা আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার আতরের মত এত সুন্দর আতর আর কখনো ব্যবহার করিনি। কিন্তু সেদিন আমি ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম।"[৫৯]

পেশাগত কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। এক আনসারী মহিলা রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বলল, আমার একজন কাঠ মিস্ত্রী ক্রীতদাস আছে... অন্য একটি বর্ণনায় আছে। সে তার ক্রীতদাসকে আদেশ করলে সে তারাফা জঙ্গল থেকে কাঠ এনে একটি মিম্বর তৈরি করে দিল...।"[৬০]

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কাজের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট মহিলা সাহাবা উম্মে শারীকের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তিনি মেহমানদের জন্য তার ঘরের দরজা খুলে রাখতেন। প্রথম যুগের মুহাজিরগণ তার বাড়িতে অবস্থান করতেন। এটা মেহমানদের মিলনকেন্দ্র হিসেবে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ কিন্তু স্বেচ্ছামূলক।

অসুস্থদের চিকিৎসা

"আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খন্দকের যুদ্ধে সা'দ আহত হলেন। তাকে কুরাইশের একটি শাখা গোত্র বনী মু'ঈস ইবনে আমের ইবনে লুয়াইয়ের হাব্বান ইবনে আরিকা নামক এক ব্যক্তি দুই বাহুর

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যবর্তী শিরায় তীরবিদ্ধ করেছিল। কাছে রেখে সেবা-শুশ্রুষা করার জন্য নবী (সা.) মসজিদে নববীতে তার জন্য একটি তাঁবু খাটিয়ে দিয়েছিলেন... মসজিদের আঙিনায় বনী গিফার গোত্রের একটি তাঁবু ছিল। তার রক্ত প্রবাহিত হয়ে আসছে দেখে ভীত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে তাঁবুবাসীগণ! তোমাদের দিক থেকে আমাদের এসব কি বয়ে আসছে? তারা জানতে পারে যে, সা'দের জখম থেকে অবিরাম রক্ত ঝরছে। এ আঘাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।" (সহীহ বুখারী)

বনী গিফারের তাঁবু' কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবনে ইসহাকের মতে তাঁবুটি ছিল রুফাইদা আসলামিয়ার। হতে পারে তার স্বামী ছিল গিফার গোত্রের লোক।[৬১] আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে মসজিদের আঙিনায় রুফাইদার তাঁবুতে রেখেছিলেন এজন্য যে রুফাইদা ছিল এমন এক মহিলা যে আহতদের চিকিৎসা করতো। তিনি বলেছিলেন, সা'দকে তার তাঁবুতে রেখে যাও যাতে আমি নিকটে থেকে তার তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যা করতে পারি।"[৬২]

হাফেজ ইবনে হাজার উম্মে আতিয়া কর্তৃক বর্ণিত হাদীস: "আমরা অসুস্থদের পরিচর্যা করতাম এবং আহতদের চিকিৎসা করতাম" এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ হাদীসের কয়েকটি শিক্ষণীয় দিক রয়েছে, অর্থাৎ নারী কর্তৃক পরোক্ষভাবে অন্য পুরুষের চিকিৎসা ও পরিচর্যা করার বৈধতা এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। তবে ফিতনার আশংকা না থাকলে প্রয়োজনে প্রত্যক্ষভাবেও তা করা বৈধ।"[৬৩]

সশস্ত্র বাহিনীর জন্য সেবা পেশ করা

"রুবাই' (মহিলা সাহাবী) বিনতে মু'আওয়েয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম। আমরা লোকজনকে পানি পান করাতাম, তাদের সেবা করতাম এবং আহত ও নিহতদের মদীনায় পাঠিয়ে দিতাম।"[৬৪]

"উম্মে আতিয়া আনসারিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আমি পেছনে তাঁবুর পাহারায় থাকতাম এবং সবার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতাম।"[৬৫]

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ

সামাজিক তৎপরতায় নারীর অংশগ্রহণ শীর্ষক আলোচনায় মুসলিম নারীর স্বেচ্ছামূলকভাবে মসজিদে নববীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে এ কাজ করার অনুমতি থাকার বিপরীতে নারী কর্তৃক স্বেচ্ছামূলকভাবেও এ কাজ করার অনুমতি রয়েছে। এ বিষয়টি আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

গৃহকর্ম

"উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত।..... তিনি দাসীটিকে তাঁর অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে পাঠালেন। আমি বললাম, তাঁর (নবী) পাশে দাঁড়িয়ে বলবে, হে আল্লাহ্র রসূল! উম্মে সালাম আপনাকে জিজ্ঞেস

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন যে, আমি শুনেছি, আপনি এই দুই রাকাত নামায পড়তে নিষেধ করে থাকেন। অথচ দেখছি আপনি নিজেই তা পড়ছেন--- ক্রীতদাসটি তাই করলো।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

"উম্মে সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সা.) তার (উম্মে সালামার) ঘরে একজন দাসী দেখলেন যার চেহারা রোদে পোড়া মত ছিল। তিনি বললেন, তাকে ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থা করো। কারণ সে বদ নজরের শিকার হয়েছে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

"আসমা বিনতে আবু বকর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে সময় যুবায়ের আমাকে বিয়ে করেন তখন পানি উত্তোলনকারী একটি উট ও ঘোড়া ছাড়া তার না ছিল কোন ধন-সম্পদ, না ছিল দাস-দাসী। আমিই তার ঘোড়াকে খাওয়াতাম, পানি পান করাতাম, চর্মনির্মিত পানির বড় বালতি সেলাই করতাম এবং আটার খামির তৈরি করতাম আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে জায়গীর হিসেবে যে ভূমি দান করেছিলেন সেই ভূমি থেকে মাথায় করে খেজুরের আঁটি বহন করে আনতাম। উক্ত ভূমি খন্ডটি দুই তৃতীয়াংশ ফারসাখ দূরে অবস্থিত ছিল.. অবশেষে আবু বকর (আসমার পিতা) আমার জন্য একজন খাদেম পাঠালেন। সেই তখন থেকে ঘোড়ার রাখালি করতো। তিনি যেন এভাবে আমাকে মুক্ত করলেন।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

"আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সুফফার অধিবাসীগণ সবাই ছিলেন দরিদ্র মানুষ। তাই নবী (সা.) বললেন, যার কাছে দুজনের খাদ্য আছে সে যেন তৃতীয় একজনকে (আসহাবে সুফ্ফার মধ্যে থেকে) নিয়ে যায় এবং চারজনের খাদ্য থাকলে পঞ্চম বা ষষ্ঠ জনকে নিয়ে যায়। ফলে আবু বকর তিন জনকে নিয়ে আসলেন এবং নবী (সা.) দশজনকে নিয়ে গেলেন। আবদুর রহমান বলেন। আমাদের সংসারে আমি, আমার পিতা (আবু বকর) ও আমার মা ছিলেন। (হাদীসের বর্ণনাকারী) আবু উসমান বলেন, আমি জানিনা তিনি (আবদুর রহমান) একথাও বলেছিলেন কিনা যে, আমার স্ত্রী এবং একজন খাদেমও ছিল যে আমার ও আবু বকর উভয়ের গৃহে কাজ করতো।" (সাহীহ বুখারী ও মুসলিম)

"মু'আবিয়া ইবনে সুওয়াইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমাদের একজন ক্রীতদাসকে চপেটাঘাত করে বাড়ি থেকে চলে গেলাম। তারপর যোহরের কিছু পূর্বে ফিরে এসে আমার পিতার ইমামতিতে নামায পড়লাম। তিনি ঐ ক্রীতদাস ও আমাকে ডেকে নিয়ে তাকে বললেন, ওর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো। কিন্তু সে আমাকে ক্ষমা করে দিল। তিনি (মুআবিয়া ইবনে সুওয়াইদ) আরো বললেন, আমরা বনী মাকরান গোত্রের লোক। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে আমাদের একজনমাত্র দাসী ছিল। আমাদের কেউ তাকে চপেটাঘাত করলে বিষয়টি নবী (সা.) জানতে পারলেন। তিনি বললেন, তাকে (দাসীটিকে) আযাদ করে দাও। সবাই বললো। সে ছাড়া আমাদের আর কোন দাসী (খাদেম) নেই। নবী (সা.) বললেন, তারা তার খেদমত গ্রহণ করতে থাক। যখনই তাকে ছাড়া চলার মত পরিস্থিতি হবে তখনই যেন তারা তাকে আযাদ করে দেয়।" (সহীহ মুসলিম)

নারীর পেশাগত কাজের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় আধুনিক সামাজিক দিক

এক. নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষার সার্বজনীনতার সাথে সাথে শিক্ষার উন্নতি-অগ্রগতি, বহুমুখিতা ও বিভিন্ন পর্যায়ে বিন্যস্ত হওয়া- যার ফল হচ্ছে কতিপয় পেশাগত কাজে নারীর যথাযথ মূল্যায়ন।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. রোগীর শুশ্রুষা ও পরিচর্যা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও তার বহুমুখিতা এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এর সার্বজনীনতার বিষয়টি পূর্বোক্ত বিষয়টির সাথে যুক্ত হয়ে এমন এক সামাজিক প্রয়োজন সৃষ্টি করেছে যে কারণে সমাজ কোন কোন ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে শিক্ষা, চিকিৎসা ও নার্সিং পেশায় নারীর স্পেশালাইজেশন দাবী করে।

তিন. যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার অগ্রগতি। বিশেষ করে বিমান পরিবহন ব্যবস্থা এমন সব এয়ার হোস্টেসের প্রয়োজন অনুভব করে যারা প্রয়োজনের মুহূর্তে মহিলা বিমানযাত্রীদেরকে বিশেষ প্রকৃতির সেবা প্রদান করতে সক্ষম।

চার. গৃহকর্মে ব্যবহৃত নানা রকম তৈজসপত্র এবং মেয়েদের রকমারি পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত ও দক্ষ মহিলাকর্মী প্রয়োজন।

পাঁচ. একজন পুরুষের যৌন পরিপক্কতার স্তরে উপনীত হওয়া এবং বিবাহযোগ্য আর্থিক সংগতি লাভের মাঝে সময়গত ব্যবধান অনেক বেশী। এই দিকটি যুবকদের জন্য মারাত্মক ক্ষতি ও মানসিক যন্ত্রণার কারণ। ফলে যুবকরা পেশাগত কাজের মাধ্যমে স্ত্রীর অর্জিত অর্থের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং এভাবে উভয়ে সম্মিলিতভাবে অতি দ্রুত একটি পরিবারের ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

ছয়. পূর্বের যে সব বৃহৎ পরিবার একত্রে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একই বাড়িতে বাস করতো এবং ছেলে ও মেয়েদের অনেককে বিয়ে দেওয়ার পরও ঐক্যবদ্ধ ছিল সেই সব পরিবার ভেঙ্গে স্বতন্ত্র ছোট ছোট পরিবার অস্তিত্ব লাভ করেছে। এসব আধুনিক ছোট পরিবার গঠনের জন্য পুরুষ বড় রকমের আয়ের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। ফলে অপরপক্ষ থেকে আর্থিক সহযোগিতা একান্ত জরুরী হয়ে দেখা দেয়। অধিকন্তু সামাজিক জটিলতার সাথে সাথে এই দিকটি নারীর অভিভাবকের, সে পিতা হোক বা ভাই, আর্থিক সামর্থ্য বহুলাংশে দুর্বল করে দেয়। কেননা নারী যখন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে আসে অথবা বিধবা হয় তখন অভিভাবককেই তার জীবন যাত্রায় ব্যয় মেটাতে হয়। ফলে সে উপার্জনের জন্য কাজ করতে বাধ্য হয়।

সাত. জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ার কারণে কোন মুসলিম সমাজে আয়ের স্ট্যান্ডার্ড নিম্নগামী হয়েছে। এই অবস্থার সাথে পূর্ব বর্ণিত দুটি প্রেক্ষিত যুক্ত হওয়ায় পরিবারের ভিত্তি স্থাপনের ব্যাপারে যুবকগণ নারীর আর্থিক সহযোগিতা লাভের জন্য তাদের পেশাগত কর্মের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে।

আট. শিল্প হোক ব্যবসায় কিংবা শিক্ষা বা চিকিৎসা জীবনের সকল ক্ষেত্রে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানসমূহের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনুরূপ সকল ধরণের সেবার ক্ষেত্রে একই অবস্থা বিরাজমান। অথচ পূর্বে এমন অবস্থা ছিল না। তখন অনেক পেশাগত কাজ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ওপর নির্ভরশীল ছিল। কোন কোনটি যেমন সুতাকাটা, বস্ত্র বয়ন অথবা বিভিন্ন প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করা কিংবা চামড়া পাকা করা এবং শিক্ষা ও চিকিৎসা গৃহাভ্যন্তরেই সম্পন্ন হতো। ফলে পেশাগত কাজ করতে গিয়ে নারীর গৃহত্যাগ করতে হতো না। পূর্বে যখন

Dhaka University Institutional Repository

গৃহের অভ্যন্তরেই এসব কাজ সম্পন্ন হতো তখন নারী তার পেশাগত কাজ এবং গৃহের তত্ত্বাবধান ও শিশুপালন একই সাথে আঞ্জাম দিতে পারতো। কিন্তু বর্তমানে তা আর সম্ভব নয়।

নয়. নারীর এই অবস্থা এবং তার সর্বপ্রথম দায়িত্ব ঘরকন্নার কাজের প্রতি লক্ষ্য করলে বর্তমান সময়ে নিম্নোক্ত কারণে সমাজ পেশাগত কাজে যোগ্য নারীর সংখ্যা আরো অধিক বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে:

ক) কিছুসংখ্যক নারী নির্দিষ্ট সময়ের অর্ধেক সময় কাজ করবে।

খ) সন্তান প্রসব ও সন্তান পালনের জন্য কিছু সংখ্যক নারীকে দীর্ঘ ছুটি দিতে হবে।

গ) গৃহ পরিবেশ ও গৃহকর্মের চাপের কারণে কিছু সংখ্যক নারীকে পেশাগত কাজের বাইরে রাখতে হবে।[৬৬]

শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনাসমূহ

প্রথম দিক নির্দেশনা

নারীকে পর্যাপ্ত উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া উচিত যাতে ইসলামী প্রশিক্ষণের সাধারণ লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্জিত হয়। প্রথম বিষয়টি হলো, নরী যেন সর্বোত্তমরূপে গৃহ ও সন্তানাদির তত্ত্বধানে সক্ষম হয় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণীর তাৎপর্য অনুসারে বিয়ের পর তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের যোগ্য হয়ে গড়ে ওঠে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: المرأة راعية على أهل بيت زوجها وهي مسؤلة عنهم "নারী তার স্বামীর পরিবারের সবার তত্ত্বাবধায়িকা। সেই তাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।"[৬৭]

আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, উপযুক্ত পেশাগত কাজের জন্য নারীকে দক্ষ করে গড়ে তোলা, যাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা সামাজিক যে কোন প্রয়োজনের মুহূর্তে তার যথাযথ বেসা গ্রহণ করা যায়।

"আবূ বুরদাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, যে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, কোন ব্যক্তির যদি কোন দাসী থাকে আর সে তাকে অতি উত্তমরূপে শিক্ষা দান করে এবং শিষ্টাচার ও ভদ্রতা শেখায় এবং তারপর দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করে তাহলে সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে।" (সহীহ বুখারী)

দাসীকে শিক্ষাদান ও শিষ্ট করে গড়ে তোলার মাহাত্ম্য যখন এই তখন নিজের কন্যাকে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা নিঃসন্দেহে মহোত্তম।

"হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক মহিলা আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে আসলো। তার সাথে ছিল তার দুটি শিশু কন্যা সে আমার কাছে কিছু চাইলো। কিন্তু আমার কাছ থেকে একটিমাত্র খেজুর ছাড়া আর কিছুই পেলো না। আমি তাকে খেজুরটি দিলে সে তা দুই ভাগ করে তার দুই মেয়েকে দিল এবং উঠে চলে গেল। তারপর নবী (সা.) আসলে আমি তাঁকে ঘটনাটি বললাম। তিনি বললেন, এ ধরণের কন্যা সন্তান দিয়ে যাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে সে যদি তাদের প্রতি দয়ার্দ্র আচরণ করে তাহলে তারা তার জন্য দোযখের আগুন থেকে রক্ষার অন্তরাল হয়ে যাবে।" (সাহীহ বুখারী)

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার মেয়েদের প্রতি ইহসান সম্পর্কিত বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণিত কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে: (..... তাদের জন্য অর্থ ব্যয় করলো, বিয়ে দিল এবং উত্তমরূপে শিষ্টাচার শিক্ষা দিল.....)। (তাদের সাথে উত্তম আচরণ করলো এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করলো.....)। (তাদেরকে শিষ্টাচার ও ভদ্রোচিত রীতিনীতি শিক্ষা দিল, তাদের প্রতি দয়া ও স্নেহের আচরণ করলো এবং তাদের ভরণপোষণ করলো) এসব বর্ণনার পর হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, 'ইহসান' শব্দটি এসব গুণাবলীর সর্ম্মিলিত অর্থ প্রকাশ করে। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে সংক্ষেপে 'ইহসান' শব্দ দ্বারা এই অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে।[৬৮]

এখানে আমরা দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই

প্রথম বিষয়টি হচ্ছে, হাদীসটিতে উল্লেখিত "ইহসান" শব্দটি আমাদের দিক নির্দেশনা দেয় যে, কন্যা সন্তানের প্রতি ইহসানের অর্থ হলো তাকে সুন্দর ও দৃঢ় নৈতিক চরিত্র গঠনে এবং কল্যাণকর জ্ঞানার্জনে সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা, যদিও নৈতিক চরিত্রের রয়েছে স্থায়িত্বের বৈশিষ্ট্য। কল্যাণকর জ্ঞানের প্রকৃতি ও মূল্যবান স্থান ও কালভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে মেয়েদেরকে সক্ষম করে তুলতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত মহিলা আরো কত অধিক সম্মানের পাত্রী হতো যদি সে মানুষের কাছে ভিক্ষা না করে কিংবা যে সাদকাকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) "মানুষের ময়লা বলে" উল্লেখ করেছেন তা দ্বারা লালন-পালন করার পরিবর্তে কোন কাজ করতে সক্ষম হতো এবং নিজের ও তার দুই কন্যা সন্তানের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হালাল রুজি থেকে করতে পারতো।

ইতিপূর্বে ভূমিকাতেই আমরা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি যে, তালাকপ্রাপ্তি বা বিধবা হওয়ার ক্ষেত্রে নারীর নিজের এবং নিজের সন্তান-সনন্ততির ভরণ-পোষণের জন্য অভিভাবকের সামর্থের ওপর বর্তমান সময়ে জোর দেয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ইবনে আবেদীন অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন: পিতার কর্তব্য হচ্ছে কন্যাকে এমন কোন নারীর তত্ত্বাবধানে দেয় যে তাকে সূক্ষ্ম সূচিকর্ম ও সেলাইয়ের কাজ শেখাতে পারবে।[৬৯] এভাবে প্রয়োজনে সে যেন নিজেই নিজের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহ করতে সক্ষম হয়। এখানে আমরা যেসব বিষয় উল্লেখ করলাম তা সবই হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসের ইহসান শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষা পদ্ধতিতে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমরা প্রস্তাব করছি। উক্ত তিনটি বিষয়ের প্রথমটি হচ্ছে, কোন একটি পেশাগত কাজের জন্য তাত্ত্বিক শিক্ষাদান। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কিছুটা উন্নত মানের প্রশিক্ষণের তাগিদসহ পেশাগত বিষয়ে বাস্তব শিক্ষাদান। পেশাগত কাজের বাস্তব অনুশীলনের পূর্বেই যদি বিয়ে হয়ে যায় তাহলে প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত পুনঃপ্রশিক্ষণের পর সে যেন সন্তোষজনকভাবে তার পেশাগত দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে। তৃতীয়টি হচ্ছে, মহিলাদের পেশাগত কাজের সাথে সম্পর্কিত শরীয় বিধানসমূহ শিক্ষা দেয়া। এগুলো সবই হবে মূল শিক্ষার অতিরিক্ত।[৭০]

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় দিকনির্দেশনা

নারীর কর্তব্য সময়কে পূর্ণরূপে ব্যবহার করে সমাজের জন্য উৎপাদক ও কল্যাণকর উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং যৌবন, প্রৌঢ়তা ও বার্ধক্য কোন পর্যায়ে এবং কন্যা, স্ত্রী, তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা কোন অবস্থাতেই কর্মহীনা ও বেকার না থাকা। গৃহকর্ম সম্পাদনের পর যে বাড়তি সময় থাকবে তা পেশাগত বা অপেশাগত কোন কল্যাণপ্রসূ কাজে ব্যয় করবে।

মহান আল্লাহ বলেন: "পুরুষ বা নারী যে-ই ভাল কাজ করবে, সে যদি মুমিন হয়, তাহলে তাকে আমি দুনিয়ায় পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবন দান করবো এবং আখেরাতে প্রতিদান দেবো তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুসারে।"[৭১]

মানুষ যে নারী হোক বা পুরুষ, কিয়ামতের দিন তার সৎ কাজের প্রতিদান সম্পর্কে আয়াতটিতে কত উত্তম কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি হাদীসে বিস্তারিতভাবে যা বলা হয়েছে তা আমাদের আয়ুষ্কালকে উত্তমরূপে কাজে লাগানোর দিক নির্দেশনা দান করে এবং অন্যায় ও অনর্থক কাজে আমাদের জীবনকাল ব্যয় ও নষ্ট করা সম্পর্কে আমাদেরকে হুশিয়ার করে দেয়। অর্থাৎ আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কিভাবে ব্যয় করছি আমাদের অচিরেই তার হিসাব দিতে হবে, যেমন আমাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাল বা মন্দ কাজেরও হিসাব দিতে হবে।

হযরত আবু বারযা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, বান্দা তার আয়ুষ্কাল কিভাবে ব্যয় করেছে, অর্জিত জ্ঞান অনুসারে কি কাজ করেছে, অর্থ-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে ও কি কাজে ব্যয় করেছে এবং দেহটাকে কি কাজে নিয়োজিত রেখেছে সে সম্পর্কি প্রশ্নের মুখোমুখি হবার আগে তার পা দুটি সরিয়ে নিতে পারবে না।"[৭২]

তৃতীয় দিক নির্দেশনা

স্বামী তার স্ত্রীর ব্যয় নির্বাহের জন্য দায়ী। এটা তার জন্য ওয়াজিব। তাই তার কর্তব্য স্ত্রীকে খোরপোশ ও জীবন যাপনের ব্যয় নির্বাহ থেকে মুক্ত রাখা। অনুরূপ পিতা তার কন্যার ব্যয় নির্বাহের জন্য দায়ী। স্বামী এবং পিতা যদি মৃত্যু মুখে পতিত হয় অথবা অক্ষম হয় এবং স্ত্রী বা কন্যার আর্থিক প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম কাউকে রেখে না যায় তাহলে রাষ্ট্র সে দায়িত্ব পালন করবে।

ব্যয় নির্বাহে স্বামীর কর্তব্য

মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: "পুরুষ নারীর জন্য ব্যবস্থাপক। কারণ আল্লাহ্ তাদের একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদা দান করেছেন এবং এজন্য যে পুরুষ নারীর জন্য অর্থ ব্যয় করে।"[৭৩]

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তাদের (স্ত্রীদেরকে) খাদ্য ও বস্ত্র উত্তমরূপে দেয়া তোমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।"[৭৪]

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। হিন্দ বিনতে 'উতবা এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ স্বভাবের লোক। আমার ও আমার সন্তানদের প্রয়োজনীয় ব্যয় সে নির্বাহ করে না। তবে আমি তার অগোচরে তার সম্পদ থেকে নিয়ে সে অভাব পূরণ করি। তিনি বলেন, যুক্তিসংগতভাবে তোমার ও তোমার সন্তানের প্রয়োজন মত নিতে পারো।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, নিজের পরিবার থেকে (ব্যয়) শুরু কর। এটা কি ভাল কথা যে স্ত্রী বলবে, হয় আমাকে খাবার দাও নতুবা তালাক দাও.. সন্তান বলবে, আমাকে খাবার না দিয়ে কার জন্য পরিত্যাগ করছো? (সহীহ বুখারী)

সন্তান বলবে, আমাকে খাবার না দিয়ে কার জন্য পরিত্যাগ করছো? এ কথার ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ... সন্তানদের মধ্যে যার বা যাদের অর্থ সম্পদ আছে কিংবা ব্যবসায়-বাণিজ্য আছে তাদের ভরণ-পোষণ করা যে পিতার দায়িত্ব নয় মনীষীগণ এটিকে তার প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। কেননা যে সন্তান বলে যে, আমাকে কার জন্য পরিত্যাগ করছো, তার অবস্থাই এমন বলে প্রতীয়মান হয় যার পিতার পক্ষ থেকে ভরণ-পোষণ লাভ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আর যার কোন ব্যবসায়-বাণিজ্য বা পেশা আছে বা অর্থ-সম্পদ আছে সে এরূপ কথা বলতে পারে না।

খায়রুর রামালী বলেছেনে, মেয়েরা যদি সূচীকর্ম বা সূতাকাটার মত কাজের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় তাহলে নিজ উপার্জন থেকেই জীবন-যাপনের ব্যয় নির্বাহ করবে।[৭৫]

ব্যয় নির্বাহে রাষ্ট্রের দায়িত্ব

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমি মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও নির্ভরযোগ্য। মুমিনদের কেউ ঋণগ্রস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করলে তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর কেউ সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করলে তা তার ওয়ারিশদের জন্য। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে। আর কেউ অভাবী সন্তান রেখে গেলে তার দায়িত্ব আমার। (সহীহ বুখারী)

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, হাদীস সংকলক (ইমাম বুখারী) হাদীসটিকে নাফাকাত অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করে এ বিষয়ের প্রতি ইংগিত দিতে চেয়েছেন যে, সন্তান-সন্ততি রেখে যে ব্যক্তি মারা গেল কিন্তু কোন সম্পদ রেখে গেল না, মুসলমানদেরকে বায়তুল মাল থেকে সেসব সন্তানদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব।[৭৬]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রত্যেকেই নিজের অধীনস্তদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। মানুষের ওপর যিনি শাসক নিযুক্ত হয়েছেন তিনিও একজন তত্ত্বাবধায়ক। ফলে তিনিও তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবেন।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা আসলাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর সাথে বাজারে গেলাম। এক যুবতী মহিলা উমরের কাছে এসে বললো, হে আমীরুল

Dhaka University Institutional Repository

মুমিনীন! আমার স্বামী ছোট ছোট সন্তানাদি রেখে মৃত্যু বরণ করেছেন আল্লাহ্‌র শপথ! তাদের না আছে খাদ্য, না আছে ক্ষেত-খামার কিংবা দুধের পশু। উমর তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকলেন, স্থান ত্যাগ করলেন না। তারপর তিনি (বায়তুল মালের) আস্তাবলে বাঁধা একটি শক্তিশালী উটের কাছে গেলেন এবং খাদ্য ভর্তি দুটি বস্তা তার পিঠে চাপিয়ে তার মাঝে কিছু নগদ অর্থও কাপড়-চোপড় রেখে তার লাগাম মহিলার হাতে দিয়ে বললেন, এটি চালিয়ে নিয়ে যাও। এগুলো শেষ না হতেই আল্লাহ্ তোমাদেরকে কল্যাণ দান করবেন।[৭৭]

চতুর্থ দিক নির্দেশনা

পুরুষ পরিবারের ব্যবস্থাপক ও প্রধান। তাই পেশাগত কাজের জন্য স্ত্রী বা কন্যার তার নিকট অনুমতি গ্রহণ প্রয়োজন। মহান আল্লাহ্ বলেন: "পুরুষ নারীর ব্যবস্থাপক।"[৭৮] হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, পুরুষ তার পরিবারে লোকদের তত্ত্বাবধায়ক সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এ কথা সবারই জানা যে, শরীয়ত এবং প্রথাগত বিধান উভয়ই পুরুষকে পরিবারের নেতৃত্ব এবং পেশাগত কাজে স্ত্রী বা কন্যাকে অনুমতি দানের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করেছে। তাই শরয়ী কোন বিধান বা বৈধতা ছাড়া সে নারীর বা সমাজের জন্য কল্যাণকর কোন কাজে স্বেচ্ছাচারিতামূলকভাবে বাধা দিতে পারে না, যেমন পারে না বিনা প্রয়োজনে বৃত্তিমূলক কোন কাজ গ্রহণে বাধ্য করতে।

পঞ্চম দিক নির্দেশনা

মুসলিম নারীর নিজের পবিত্রতা রক্ষা এবং পবিত্র ও চরিত্রবান সমাজ গঠনের জন্য অবিলম্বে বিয়ে করা বৈধ অথবা অত্যাবশ্যক। এভাবে পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে মুসলিম সমাজের সদস্যরা নিয়মিত হিসেবে সুন্দর মানসিক ও উত্তম নৈতিক চরিত্রগত স্বাস্থ্য লাভ করতে পারে। পেশাগত কাজ যদি নারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত রাখার কিংবা বিনা প্রয়োজনে বিলম্বিত বিবাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তা নারীর জন্য মাকরূহ বা হারাম বলে গণ্য হবে। অপরদিকে কোন পেশাগত কাজ যদি তার বিবাহ সম্পাদনে সহায়ক হয় তাহলে সেটা হবে তার জন্য বৈধ কাজ।

হযরত আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ কসম! তোমাদের মধ্যে আমি আল্লাহকে অধিক ভয় করি এবং অধিক তাকওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু আমি কখনো রোযা রাখি আবার কখনো রাখি না, আমি (রাত জেগে) নামায পড়ি আবার ঘুমাই এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। এসবই আমার সুন্নাত (রীতিনীতি)। যারা আমার সুন্নাতকে পরিত্যাগ করে তারা আমার নয়।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা যুবকেরা নবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। আমাদের কিছুই ছিল না। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, হে যুব সমাজ! যাদের বিয়ে করার সামর্থ রয়েছে তাদের বিয়ে করা উচিত। কারণ তা দৃষ্টি আনতকারী এবং গুপ্তাংগের হিফাজতকারী।"[৭৯]

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ে সহজীকরণের জন্য শরীয়ত প্রণেতার দেয়া এ পদ্ধতি গ্রহণ করে আমরা বলতে চাই যে, নারীর বিয়ের জন্য তার পেশাগত কাজ যদি সহায়ক হয় তাহলে তা করারা নারীর জন্য উত্তম। বিশেষ করে যখন বিবাহে উৎসাহী পুরুষদের অধিকাংশের আয় পরিবার পালনের মানের নীচে যায়। বরং এই মানদূর তখন উত্তর ওয়াজিবের পর্যায়ে উন্নীত হয় যখন মেয়ে পক্ষ তাদের মেয়ের বিয়ে সহজলভ্য হওয়ার জন্য এর তাগিদ অনুভব করে। এটি ফিকহের এই মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ- ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب অর্থাৎ যার সাহায্য ছাড়া ওয়াজিব সম্পাদন সম্ভব নয় তা ওয়াজিব। উলামায়ে কিরাম ইজতিহাদ অনুসারে যার সতীত্ব ও চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য বিয়ে দরকার তার জন্য বিয়ে ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যক। নারী-পুরুষ ভেদে সব যুবক-যুবতীর জন্য এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। বিশেষ করে আমাদের যুগে যখন এ বিষয়ে উত্তেজনা ও ফিতনা সৃষ্টিকারী বহু উপাদান বর্তমান তখন কোন প্রশ্নই আসে না।[৮০]

ষষ্ঠ দিক নির্দেশনা

পরিবারের আর্থিক সামর্থ ও সমাজের প্রয়োজনের গণ্ডির মধ্যে মুসলিম নারী সন্তান উৎপাদনে উৎসাহী হবে। পেশাগত কাজ তাকে এ দায়িত্ব থেকে বিরত রাখুক তা মোটেই সমীচীন নয়।

মহান আল্লাহ্ বলেন, "আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের স্বজাতীয় স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তোমাদের এ স্ত্রীদের থেকে পুত্র ও নাতি-নাতনী দান করেছেন।"[৮১]

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, হে জাবের, সন্তান কামনা করো, সন্তান কামনা করো!" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে: "আয়াদ বলেছেন, ইমাম বুখারী প্রমুখ হাদীস বিশারদগণ "আল কায়েস" অর্থ সন্তান কামনা বলে উল্লেখ করেছেন। এটি বিশুদ্ধ মত। 'সুহেবুল আফআল' বলেছেন, كاس الرجل في عمله কথাটির অর্থ লোকটি বুদ্ধিমান। কায়সী বলেছেন, كاس الرجل কথাটির অর্থ লোকটি সন্তান লাভ করেছে।[৮২]

রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের সন্তানদের কামনায় উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা অধিক স্নেহশীলা ও সন্তান উৎপাদনকারী মহিলাকে বিয়ে করো। আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্যে গর্ব করবো।"[৮৩]

সপ্তম দিক নির্দেশনা

নারী তার ঘর ও সন্তানাদির উত্তমরূপে দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়ী। বিবাহিতা নারীর জন্য এটি প্রাথমিক মৌলিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য পেশাগত কাজ পরিত্যাগ করা সংগত নয়।

মহান আল্লাহ্ বলেন, "তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে এ বিষয়টি যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের জাতি থেকে সৃষ্টি করেছেন স্ত্রীগণকে, যাতে তোমরা তার কাছে প্রশান্তি লাভ করো এবং তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।"[৮৪]

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানের তত্ত্বাবধায়ক। সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, উটের পিঠে আরোহণকারিণী আরব মহিলাদের মধ্যে কুরাইশ মহিলারাই উত্তম, যারা নিজেদের ছোট ছোট বাচ্চার প্রতি অধিকতর স্নেহশীলা ও স্বামীর সম্পদের হিফাজতকারিনী।" (সহীহ বুখারী) সহানুভূতি ছাড়াও নিজের শান্ত-নিরিবিলি সুন্দর কূটীরে নারী, পুরুষ ও শিশু সবারই শান্তি, স্বস্তি ও প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ লাভের পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

অষ্টম দিক নির্দেশনা

দুটি অবস্থায় পেশাগত কাজ করা নারীর জন্য অত্যাবশ্যক। এক, পরিবারের জন্য উপার্জনশীল ব্যক্তির (পিতা, স্বামী অথবা রাষ্ট্র) অবর্তমানে বা তার অক্ষমতার কারণে নিজের ও পরিবারের জীবিকার জন্য। দুই, মুসলিম সমাজের কাঠামো ও সংহতি সংরক্ষণের নিমিত্ত নারীদের জন্য ফরযে কিফায়া পর্যায়ভুক্ত কাজসমূহ আদায় করার সময়। এ অবস্থায় পরিবার ও সন্তান সন্ততির প্রতি দায়িত্ব বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এসব অত্যাবশ্যকীয় কাজ যথাসম্ভব আঞ্জাম দেয়ার জন্য নারী চেষ্টা করবে।

প্রথমত নিজের ও সন্তান-সন্ততির জীবিকার জন্য নারীর প্রয়োজন

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার খালাকে তালাক দেয়া হলে তিনি তার বাসস্থান থেকে খেজুর আহরণে মনস্থ করলেন। এতে এক ব্যক্তি তাকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করলে তিনি নবী (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, নবী (সা.) বললেন, তুমি বাগান থেকে খেজুর আহরণ করো।[৮৫]

"হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক মহিলা আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে আসলো। তার সাথে ছিল তার দুটি শিশু কন্যা সে আমার কাছে কিছু চাইলো। কিন্তু আমার কাছ থেকে একটিমাত্র খেজুর ছাড়া আর কিছুই পেলো না। আমি তাকে খেজুরটি দিলে সে তা দুই ভাগ করে তার দুই মেয়েকে দিল এবং উঠে চলে গেল। তারপর নবী (সা.) আসলে আমি তাঁকে ঘটনাটি বললাম। তিনি বললেন, এ ধরণের কন্যা সন্তান দিয়ে যাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে সে যদি তাদের প্রতি সদয় আচরণ করে তাহলে তারা তার জন্য দোযখের আগুন থেকে রক্ষার অন্তরাল হয়ে যাবে।"[৮৬]

প্রথম দিক নির্দেশনায় যে কথাটি আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি এখানে তার পুনরুল্লেখ করতে চাই: হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত মহিলার বিষয়টি কত মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক হতো এবং দুই কন্যার প্রতি তার ইহসান কত বড় হতো যদি সে নিজে কাজ করতে সক্ষম হতো এবং যে সাদকা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "তা হচ্ছে মানুষের ময়লা,"[৮৭] সেই সাদকা খেয়ে জীবন ধারণ বা ভিক্ষা করে জীবন ধারণের পরিবর্তে যদি নিজের পবিত্র ও হালাল উপার্জন দ্বারা নিজের ও দুই কন্যার খাবার সংস্থান করতে সক্ষম হতো।

Dhaka University Institutional Repository

নবম দিক নির্দেশনা

পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার শর্তে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে পেশাগত কাজ নারীর জন্য 'মানদূব'। (ক) দরিদ্র স্বামী, পিতা বা ভাইকে সাহায্য করা, (খ) মুসলিম সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ করা, (গ) কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা।

(ক) দরিদ্র স্বামী, পিতা বা ভাইকে সাহায্য করা

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর স্ত্রী যয়নাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "বেলাল আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি নবী (সা.) কে জিজ্ঞেস করুন, আমি আমার স্বামী ও আমর কোলের ইয়াতীম শিশুদের জন্য যে সাদকা (ব্যয়) করছি তা কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে? আমরা তাকে এ কথা বললাম যে, নবী (সা.) কে আমাদের নাম বলবেন না। তখন বেলাল নবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, মহিলা দুজন কে? তিনি (বেলাল) বললেন, যয়নাব। নবী (সা.) জিজ্ঞেস করলেন কোন যয়নাব? তিনি বললেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের স্ত্রী। তখন নবী (সা.) বললেন, হ্যাঁ, সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে। আত্মীয়তার (অধিকার রক্ষার) পুরস্কার ও দান করার পুরস্কার। অন্য একটি রেওয়াতে আছে: তুমি যে দান করবে তোমার স্বামী ও সন্তানই তা পাওয়ার অধিক হকদার।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

(খ) মুসলিম সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ করা

এর উদাহরণ সেই সব মহিলা যাদেরকে আল্লাহ্ সবিশেষ প্রতিভা, যোগ্যতা ও ক্ষমতা দান করেছেন। যেমন চমৎকার বাকপটুতার অধিকারী মেয়েদের উন্নত মানের উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা এবং মর্মস্পর্শী কথা। অথবা তাদের আবেগময় সূক্ষ্ম বচনশৈলী ও জ্ঞানপূর্ণ বক্তব্য। অথবা তাদের বুদ্ধিদীপ্ত মেধা যা বিমুগ্ধ করতে সক্ষম এবং নতুন নতুন কল্যাণকর বিষয় উদ্ভাবনে দক্ষ। এসব মেয়েদের সহজাত অতুলনীয় মেধা ও যোগ্যতার পরিচর্যা প্রয়োজন, যাতে তারা ঐ সবের যথোপযুক্ত ব্যবহারে সক্ষম হয়। ঐ সব সহজাত মেধা ও যোগ্যতা মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে অনেক পুরুষের চেয়েও অধিক সুফল বয়ে আনে।

(গ) কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আমাদের মধ্যে দীর্ঘ হাতের অধিকারিনী ছিলেন যয়নাব বিনতে জাহাশ। কারণ তিনি নিজ হাতে কাজ করে উপার্জন করতেন এবং দান করতেন।" (সহীহ মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, দীনের ব্যাপারে যয়নাব বিনতে জাহশ এর চাইতে উত্তম কোন নারী আমি দেখিনি। তিনি সর্বাধিক খোদাভীরু, সত্যবাক, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারিনী ও সাদকা দাতা ছিলেন এবং নিজেকে অধিক মাত্রায় এমন কাজে নিয়োজিত রাখতেন যার উপার্জন থেকে দান করতেন এবং তার সাহায্যে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে প্রয়াসী থাকতেন। (সহীহ মুসলিম)

Dhaka University Institutional Repository

দশম দিক নির্দেশনা

পেশাগত কাজের চাপ বেশী থাকলে ঘর কন্নার কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করা স্বামীর জন্য উত্তম। কিন্তু পেশাগত কাজটি যদি অত্যাবশকীয় শ্রেণীর হয় তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রীকে সাহায্য করাও স্বামীর জন্য অত্যাবশ্যকীয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আর পুরুষ তার পরিবার-পরিজনদের তত্ত্বাবধায়ক। সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (সা.) বাড়িতে কি কাজ করতেন? তিনি বললেন, তিনি পারিবারিক কাজে সাহায্য করতেন এবং আযান হলে বেরিয়ে যেতেন।[৮৮]

আল্লাহ ইমাম বুখারীর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তিনি তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থ সহীহ্ আল-বুখারীতে যে সব অনুচ্ছেদ শিরোনাম রচনা করেছেন তার মধ্যে বিচক্ষণতার প্রয়াস রয়েছে। মনীষীগণও এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন। এ হাদীসটি তিনি তার সহীহ আল-বুখারী গ্রন্থে কয়েকটি অনুচ্ছেদের অধীনে বর্ণনা করেছেন, যার শিরোণামগুলো হচ্ছে; পরিবারে পুরুষের কাজ, যে ব্যক্তি তার পরিবারে কাজ করে, এবং একজন পুরুষ তার পরিবারে কেমন হবে?

সন্তান পালন এবং পারিবারিক সকল কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করার মাধ্যমে একজন পুরুষ উত্তমরূপে তার দায়িত্ব পালন ও তত্ত্বাবধান কার্য করতে পারে। এই সাহায্যের প্রয়োজন আরো তীব্র হয়ে দাঁড়ায় যখন স্ত্রীর পেশাগত কাজের দায়িত্ব আরো অধিক হয়। এভাবে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে সাহায্য করার ফলে উভয় পক্ষের কাংখিত ভালবাসা ও মমত্ববোধ লাভ গৃহের বাইরে ও ভেতরে ছাড়াও তাদের উভয়ের দেয়া শ্রমের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন নিজেই তার বকরী দোহন করতেন, নিজের কাজ নিজে করতেন (আহমদ), কাপড় সেলাই করতেন, জুতা মেরামত করতেন এবং এসব করতেন গৃহের কাজের জন্য স্ত্রীদের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও তখন নারী পেশাগত কাজে নিয়োজিত থাকলে সে ক্ষেত্রে তা কেমন হওয়া উচিত?

স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে সাহায্য করার ব্যাপারটি আল্লাহ্র কিতাবের তিনটি আয়াত প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করে।

এক. নেকী ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর[৮৯]

দুই. নারীদের পুরুষের উপর ঠিক তেমনি অধিকার রয়েছে যেমন রয়েছে পুরুষদের নারীদের উপর।[৯০]

তিন. কোন প্রাণসত্তার অধিকারীর উপর আল্লাহ্ তার সামর্থের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না।[৯১]

একাদশ দিক নির্দেশনা

স্ত্রীর পেশাগত কাজে নিয়োজিত থাকার ক্ষেত্রে উক্ত কাজের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে কাজ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত দাস কুরাইব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মায়মূনা বিনতে হারেস (রা.) তাকে জানালেন যে, তিনি তার এক দাসীকে দাসত্বের শৃংখলমুক্ত করে দিয়েছেন কিন্তু সে ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে অনুমতি নিতে পারেন নি। অতপর তার পালার দিনে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার ঘরে আসলে তিনি তাকে বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি কি জানেন যে, আমি আমার দাসীকে মুক্ত করে দিয়েছি? তিনি বললেন, তুমি কি এ কাজ করেছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবী (সা.) বললেন, যদি তুমি দাসীটিকে তোমার মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে তাহলে সর্বাধিক পুরস্কার লাভ করতে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর স্ত্রী যয়নাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তখন বেলাল আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা বললাম, নবী (সা.) কে জিজ্ঞেস করুন আমার স্বামী ও পোষ্য সন্তানদের জন্য যা খরচ করি তা আমার জন্য যথেষ্ট হবে কিনা? নবী (সা.) বললেন, হ্যাঁ, সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে আত্মীয়তার অধিকার রক্ষার পুরস্কার এবং সাদকার পুরস্কার। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

দ্বাদশ দিক নির্দেশনা

যেসব কার্যকারণ কর্মজীবী মহিলাদেরকে তাদের পারিবারিক ও পেশাগত দায়িত্ব পালনে সাহায্য করে তার প্রস্তুতির জন্য সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজ দায়ী। মহান আল্লাহ্ বলেন: "মুমিন নারী ও পুরুষরা পরস্পরের বন্ধু।" (তওবা:৭১)

হযরত নুমান ইবনে বাশীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তুমি ঈমানদারদেরকে পারস্পরিক দয়ামায়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। দেহের কোন একটি অংগ রোগাক্রান্ত হলে গোটা দেহই অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ে। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিম সমাজ, তার জনগণ, জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তার বুদ্ধিজীবীগণ পরস্পর দায়প্রবণ ও সহানুভূতিশীল। এ সমাজের কল্যাণকামীদের উচিত নারীরা সময়ের পারিবেশগত কারণে বাধ্য হয়ে তার গৃহের তত্ত্বাবধান ও সন্তানদের পরিচর্যা এবং পেশাগত কাজের মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে যে সব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে তা উৎরানোর ব্যাপারে আহ্বান জানানো ও উপদেশ দান করা। এ জন্য যা করা উচিত তা হলো,

- প্রতিটি এলাকা ও মহল্লায় এবং বড় বড় প্রতিষ্ঠানে উন্নত মানের শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা।
- নারীর গৃহ ভিত্তিক পেশাগত কাজের উদ্যোগকে উৎসাহিত করা।
- যে সব গৃহভিত্তিক বৃত্তিমূলক কাজ ও গৃহকর্ম যৌথ ব্যবস্থাপনার মুখাপেক্ষী তার গতি বিস্তৃত করা। যেমন:

(ক) গৃহভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, তা হাতে তৈরি কুটির শিল্প হোক অথবা বিভিন্ন প্রকার হালকা ও ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ গৃহাভ্যন্তরে স্থাপন করে কারখানায় চূড়ান্তভাবে পেশ করার পূর্বে কর্মবিভাগের

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে গৃহে তৈরি করা হোক। এক্ষেত্রে গৃহভিত্তিক পারিবারিক উৎপাদনের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে থাকে।[৯২]

(খ) গৃহভ্যন্তরে অবস্থান করে সেবামূলক কাজে নারীদের অংশগ্রহণ। যেমন: প্রস্তুত বা আধা প্রস্তুত খাবার তৈরি করা কিংবা যে পরিবারে একটিমাত্র শিশু আছে সেই পরিবারের গৃহকে সীমিত সংখ্যক শিশুর পরিচর্যা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা।[৯৩]

ত্রয়োদশ দিক নির্দেশনা

নারীর বৃত্তিমূলক কাজের ব্যাপারে মুসলিম সরকার দুটি মৌলিক বিষয়ে দায়িত্বশীল: এক, সরকারি কাজে নিয়োজিত বিবাহিত পুরুষদেরকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দান করতে হবে যাতে কোন কোন পেশাগত বা বৃত্তিমূলক কাজে স্ত্রীর অংশগ্রহণ ছাড়াই সে একাই পরিবারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহে সক্ষম হয়। দুই, সরকারের অধীনে কোন বৃত্তিমূলক কাজে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।[৯৪]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমরা সবাই তত্ত্বাবধায়ক। তাই নিজের অধীনস্তদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। শাসক সব মানুষের তত্ত্বাবধায়ক। সেও তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[৯৫]

কর্মজীবী মহিলাদের জন্য মুসলিম সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কয়েকটি উদাহরণ

১. সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন কাজে নিয়োগের সময় নারী ও পুরুষের স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের কথা বিবেচনা করা দরকার। এ বিষয়টি গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক গবেষণার উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত।

২. জরুরী পরিস্থিতিতে নারী যাতে তার শিশুর দেখা শোনা ও তত্ত্বাবধান করতে পারে সেজন্য মহল্লায় মহল্লায় শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সংলগ্ন শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।

৩. নারী ও পুরুষের সাক্ষাতের নিয়মাবলী যথাযথভাবে পালনের নিমিত্তে কর্মক্ষেত্র অথবা সাধারণ পরিবহন সর্বত্র নির্দিষ্ট পরিবহন মাধ্যমের নিশ্চয়তা বিধান করা দরকার।

৪. নারী যাতে তার গৃহ ও সন্তান এবং তার পেশাগত কাজের তত্ত্বাবধানে সক্ষম হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে। যেমন, সন্তান প্রসব ও লালন পালনের জন্য পূর্ণ বেতনে বা অর্ধ বেতনে উপযুক্ত ছুটির ব্যবস্থা করতে হবে। (যা তিন বছর সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে)। কর্মজীবী মহিলাদের শিশু পালনের সময় পূর্ণ বা অর্ধবেতনে অর্ধসময় কাজের অনুমতি প্রদান করতে হবে। অথবা দৈনন্দিন কর্মসময় (এক ঘন্টা বা অনুরূপ পরিমাণ) হ্রাস করতে হবে, যাতে চাকুরীজীবীদের কর্মস্থলে গমন ও প্রত্যাবর্তনকালে যে ভীড়ের মধ্যে পড়তে হয় মহিলাদের তা থেকে রক্ষা পেতে সুবিধা হয়।[৯৬]

চতুর্দশ দিক নির্দেশনা

যে সব পেশাগত কাজ নারীর প্রকৃতি এবং তার দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিকূল তা থেকে রক্ষা করতে হবে। এ ধরণের কাজ দুই প্রকারের: এক প্রকারকে শরীয়ত প্রণেতা চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। অন্য প্রকারকে মুসলমানরা প্রয়োগ করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

এক. শরীয়ত প্রণেতা যেসব বৃত্তিমূলক কাজ নিষিদ্ধ করেছেন

হযরত আবূ বারাকাহ থেকে বর্ণিত নবী (সা.) বলেছেন, সেই জাতি কখনো সফলকাম হতে পারবে না যারা তাদের কাজকারবারের কর্তৃত্ব একজন মহিলার উপর ন্যস্ত করলো।[৯৭]

এ হাদীসটি সম্পর্কে ডাঃ মুস্তফা আস্‌সাবায়ী বলেন, এতে যে কর্তৃত্বের কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা ব্যাপক সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব বুঝানো হয়েছে। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এ উক্তি করেছিলেন তখন, যখন তাঁর কাছে খবর পৌঁছেছিল যে, পারস্যের অধিবাসীরা কিসরার মৃত্যুর পর তার এক কন্যাকে তাদের উপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। কেননা ইজমার ভিত্তিতে সাধারণভাবে মেয়েদের সব কর্তৃত্বই নিষিদ্ধ নয়। এর প্রমাণ হচ্ছেঃ মেয়েরা অপ্রাপ্তবয়স্ক ও দুর্বলবুদ্ধিদের অলী হতে পারে, যে কোন জনসমষ্টির আর্থিক ও কৃষিক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনার উকিল হতে পারে এবং সাক্ষী হতে পারে। এ বিষয়ে ফকীহদের মত হলো সাক্ষ্য দান হচ্ছে 'বিলায়েত' বা কর্তৃত্ব। কেননা কোন কোন ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা নারীর বিচারকার্যের কর্তৃত্ব জায়েজ বলেছেন। অথচ বিচারকার্যের ক্ষমতাও বিলায়েতন বা কর্তৃত্ব। তাই আমরা বুঝি হাদীসটির উক্তি থেকে এ বিষয় সুস্পষ্ট যে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব লাভ থেকে নারীকে নিষেধ করা হয়েছে এবং দায়িত্বের গুরুত্ব অনুসারে অনুরূপ সকল কর্তৃত্বই নারীর জন্য নিষিদ্ধ। তবে অন্যান্য সকল কাজ এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য গ্রহণের ব্যাপারে নারীর জন্য ইসলামে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। কেননা তা সম্পাদনের পূর্ণ যোগ্যতা তার মধ্যে বিদ্যমান। তবে ইসলামের মূলনীতি ও নৈতিকতার সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া অত্যাবশ্যক।

নারীর বিশেষ করে বিচারকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে কাজী ইবনে রুশদ বলেছেন, বিচারকের পদ গ্রহণের জন্য পুরুষ হওয়ার শর্তের ব্যাপারে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ ফকীহর মত হচ্ছে, ফয়সালার বিশুদ্ধতার জন্য বিচারকের পুরুষ হওয়া শর্ত। ইমাম আবু হানীফা বলেছেন, অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে নারীদের বিচারক হওয়া বৈধ। ইমাম তাবারী বলেছেন, সাধারণভাবে বলতে গেলে সব বিষয়ে নারীর শাসক হওয়া বৈধ। যারা নারীর বিচারক হতে পারার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেন তারা বিচার কার্যকে চূড়ান্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বলে মনে করেন। আর যারা অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে নারীর সিদ্ধান্ত দেয়ার কর্তৃত্বকে বৈধ মনে করেন তারা একে অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে তার সাক্ষ্যদানের মত মনে করেন। আর যারা সর্ব বিষয়ে নারীর সিদ্ধান্তকে কার্যকর মনে করেন তারা বলেন, মানুষের সমস্যার ব্যাপারে যে ফয়সালা দিতে পারে তার সিদ্ধান্ত বৈধ। তবে চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ নেতৃত্বের ব্যাপারে ইজমার মাধ্যমে যে বিশেষ সিদ্ধান্ত হয়েছে সে বিষয়টি স্বতন্ত্র।

দুই. মুসলমানগণ যেসব কাজে নিয়োগ থেকে নারীকে বিরত রাখতে চায়

এর মধ্যে পড়ে এমন সব কষ্টকর দৈহিক কাজ যা চরম শ্রম দাবি করার সাথে সাথে নারীর কাঁধে ভারী বোঝা চাপিয়ে দেয়। তাছাড়া যে কাজ কষ্টদায়ক মানসিক প্রচেষ্টা ছাড়া সম্পাদিত হতে পারে না এবং যা এমন রূঢ়তা ও কঠোরতা দাবি করে যা তার আবেগ-অনুভূতিকে নিস্তেজ করে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর পক্ষে যেসব রাষ্ট্রীয় পদের দায়িত্ব গ্রহণ বৈধ সে বিষয়ে আমরা এখানে শায়খ মুহাম্মদ আল গাযালীর একটি মত পেশ করছি। আমরা মনে করি এ ধরণের মতামত সম্পর্কে আমাদের যুগের মুজতাহিদ আলেমদের মধ্যে আরো অধিক আলোচনা পর্যালোচনা ও যাচাই বাছাই হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

যেসব ভিত্তির উপর নারী ও পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠিত তা মহান আল্লাহর এ বাণীর মধ্যে বিধৃত: "নারী হোক বা পুরুষ, আমি তোমাদের কারো আমল নষ্ট করবো না। তোমরা পরস্পর একই প্রজাতিভুক্ত।" (আল-ইমরান, ১৯৫)।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, "নারী হোক বা পুরুষ যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে সে যদি মুমিন হয় তাহলে আমি তাকে পৃথিবীতে পবিত্র জীবন যাপনের ব্যবস্থা করবো এবং এ ধরণের লোকদেরকে (আখেরাতে) তাদের সর্বোত্তম আমল অনুসারে প্রতিদান দেব। (সূরা আন-নাহল:৯৭)

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "নারী হলো পুরুষের সহোদরা। এমন কিছু বিষয় আছে যে বিষয়ে দীন ইসলাম কোন আদেশ বা নিষেধ দেয়নি। তাই ঐগুলো ক্ষমাযোগ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। শারে' বা শরীয়ত প্রণেতা ঐ বিষয়ে কেউই তার নিজের মতামতকে দ্বীন বলে চালাতে পারে না, চালাতে চাইলেও তা নিছক তার মতামত ছাড়া আর কিছুই নয়। এটাই বোধ হয় ইমাম ইবনে হাযমের উক্তির তাৎপর্য। তিনি বলেছেন, খিলাফতে উযমা বা রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতা ছাড়া ইসলাম কোন নারীর জন্যই কোন পদে সমাসীন হওয়া নিষিদ্ধ করেনি। যারা ইবনে হাযমের এমত গ্রহণ করেননি তাদেরকে আমি বলতে শুনেছি যে, তার ঐ মত মহান আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণীর পরিপন্থী:

"পুরুষ নারীদের ব্যবস্থাপক। কারণ আল্লাহ্‌ তাদের একজনকে অপরের উপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং পুরুষ তার অর্থ ব্যয় করে থাকে।" (সূরা আন-নিসা : ৩৪)

উপরোক্ত আয়াত থেকে একথাই বুঝা যায় যে, কোন কাজেই পুরুষের উপর নারীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বৈধ নয়। কিন্তু এমতটি অগ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যাত। যে ব্যক্তিই আয়াতটির অবশিষ্ট অংশ পাঠ করবে সেই দেখতে পাবে যে, পুরুষের উল্লেখিত ব্যবস্থাপনা ও কর্তৃত্ব গৃহ ও পরিবারের পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ। খলীফা হযরত উমর (রা.) যখন শিফা বিনতে আবদুল্লাহকে (আবদুল্লাহর মেয়ে শিফাকে) মদীনার বাজারে "আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার" অর্থাৎ ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের বাধা দান করার সরকারি বিভাগের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তখন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বাজারের সকল মানুষের উপরই তার অধিকার ও কর্তৃত্ব ছিল চূড়ান্ত। তিনি হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতেন, ইনসাফ ও ন্যায়বিচার কায়েম করতেন এবং এর বিরোধিতাকে বাধা দিতেন। কোন ব্যক্তির স্ত্রী যদি ডাক্তার হয় এবং সে কোন হাসপাতালে কর্মরত থাকে তাহলে তার এই কাজে স্বামীর কোন দখল থাকতে পারে না এবং হাসপাতালে কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে তার কোন কর্তৃত্বও খাটতে পারে না। বা হয় রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন خاب قوم ولوا امرهم امراة অর্থাৎ যে জাতি তার সব কাজের দায়িত্ব কোন নারীর উপর ন্যাস্ত করল সে জাতি

Dhaka University Institutional Repository

ব্যর্থ হলো তারা ইবনে হাযমের এ বক্তব্য বাতিল হয়ে গেছে। মুসলমানদের সকল কাজের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব মেয়েদের উপর ন্যস্ত করা গোটা জাতিকে ব্যর্থতার সম্মুখীন করার নামান্তর। কাজেই ছোট বা বড় কোন কাজের দায়িত্বই মেয়েদের উপর অর্পণ করা উচিত নয়। ইবনে হাযম এক্ষেত্রে হাদীসটিকে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বিষয়ে সীমাবদ্ধ বলে মনে করেন। এর চেয়ে ছোট কাজের ব্যাপারে এ হাদীসে কিছুই বলা হয়নি। আমরা আলোচ্য হাদীসটিকে একটু গভীর দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করতে চাই। আমরা নারীকে রাষ্ট্র প্রধান বা সরকার প্রধান করতে আগ্রহী নই। আমাদের আগ্রহের বিষয় একটিই, আর তা হচ্ছে, রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান হবেন জাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি। বর্ণিত হাদীসটি সনদ ও মতনের দিক দিয়ে সহীহ হওয়া সত্ত্বেও আমি তার 'মওযু' হওয়া সম্পর্কেও গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করেছি। তাহলে হাদীসটির অর্থ কি? পারস্য যখন ইসলামী বিজয়ের ধাক্কায় একের পর এক পর্যুদস্ত হয়ে চলছিল তখন তাদের শাসন ব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী ও ধিক্কৃত রাজতন্ত্র। তাদের ধর্ম ছিল মূর্তিপূজা। আর রাজপরিবার কোন পরামর্শের ধার ধারতো না কিংবা বিরোধী কোন মতামতকে মর্যাদা দিতো না এবং তার সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল খুবই খারাপ। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তারা পিতা বা ভাইদেরকে হত্যা করতো। গোটা জাতি ছিল দাসমনোভাবাপন্ন ও বিপথে পরিচালিত। পারস্যের সেনাবাহিনী পরাজিত হয়েছিল এবং রাষ্ট্রের আয়তন ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছিল এবং পরাজয়ের এ প্লাবনকে রোধ করার জন্য সামরিক নেতাদের ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক পৌত্তলিকতা রাষ্ট্র ও তার জনগণকে এমন এক যুবতী নারীর উত্তরাধিকার বানিয়ে দিল যে কিছুই জানতো না। এসব কার্যক্রম এ ইংগিতই বহন করছিল যে, গোটা রাষ্ট্র ধ্বংস হতে চলেছে। এই সমগ্র পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মহাজ্ঞানের অধিকারী নবী (সা.) সত্য কথাটিই বলেছিলেন। তাঁর উক্তির মধ্যে গোটা পরিস্থিতির বর্ণনা ফুটে উঠেছিল। সেই সময় পারস্যে যদি 'শূরা' ব্যবস্থা থাকতো আর শাসক মহিলাটি যদি ইহুদী নারী গোল্ডামায়ারের মত হতো যে ইসরাঈলে শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করেছিল- এবং সামরিক বাহিনী পরিচালনার ক্ষমতা রাষ্ট্র প্রধানের হাতে থাকতো, তাহলে বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্যও ভিন্ন হতো।[৯৮] এখান আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে, এ কথার অর্থ কি? জবাবে আমি বলবো যে, নবী (সা.) মক্কায় সূরা নামল পাঠ করে শুনালেন এবং এই সূরার মাধ্যমেই তিনি তাদের সামনে সাবা'র রানীর কাহিনী বর্ণনা করলেন। যিনি অত্যন্ত কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার সাথে ঈমান ও সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[৯৯] এ ক্ষেত্রে তাঁর উপর যে অহী নাযিল হয়েছিল হাদীসের মাধ্যমে তার পরিপন্থী কোন সিদ্ধান্ত দেয়া তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। রানী বিলকিস ছিলেন বিশাল একটি দেশের সম্রাজ্ঞী। হুদহুদ পাখি যার বর্ণনা দিয়েছিল এভাবে: "আমি সেখানে এক নারীকে দেখেছি যে তার কওমের শাসক। তার আছে সব রকমের সাজ-সরঞ্জাম ও উপায় উপকরণ এবং তার সিংহাসন বড়ই জৌলুসপূর্ণ।"

(সূরা আন-নামল : ২৩)

হযরত সুলায়মান (আ.) তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন এবং সাথে সাথে অহংকার ও বিদ্রোহ করতে নিষেধ করলেন। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পত্র লাভের পর তিনি তার জবাব দেয়ার ব্যাপারে

Dhaka University Institutional Repository

গভীরভাবে চিন্তা করলেন, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং তিনি এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিলে তারা তাকে সাহায্য করবে বলে দ্রুত এগিয়ে আসলো। তারা বললো: "আমরা শক্তিমান ও যোদ্ধা জনগোষ্ঠী। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আপনার। নিজেই ভেবে দেখুন, আপনি আমাদের কি নির্দেশ দেবেন।"[১০০]

সচেতন ঐ মহিলা তার শক্তি ও জাতির নিঃশর্ত আনুগত্যে প্রতারিত হলেন না। বরং বললেন, সুলায়মান কি জালেম- স্বৈরাচারী- যে ক্ষমতা, আধিপত্য ও সম্পদ চায় অথবা সে সত্যিই নবী, যে ঈমানের অধিকারী এবং মানুষকে ঈমানের দিকে দাওয়াত দিতে চায়, তা আমি পরীক্ষা করবো। অতঃপর তিনি যখন সুলায়মানের সাক্ষাত লাভ করেছেন তখনো বুদ্ধিমত্তা ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর অবস্থান ও পারিপার্শ্বিকতা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করেছেন এবং তিনি কি চান ও কি করবেন তা বুঝতে চেষ্টা করেছেন। ফলে তার কাছে প্রতিভাত হয়েছে যে, তিনি সত্যিই নবী। সাথে সাথে তিনি সুলায়মান (আ.) প্রেরিত পত্রের কথাও স্মরণ করেছেন। "ঐ পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এসেছে এবং দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে তা শুরু করা হয়েছে। (পত্রের বিষয়বস্তু হচ্ছে) আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না এবং মুসলিম হয়ে আমার কাছে হাজির হও। সূরা আন-নামল: ৩০-৩১। অতপর তিনি পৌত্তলিকতা বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং এ কথা বলে ইসলাম গ্রহণ করলেন যে, "হে আমার রব! আজ পর্যন্ত আমি নিজের উপর জুলুম করে এসেছি। এখন আমি সুলায়মানের সাথে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের আনুগত্য গ্রহণ করছি। সূরা আন-নামল: ৪৪। সেই জাতি কি ব্যর্থ হয়েছে যারা এ ধরণের নারীর উপর তাদের সকল কাজের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ন্যাস্ত করেছিল? এ নারী সামুদ জাতির সে পুরুষ শাসকের চেয়ে উত্তম ছিল যে উটনীটিকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্‌র অভিশাপে অভিশপ্ত হয়েছিল, সূরা আল-কামার: ২৯-৩২। এখানে যা বলতে চাই ত হল নারী নেতৃত্ব সব সময় কাম্য নয়। তবে যাদের শাসন সমাজের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে তারা নেতৃত্ব দিতে পারে। যেমন: রাণী বিলকিস, রাণী ভিক্টোরিয়া, মার্গারেট থ্যাচার প্রমুখ।

পঞ্চদশ দিক নির্দেশনা

পেশাগত কাজে নারীর অংশগ্রহণ যে ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সাক্ষাতের দাবি করে সেক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়কেই পরস্পর অংশগ্রহণের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে হবে। এখানে ঐসব নিয়ম-নীতির মধ্যে থেকে কয়েকটি উল্লেখ করছি। যেমন, শালীন পোশাক পরা, দৃষ্টি আনত রাখা, নিভৃতে সাক্ষাত না করা এবং ভীড় এড়িয়ে চলা। অনুরূপ বার বার দীর্ঘ সময় ধরে দেখা-সাক্ষাত বর্জন করা অর্থাৎ প্রত্যেকের কাজ আলাদা আলাদা হওয়া সত্ত্বেও কাজের পুরো সময়টাতে নারী ও পুরুষকে একত্রে একই স্থানে রাখা থেকে বিরত থাকা। তবে কাজের প্রকৃতিই যদি পরস্পর সহযোগিতা ও মত বিনিময় অথবা অন্য কোন কল্যাণকর উদ্দেশ্যে নারী পুরুষের পুনঃ পুনঃ, পরস্পর দেখা-সাক্ষাত দাবি করে তাহলে প্রয়োজন অনুসারে তা করাতে কোন ক্ষতি নেই।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু বর্তমানে যেসব বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান আছে তাতে যদি এসব নিয়ম-নীতির কিছু অভাব থেকে থাকে তাহলে কি নারী অথবা সমাজের জন্য কল্যাণকর দিকসমূহ আমরা পরিত্যাগ করবো এবং মুসলিম নারীর কাছে দাবি করবো যে তারা যেন ঐসব প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করে? নাকি শরীয়ত নির্দেশিত নিয়ম-কানুন পালন করার যুক্তিসংগত প্রচেষ্টা চালানোর সাথে সাথে ঐসব নিয়ম-কানূনকে উপেক্ষ করবো? ফাসাদ ও বিপর্যয় প্রতিরোধের প্রয়োজন কতটা এবং তার প্রতিরোধ করার পর কতটা কল্যাণ অর্জিত হবে তা পরিমাপ করা শরীয়তের মূলনীতি অনুসারে ওয়াজিব। এ বিষয়ে ইবনে তাইমিয়া বলেন, হারামকে অনিবার্য করে তোলে এমন ফাসাদ বা অনিষ্টকর জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়। তবে যে প্রয়োজন অনুমতিকে অনিবার্য করে তোলে এমন প্রয়োজন দেখা দিলে সেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়। ফলে ইসতিহবাব বা ওয়াজিবের ক্ষেত্রে তা আরো বেশী গ্রহণযোগ্য।[১০১]

বিপর্যয়ের পথরোধের জন্য যেসব নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে সুস্পষ্ট কল্যাণ লাভের জন্য তা উপেক্ষা করা যায়। যেমন কোন নারীর সাথে নিভৃতে সাক্ষাত করা, সফর করা বা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা। কেননা এসব কাজ বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এজন্য নারীকে স্বামী বা মাহরাম পুরুষের সাথে ছাড়া সফরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা এ কারণে যে, এর অবর্তমানে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। কিন্তু যখনই সুস্পষ্ট কল্যাণ অর্জিত হবে তখন তা আর বিপর্যয়ের সৃষ্টিকারী বলে গণ্য হবে না।[১০২]

শরীয়তের অন্যতম মূলনীতি হলো, একই কাজে যখন বিপর্যয় ও কল্যাণ একসাথে দেখা দেবে তখন অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয়টি গ্রহণ করতে হবে।[১০৩]

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে মুসলিম নারীর রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ সম্পর্কিত ঘটনাবলী

পুরুষের মত মুসলিম নারীকেও তার সমাজ-পরিমণ্ডলে রাজনৈতিক ব্যাপারে যত্নশীল ও আগ্রহী হবার আহ্বান জানানো হয়েছে। একইভাবে তাকে তার পরিবেশের সীমার মধ্যে নিজের শক্তি অনুসারে তার সমাজকে জাগ্রত করতে এবং আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার (ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান) ও সদুপদেশ দানের কাজে অংগ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। অর্থাৎ গঠনমূলক কাজে সহযোগিতা ও বিপথগামিতার কাজের মোকাবিলা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। ক্ষমতাসীনদেরকে পথ প্রদর্শন ও ন্যায়বিচারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এটাও পুরস্কারযোগ্য এক প্রকার জিহাদ।

নারীর রাজনৈতিক বিষয়ে যত্নশীল ও আগ্রহী হওয়া প্রসংগে

প্রথম দিক নির্দেশনা

এ প্রসঙ্গে উম্মে সালামার এ উক্তিটি কত গুরুত্বপূর্ণ যে, "আমিও মানবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্তি।" এক্ষেত্রে তিনি যা বিবেচনা করেছিলেন তা হচ্ছে, ইমাম মানব সমাজকে উদ্দেশ্য করে যে কথা বলেছিলেন তা কেবল পুরুষদের উদ্দেশ্যে নয়, বরং নারী ও পুরুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। ফাতেমা বিনতে কায়েসের উক্তি কতই না

Dhaka University Institutional Repository

সত্য। (তিনি বলেছেন,) আমি মসজিদে গমনকারী লোকজনের সাথে মসজিদে গেলাম, যেখানে ইমামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পুরুষরা অংশগ্রহণ করেছিল।

নারী কর্তৃক তার সমাজকে জাগ্রত করা এবং কর্তৃপক্ষকে সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা দান ও ন্যায়বিচারে উদ্বুদ্ধ করার কাজে অংশগ্রহণ

মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "মুমিন নারী ও পুরুষ একে অপরের সহযোগী। তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎকাজে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তাদের প্রতিই আল্লাহ্ রহম করবেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা আত-তওবাহ : ৭১)

তামীমে দারী থেকে বর্ণিত নবী (সা.) বলেছেন, দীন হচ্ছে উপদেশ। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ্, আল্লাহ্র কিতাব, তাঁর রসূল, মুসলমানদের নেতা ও তাদের জনসাধারণের জন্য। (সহীহ মুসলিম)

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আমি নবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আমি ইসলামের জন্য আপনার কাছে বাইয়াত হতে চাই। তখন তিনি (ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে) আমার বাইয়াতের জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে উপদেশ দানের শর্ত আরোপ করলেন। আমি এ শর্ত মেনে নিয়ে তাঁর কাছে বাইয়াত হলাম। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ্র দীনের ব্যাপারে নসীহত বা উপদেশ দান যে কত বড় মহৎ ও প্রশংসিত কাজ সে বিষয়টি রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, দীন হচ্ছে উপদেশ দান বা মঙ্গল কামনা করা। অর্থাৎ সত্যিকার দীন নসীহত বা মঙ্গল কামনা ছাড়া হতেই পারে না। দীন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মুসলমানের জন্য। সুযোগ-সুবিধা ও শক্তি সামর্থ অনুসারে আমরা এ দায়িত্ব পালন করেছি কিনা সে ব্যাপারে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে জিজ্ঞেস করা হবে। নসীহত ও মঙ্গল কামনার দুটি দিক রয়েছে। একটি দিক হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক ও উপলব্ধিগত অর্থাৎ নির্বিশেষে সব মুসলমানের কল্যাণ চিন্তা করা। অপর দিকটি হচ্ছে কর্ম ও আচরণগত অর্থাৎ ঐ ব্যাপারে নিজের মতামত প্রকাশ করা এবং ভীষণ কষ্ট বরদাশত করার বিনিময়ে হলেও সত্য কথা প্রকশ করা।

দ্বিতীয় দিক নির্দেশনা

রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনা কোন কোন সময় ফরযের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য যা ফরযে কিফায়ার পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য, তা পালন করা তাদের কর্তব্য।

এসব ফরযের মধ্যে পড়ে

ক) কর্তৃপক্ষকে সঠিক দিক নির্দেশনা দান ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং এ কাজটি যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য যেসব কাজে পুরুষের সাথে মেয়েদের চেষ্টা সাধনার একান্ত প্রয়োজন। যেমন: আইনসভা, লোকাল বডি ও ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাচনে সৎ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার জন্য মেয়েদের নির্বাচনে

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণ করা। অনুরূপ যে সব বিষয়ে জনমত যাচাইয়ের জন্য জনগণের সামনে পেশ করা হয় এবং ভাল বিষয় গ্রহণ ও মন্দ বিষয়কে বর্জন করার প্রশ্ন থাকে, সেসব বিষয়ে ভোটদানে অংশগ্রহণ করা।

খ) যেসব সৎ রাজনৈতিক দল ও শক্তি জাতির উন্নতি কামনা করে এবং একদিকে ইসলামের মূল ভিত্তি ও অন্যদিকে মানবজাতির অভিজ্ঞতা ও সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে তাদেরকে ব্যাপকভাবে সংস্কার সংশোধনের প্রচেষ্টা চালায়, সেই সব দল ও শক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যাওয়া। বিপুল সংখ্যক নারী ও পুরুষ ইসলামের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন যেসব শক্তি ও সুবিধাবাদী দলসমূহকে সমর্থন দানের মাধ্যমে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেছে, তাদের মোকাবিলার জন্য এসব দল ও শক্তির তৎপরতার প্রতি সমর্থন দান করা প্রয়োজন।

গ) নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করা, বিশেষ করে নির্বাচনের মওসুমে। এটা করতে হবে তখন যখন সচেতনতা সৃষ্টিকারীদের ঘরে গিয়ে নিকট থেকে নারীদের সম্বোধন করা এবং তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার প্রয়োজন দেখা দেয়।[১০৪]

ঘ) নির্বাচনের নিরপেক্ষতা বিধানের জন্য নির্বাচন পরিচালনাকারী সংগঠন ও তার কার্যক্রম তত্ত্বধান করা। এটা বিশেষভাবে সেইসব স্থানে করতে হবে যেখানে মেয়েরা সংশ্লিষ্ট আছে, যাতে পুরুষের ভিড় এড়ানো যেতে পারে।

তৃতীয় দিক নির্দেশনা

শিক্ষার প্রতি অধিক মনোযোগী করার সাথে সাথে মুসলিম মেয়েদেরকে সমাজের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও সজ্জিত করা শিক্ষার মূল লক্ষ্যের অন্তর্ভূক্ত হওয়া প্রয়োজন। তাদের যে স্বাভাবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তার সাথে সাথে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে এই সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এর মধ্যে পড়ে:

- সাধারণ সমস্যাবলী সম্পর্কে লেখনির মাধ্যমে, বিক্ষোভ প্রদর্শন ধর্মঘট বা অন্য কোন উপায়ে নিজের মত প্রকাশ করা।
- অত্যাবশ্যকীয় উপদেশ দানের বা কোন বিষয়ে আপত্তি করার অধিকার (অর্থাৎ ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দানের অধিকার)
- যেসব দল বা রাজনৈতিক ধারার মৌলিক নীতিমালা সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠার অধিক নিকটবর্তী সেসব দল ও রাজনৈতিক ধারাকে সমর্থন করা।
- নির্বাচনের ক্ষেত্রে এমন যোগ্য ও সক্ষম প্রার্থীকে সমর্থনের জন্য বেছে নিতে হবে যে, জাতির প্রতিনিধিত্বের আমানত বহন করতে পারে। অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা যোগ্য প্রার্থীর সমর্থনে ভোটের অধিকার প্রয়োগ করতে হবে।
- কোন অঞ্চল বা নির্বাচনী এলাকা থেকে জাতির প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা ও সামর্থ থাকলে প্রতিনিধি সভার প্রার্থিতা গ্রহণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- গৃহকর্ম সম্পাদনের পর যে বাড়তি সময় থাকে তা কল্যাণকর কাজে লাগানোর জন্য মেয়েদেরকে শিক্ষা দান করা প্রয়োজন। ক্ষমতাসীনদের সৎপথপ্রাপ্তি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক তৎপরতা কল্যাণকর কাজের অন্যতম ক্ষেত্র।[১০৫]
- ইতিপূর্বে পেশাগত কাজের দিক-নির্দেশনাসমূহের দ্বিতীয় দিক-নির্দেশনা বর্ণনাকালে সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর প্রায়োজনীয়তা সম্পর্কিত দলীলসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

নির্বাচনে নারীর অধিকার সম্পর্কে আলোচনা

এখানে আলোচনাটা দুটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রথমটি হচ্ছে, নারীর নির্বাচনের অধিকার সম্পর্কে শরীয়তের স্বীকৃতি এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে নারী কর্তৃক এ অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তারোপ।

নির্বাচনে নারীর অধিকার সম্পর্কে শরীয়তের স্বীকৃতি

মূলনীতি বলে: প্রতিটি বস্তু বা বিষয়ই মূলত বৈধ। তাই নারীর নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার সম্পর্কে শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপিত না হওয়ায় আমরা তার এই অধিকারকে মূলগতভাবে শরীয়তসম্মত বলে বিবেচনা করবো। তবে বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে যা আমাদের পরিবেশের উপযোগী ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধানকারী সেটাকেই শরীয়ত অনুমোদিত বলে গ্রহণ করবো।

এখানে আমরা ডাঃ মুস্তাফা আস-সাব্বায়ী রহমাতুল্লাহ্‌র একটি মত উদ্ধৃত করছি। তিনি ছিলেন দামেশ্‌ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া কলেজের প্রধান এবং শরীয়া বিষয়ের অধ্যাপক। তার যে মতটি আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি তা একদল শরীয়া বিশেষজ্ঞের সমষ্টিগত মত। নির্বাচনে নারীকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দান ও নির্বাচনে তার অধিকার বিষয়ে শরীয়তের স্বীকৃতির পরিধি সম্পর্কে তাদের মধ্যে একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বলেছেন, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি পর্যালোচনা করার পর আমরা দেখতে পেয়েছি যে, ইসলাম নারীকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে না। নির্বাচন হচ্ছে, জাতির প্রতিনিধিবৃন্দ বাছাই করার প্রক্রিয়া বিশেষ। এসব প্রতিনিধিত্ব আইন প্রণয়ন ও সরকারের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে জাতির প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং নির্বাচন প্রক্রিয়া হচ্ছে প্রতিনিধি বাছাইয়ের কার্যক্রম, যে ক্ষেত্রে একজন লোক ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোটদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি সভায় তার পক্ষ থেকে কথা বলা ও তার অধিকারসমূহ রক্ষার জন্য প্রতিনিধি বাছাই করে। তাই নারীকে তার অধিকারসমূহ সংরক্ষণ এবং তার পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশার জন্য একজন উকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগ করতে ইসলাম বাধা দেয় না। কারণ সমাজের অন্যান্য সদস্যদের মত সেও একজন নাগরিক।[১০৬]

নারীর নির্বাচন ও ভোটের অধিকার প্রয়োগের জন্য কি বিশেষ কোন শর্ত আছে?

রাজনৈতিক বিষয়ে আগ্রহী কিছু সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে এর শর্তাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন বিলি করা হয়েছিল। প্রশ্ন ছিল: নারীর ভোটের অধিকারকে কি শিক্ষার একটা নিম্নতম সীমার সাথে শর্তযুক্ত করা যাবে, যাতে সে তার পিতা ও স্বামীর প্রভাবমুক্ত হয়ে নিজস্ব একটা মতামত গঠনে সক্ষম হতে পারে?

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা ও পর্যালোচনার পর এ কথা স্থিরীকৃত হয় যে, নির্বাচন ও ভোটের ব্যাপারে নারী ও পুরুষের মধ্যে এ ধরণের ভেদরেখা টানার কোন প্রয়োজন নেই। তবে সেটা যদি এমন সমাজ হয়, যেখানে নারীকে অবরুদ্ধ রাখা হয়, সমাজ জীবনের কোন ক্ষেত্রে কোন প্রকারেই তাকে অংশগ্রহণ করতে না দেয়া হয় এবং তাদেরকে পুরুষদের সংস্রব থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে রাখা হয় তাহলে ভিন্ন কথা। এই ধরণের সমাজে অনেক সময় ক্রম-অগ্রগতি জরুরী হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু উন্মুক্ত সমাজে যেখানে নারীর সমাজ জীবনে অংশগ্রহণের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে সেখানে এ ধরণের ক্রম-অগ্রগতির প্রয়োজন নেই। বাস্তবে অনুশীলনের ফলে অচিরেই সমাজের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং তা থেকে প্রতিবছরই লক্ষণীয় পরিবর্তন আসবে। এই পরিবর্তন আসতে পারে পিতা বা স্বামীর অধীন নিরক্ষর নারীর মন-মানসিকতায়, কিংবা গোত্রীয় প্রভাবাধীন বা ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী ব্যক্তির অধীন সাধারণ মানুষের মন-মানসিকতায় অথবা জাতির প্রতিনিধিত্বের জন্য আকাংখিত চিরাচরিত প্রার্থীদের মন-মানসিকতায়। এর ফলে অচিরেই ময়দানে এমন সব ব্যক্তিত্ব ও দলের আবির্ভাব ঘটবে যারা হবে নতুন নীতি ও ধ্যান-ধারণার বাহক। সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী-পুরুষের মধ্যে জাগরণ ও সচেতনতা সৃষ্টির জন্য তারা অবশ্যই ভূমিকা পালন করবে। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে বাস্তব অনুশীলন তার নতুন নতুন উপাদানের সাহায্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী ও পুরুষের জন্য-তারা নিরক্ষর হলেও এনে দেবে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা। এভাবে তারা হয়ে উঠবে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও স্বতন্ত্র মতামতের অধিকারী, যা উৎসারিত হবে তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও কল্যাণচিন্তা থেকে।

নারীর মনোনয়ন লাভের অধিকার সম্পর্কে শরীয়তের স্বীকৃতি

মূলনীতি অনুসারে প্রতিটি বস্তু বা বিষয়ই মূলত বৈধ। তাই নারীর মনোনয়ন লাভের অধিকার সম্পর্কে শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপিত না হওয়ায় আমরা তার এই অধিকারকে মূলগতভাবে শরীয়ত অনুমোদিত বলে বিবেচনা করবো। তবে বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে যা আমাদের পরিবেশের উপযোগী ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধানকারী হবে সেটাকেই শরীয়ত অনুমোদিত বলে গ্রহণ করবো। এখানে ডাঃ মুস্তাফা আল সাব্বায়ীর একটা অভিমত উদ্ধৃত করছি। তিনি (আল্লাহ তার প্রতি রহমত বর্ষন করুন) বলেছেন, ইসলামের মূলনীতি যখন নারীকে ভোটার হতে বাধা দেয় না তখন কি তা তাকে প্রতিনিধি হতে বাধা দেবে? এ প্রশ্নের জবাব দানের পূর্বে আমাদের জানা কর্তব্য জাতির প্রতিনিধিত্বের প্রকৃতি। জাতির প্রতিনিধিত্ব দুটি প্রধান কাজ ছাড়া আর কিছু নয়।

১। আইন প্রণয়ন: আইন রচনা ও সংগঠন তৈরি করা।

২। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ: সরকারি নির্বাহী বিভাগ ও তার কাজকর্ম পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা।

আইন রচনার ক্ষেত্রে এমন কোন বিধান নেই, যা নারীকে আইন রচয়িতা হতে বাধা দেয়। কারণ আইন রচনার বিষয়টি সবকিছুর আগে সমাজের অপরিহার্য প্রয়োজন সম্পর্কে জ্ঞানের মুখাপেক্ষী। ইসলাম নারী পুরুষ উভয়কে সমানভাবে জ্ঞান লাভের অধিকার দান করে। আমাদের ইতিহাসে হাদীস, ফিকহ্, সাহিত্য প্রভৃতি জ্ঞানের শাখায় বহু মহিলা মনীষার অবদান দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের নির্বাহী বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান 'আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার,' অর্থাৎ ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়া। এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ উভয়েই সমান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "ঈমানদার নারী ও পুরুষ পরস্পরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজে নিষেধ করে।"

এরই ভিত্তিতে বলা হয়, ইসলামে সুস্পষ্টভাবে এমন কিছুই নেই, যা নারীর প্রতিনিধিত্বমূলক কাজের যোগ্যতা কেড়ে নিতে পারে, (যেমন-আইন প্রণয়ন ও পর্যবেক্ষণ)

চতুর্থ দিক নির্দেশনা

ওয়াজিব ও মানদূব রাজনৈতিক তৎপরতার জন্য নারীর নিজের ও পরিবারের অর্থ-সম্পদ থেকে ব্যয় করা 'মানদূব'। মানদূব পর্যায়ের রাজনৈতিক তৎপরতায় নারীর অত্যধিক ব্যস্ততার ক্ষেত্রে গৃহকর্মে তাকে সাহায্য করা পুরুষের জন্য 'মানদূব' এবং তা ওয়াজিব পর্যায়ের তৎপরতার অন্তর্ভুক্ত হলে তাকে সাহায্য করাও ওয়াজিব। এভাবে রাজনৈতিক তৎপরতায় নারীকে সাহায্য করার ফলে পুরুষ তার সওয়াবে অংশীদার হয় এবং সাহায্য ও উৎসাহদানের মাত্রা অনুপাতে তার সওয়াবের অনুপাত হয়। নারী কর্তৃক পরিবারের অর্থ-সম্পদ ব্যয় এবং স্ত্রীকে স্বামীর সাহায্যের বিষয়টি 'মানদূব' হওয়া সম্পর্কে যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

পঞ্চম দিক নির্দেশনা

নারী যাতে পরিবারের প্রতি তার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সমাজের প্রতি তার রাজনৈতিক দায়িত্বও পালন করতে পারে সেজন্য তাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে অনুকূল কার্যকরণ ও পরিবেশ সৃষ্টি করা সমাজের দায়িত্ব।

নুমান ইবনে বাশীর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, পরস্পরের প্রতি দয়া, স্নেহ-ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তোমরা মুমিনদেরকে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে, যার একটি অংগ রোগাক্রান্ত হলে গোটা দেহটাই অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিম সমাজের সকল সদস্য ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ একে অপরের প্রতি দয়ার্দ্র ও সহানুভূতিশীল। তাই এ সমাজে যারা কল্যাণ চিন্তানুখী লোক আছে, তাদের কর্তব্য ইতিবাচক ও গঠনমূলক কাজ করার জন্য পরস্পরকে আহ্বান জানানো ও উপদেশ দেয়া, যার মধ্যে থাকবে:

- রাজনৈতিক তৎপরতায় নারীদেরকে উৎসাহিত করা। এটা করতে হবে সব রকম প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে তার ভূমিকা ও দায়িত্ব তুলে ধরে এবং সে দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে উৎসাহিত করে। আর নারী যাতে তার সামর্থ অনুসারে রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনে অংশগ্রহণ করে, সেজন্য তাকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করার জন্য পুরুষের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে।
- নারীর জন্য রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ সহজতর করার উদ্দেশ্যে দল গঠনের সময় কোন কোন ক্ষেত্রে নারী সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কমিটি গঠন করতে হবে। এসব ক্ষেত্র ছাড়া অন্যসব ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সাথে মিলে রাজনৈতিক তৎপরতা চালাবে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ দিক নির্দেশনা

রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণে নারীকে উৎসাহিত করা এবং সেদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার দায়িত্ব মুসলিম সরকারের।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। জনগণের আমীর (শাসক) ও তত্ত্বাবধায়ক। সেও তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

কয়েকটি উপায়ে এসব দায়িত্ব পালন সম্ভব:

- অর্থপূর্ণ রাজনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে সমাজ জাগরণে নারীর অংশগ্রণের ব্যাপারে সরকারি প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে নারীর দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করা।
- নারীকে ভোটের অধিকার প্রদান, নির্বাচনে মনোনয়ন ও প্রার্থিতার সাধারণ অধিকার প্রদান এবং নারী বিষয়ক প্রতিষ্ঠান বা নারীর সংখ্যাধিক্য রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানসমূহে মনোনয়ন ও প্রার্থিতার অধিকার প্রদান করে তার রাজনৈতিক ভূমিকা পালন সহজ করে দেয়া।
- নির্বাচনের মাধ্যমে হোক বা মনোনয়নের মাধ্যমে লোকাল বডি ও জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে।

সপ্তম দিক নির্দেশনা

রাজনৈতিক তৎপরতায় নারীর অংশগ্রহণ যে ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে তার দেখা-সাক্ষাত দাবী করে, সেক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়কেই পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে, যা আমরা ইতিপূর্বে একটি বিশেষ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ঐসব নিয়ম-কানুনের মধ্য থেকে কয়েকটি আমরা এখানে উল্লেখ করছি। যেমন: পোশাকের ক্ষেত্রে শালীনতা ও গাম্ভীর্য বজায় রাখা, দৃষ্টি আনত রাখা, নির্জনতা ও ভিড় এড়িয়ে চলা এবং সন্দেহের ক্ষেত্র থেকে দূরে অবস্থান করা।

যাহোক, বর্তমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে যদি এসব নিয়ম-কানুনের কোন কোনটা বর্তমান না থাকে তাহলে ঐসব প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা যেসব কল্যাণ ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করছি তা বাতিল করা কি ঠিক হবে এবং তার কর্মকাণ্ডে কি মুসলিম মেয়েরা অংশগ্রহণ করবে না? নাকি এসব কল্যাণ ও সুযোগ-সুবিধার বিষয় বিবেচনা করে মুসলিম মেয়েরা তার কর্মকাণ্ডে অংশ নেবে এবং সাথে সাথে বিজ্ঞোচিত পন্থায় শরীয়তের বিধি-বিধান পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে? ফাসাদ প্রতিরোধের জন্য শরীয়তের মূলনীতি পূর্বাহ্নেই তার প্রয়োজনীয়তা ও কল্যাণকারিতার পরিমাণ করে। এ বিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, "হারামকে অনিবার্য করে তোলে এরূপ বিপর্যকর বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়। কিন্তু অনিবার্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সেদিকে দৃষ্টিপাত করা যাবে। এমনকি মুস্তাহাব বা ওয়াজিব প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও তা করা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

বিপর্যয় প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়ে থাকলেও নিশ্চিত কল্যাণ লাভের সম্ভাবনার বর্তমানে তা করা যায়...। যেমন, গায়ের মাহরাম মহিলার সাথে নির্জনে দেখা সাক্ষাত ও তার সাথে সফর করা বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে হেতু তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং নারীকে স্বামী বা মাহরাম আত্মীয় ছাড়া সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে।... এসব কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে এ কারণে যে, তা বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। কিন্তু নিশ্চত কল্যাণের সম্ভাবনা থাকলে তা বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে না।"[১০৭]

শরীয়তের মূলনীতি হচ্ছে, একই সাথে কল্যাণ ও বিপর্যয়ের বিষয়ের সম্মুখীন হলে অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয়টিকে গ্রহণ করতে হবে।[১০৮]

সমকালীন পাশ্চাত্য সমাজের অভিজ্ঞতার একটি উদাহরণ

সোভিয়েট নেতা মিখাইল গর্বাচেভ তার পেরেস্ত্রয়কা গ্রন্থে বলেন, "কোন সমাজে নারী যতটা স্বাধীনতা ভোগ করছে প্রধানত সেটাকেই তার সামাজিক ও রাজনৈতিক মান নির্ণয়ের মাপকাঠি বলে বিবেচনা করা হয়। জার শাসিত রাশিয়ায় নারীর সাথে যে বৈষম্যমূলক আচরণ চালু ছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন দৃঢ়ভাবে এবং কোন প্রকার দরকষাকষি ছাড়া তার একটা সীমারেখা টেনে দিয়েছে। এখন নারী সেখানে পুরুষের পাশে সমান সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছে এবং আইন তার নিশ্চয়তা বিধান করেছে। সোভিয়েট সরকার নারীকে দিয়েছে পুরুষের মত কর্মের অধিকার, সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক লাভের অধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তা। নারীকে শিক্ষা লাভের ও তার ভবিষ্যত নির্মাণের এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশ গ্রহণের সব রকম সুযোগ সুবিধা দান করা হয়েছে। নারীর অংশ গ্রহণ এবং আন্তরিক প্রাণান্তকর কর্ম প্রচেষ্টা ছাড়া নতুন সমাজ বিনির্মাণ কিংবা ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ আমাদের সাধ্যের অতীত ছিল।

আমাদের ইতিহাসের বীরত্বপূর্ণ ও দুঃখ-দুর্দশাভরা বছরগুলোতে, নারীদের বিশেষ অধিকার এবং মা ও গৃহিণী হিসেবে ভূমিকা পালনে তার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন পূরণে আমরা অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছি। নারী যখন জ্ঞান গবেষণায় রত থাকে, নির্মাণ ক্ষেত্রে কাজ করে, কিংবা উৎপাদন ও সেবামূলক কাজে ব্যস্ত থাকে অথবা গঠনমূলক মৌলিক কাজে অংশগ্রহণ করে তখন গৃহে দৈনন্দিন দায়িত্ব (গৃহকর্ম, শিশুর প্রশিক্ষণ এবং মধুর ও পবিত্র পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি) পালনের জন্য তার সময় থাকে না। আমরা এ কথা বুঝতে সক্ষম হয়েছি যে, আমাদের শিশু ও যুবকদের আচরণে, আমাদের নৈতিকতায়, সংস্কৃতিতে ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা যেসব সমস্যা ও জটিলতার সম্মুখীন, তার বেশীর ভাগের জন্যই আংশিকভাবে দায়ী পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা এবং পারিবারিক দায়িত্ব পালনে ঢিলেমি ও অলসতা। এটা হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে প্রতিটি ব্যাপারে নারীকে পুরুষের সমকক্ষ করার আমাদের সাধু সংকল্পের অনিবার্য উল্টাফল। বর্তমানে পেরেস্ত্রয়কা চালু হওয়ার মাধ্যমে এ পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসছে। এ কারণে বর্তমানে আমরা সাংবাদিকতায়, সাধারণ সংগঠনসমূহে, কর্মক্ষেত্রে ও গৃহে বিশেষ করে নারীর নারীসুলভ নির্ভেজাল

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্বসমূহ পালন সহজসাধ্য করার জন্য যে সব দায়িত্ব পালন অত্যাবশ্যকীয়, সেসব ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা কঠোর করেছি।[১০৯]

এখানে নির্ভেজাল নারীসুলভ কাজের দিকে প্রত্যাবর্তনের অর্থ নারীকে পেশাগত কাজ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক তৎপরতা থেকে বঞ্চিত করা বলে আমি মনে করি না। বরং এর অর্থ পরিবারের মধ্যকার প্রথমোক্ত মৌলিক কাজ এবং অন্যান্য কাজের মধ্যে ব্যাপক প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য সৃষ্টি ও ভারসাম্য আনয়ন করা।[১১০]

পরিশেষে বলা যায় ইসলামই একমাত্র জীবন বিধান যা নারীকে সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সর্বোচ্চ সুযোগ দিয়ে উন্নয়নে তাদের অবদানকে মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। আধুনিক পাশ্চাত্য এবং সেই সাথে কিছু নামধারী মুসলিম সমাজ যেখানে নারীর সকল ক্ষেত্রে সমান সুযোগের দাবীতে আন্দোলন করছে সেখানে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই বিনা দাবী ও আন্দোলনে ইসলাম সেই সুযোগের চেয়ে বেশি সুযোগ নারীদের দিয়েছে। মা, বোন, স্ত্রী হিসেবে যে মর্যাদা একজন মুসলিম নারী ভোগ করছে পাশ্চাত্য সমাজ তা আন্দোলন করেও লাভ করতে পারেনি। তবে এক্ষেত্রে যে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বলতে হচ্ছে তা হলো- ইসলামের সেই শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। এ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে হবে তা হলেই এর সুফল আমরা ভোগ করতে পারব।

তথ্য নির্দেশিকা

১। বেবেল, আগষ্ট, *নারী : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ*, কলকাতা, গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯০, পৃ. ১২।

২। বাদাবী, জামাল আল, *ইসলামী শিক্ষা সিরিজ*, ৩য় খণ্ড, বি.আই. আই. টি. ঢাকা, অক্টোবর, ২০০৯ পৃ. ৩০৩।

৩। Encyclopedia Britannica, Marriage East and west by- David and vera Mace History of Civilizations, Vol-13, E.A. Allen.

৪। বাদাবী, জামাল আল, প্রাগুক্ত।

৫। প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতায় এই দেবীর নাম ছিল আইসিস (Lsis) ব্যাবিলনে তিয়ামাত (Tiamat), গ্রীসে দ্যামত্রি (Dcmctrc) এবং রোমে ম্যালেন (Ma`cl)

৬। বানু, ইউ. এ. বি রাজিয়া আকতার "সংবিধানে ও ধর্মে বাংলাদেশে মুসলিম নারীর অধিকার ও মর্যাদা একটি পর্যালোচনা" বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, দ্বাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর-১৯৯৪, পৃ. ৪৮।

৭। প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৮। Dr. Guy Standing-এর পরিচালনায় জাতি সংঘের ৭২০ টি থেকে ৬০টি দেশে শ্রমশক্তির উপর জরিপ চালান হয়। অনেক ধরণের কাজ যা পূর্বে ছেলেরা করত তা মেয়েরা করছে।

৯। বাদাবী জামাল আল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২।

১০। *আল-কুরআন* (৪:১) জেনেসিস (২:২-১২)

১১। জেনেসিস ৩ (Chapter-3) ৩৮ : ৭১, ৭:১১, ২:৩১, ১৫:২৮, ১৭:৬১, ২০:১১৫ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন যে, হাশরের দিন মানুষ আদম (আ.)-এর কাছে যাবে এবং তাকে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ (শাফাআত) করতে বললে, তখন তিনি বলবেন, "আমি আল্লাহর আদেশ অমান্য করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছি, কাজেই আমি সুপারিশ করতে পারবো না।"

১২। বাদাবী, জামাল আল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬-৩০৭।

১৩। নায়েক, ডা. জাকির, *ইসলামে নারী অধিকার, জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ*-৪, পিস পাবলিকেশন, ঢাকা, পৃ. ২০

১৪। বাদাবী ড. জামাল আল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২।

১৫। *আল-কুরআন*, সূরা নিসা, আয়াত ১২৪।

১৬। *আল-কুরআন*, সূরা আন-নাহল আয়াত ৯৭।

১৭। *আল-কুরআন*, সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১৯৫।

১৮। বাদাবী, জামাল আল, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৭।

১৯। বানু, ড, ইউ, এ. বি. রাজিয়া আকতর, নারীর অধিকার বাস্তবায়নে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ইত্তেফাক, ৮ মে, ১৯৯০।

২০। 'মহিলাবা দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম' তোরের কাগজ ২৫ নভেম্বর, ১৯৯৪।

২১। Encyclopadia Americana (International Edition), 1969, Vol-19, P-108.

২২। Muslim INstitution, Maurice Gaudefroy Demom my nes (অনুবাদক, জন ম্যাক গ্রেগর) Muslim institutions গ্রন্থে Demombynes লিখেছেন, কুরআনের আইন স্ত্রীকে এমন মর্যাদা দেয়া যা প্রায় সকল ক্ষেত্রে আধুনিক ইউরোপীয় আইনের চেয়েও অগ্রসর।

২৩। *আল কুরআন*, সূরা আন নিসা, আয়াত-৭।

২৪। বাদাবী, জামাল আল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

২৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-১৮।

২৬। নায়েক, ডা. জাকির, ইসলামে নারীর অধিকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

২৭। প্রাগুক্ত, খণ্ড ৬, পৃ.১৪৬।

২৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

২৯। প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৩০। বানু, ড. ইউ. এ. বি. রাজিয়া আকতার, প্রাগুক্ত, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯২

৩১। *সহীহ আল-বুখারী*, ৭ম খণ্ড, ৩য় অধ্যায়, হাদীস নং ৪

৩২। *সহীহ আল বুখারী*, ভলিউম-৭, অধ্যায়-৪৩, নং ৬৯।

৩৩। *সহীহ আল বুখারী*, ভলিউম-৮, অধ্যায়-২, নং ২ ও মুসলিম।

৩৪। নায়েক, ডা. জাকির, প্রাগুক্ত।

৩৫। *আল-কুরআন*, ৯৬:৫।

৩৬। *আল-কুরআন*, ৫:৩৮।

৩৭। *আল-কুরআন*, ২৪:২।

৩৮। বাদাবী, ড. জামাল আল, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩২১।

৩৯। *আল-কুরআন*, ৯:৭১।

৪০। বাদাবী, জামাল আল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২।

৪১। *আল-কুরআন*, ৬০:১২।

৪২। বাদাবী, জামাল আল, প্রাগুক্ত।

৪৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫।

৪৪। প্রাগুক্ত।

৪৫। প্রাগুক্ত।

৪৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮।

৪৭। প্রাগুক্ত।

৪৮। আল-কুরআন, ২:২৮২।

৪৯। *আল-কুরআন*, সূরা আত-তালাক, আয়াত-৬।

৫০। জামে আস সহীহ, ইত্তাফুল, ৭খণ্ড, পৃ. ৭৬।

৫১। প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১।

৫২। ফাতহুলবারী, ২য় খণ্ড, যবেহ ও শিকার অধ্যায়, মুস্তফা আল-হালাবী কায়রো, পৃ.৫১।

৫৩। *ফাতহুল বারী*, ৮ম খ, পৃ. ২২৫।

৫৪। প্রাগুক্ত, ৪ খণ্ড, পৃ. ২০০।

৫৫। প্রাগুক্ত, ৫ খণ্ড, পৃ. ২৭।

৫৬। প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮০।

৫৭। সহীহ ইবনে মাজ, অধ্যায় যাকাত, হাদীস নং ১৪৮৫, ১খণ্ড, পৃ. ৩০৭।

৫৮। সহীহ বুখারী, আততাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ, ৮ খণ্ড, পৃ. ২৯০।

৫৯। সহীহ বুখারী, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩০০।

Dhaka University Institutional Repository

৬০। প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২২।

৬১। *ফাতহুল বারী*, ৮ম খ, পৃ. ৪১৬।

৬২। *ফাতহুল বারী*, ৮ম খ, পৃ. ৪১৪।

৬৩। *ফাতহুল বারী*, ৩য় খ, পৃ. ১২৩।

৬৪। প্রাগুক্ত, ৬ খণ্ড, পৃ. ৪২০।

৬৫। প্রাগুক্ত, ৫ খণ্ড, পৃ. ১৯৯।

৬৬। আবু শুক্কাহ, আবদুল হালীম, রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা, বি.আই.আই.টি, ঢাকা, নভেম্বর, ২০০২, খণ্ড ২, পৃ.৩৭৫-৭৬।

৬৭। *সহীহ বুখারী*, আহকাম অধ্যায়, আনুগত্য পরিচ্ছেদ, পৃ. ২২৯।

৬৮। *ফতহুল বারী*, ১৩ম খ, পৃ. ৩৪।

৬৯। *দুররুল মুখতার*, ৩য় খ, পৃ. ১১৯।

৭০। আবু শুককাহ, আব্দুল হালীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০।

৭১। *আল-কুরআন*, সূরা আন-নাহল, আয়াত- ৯৭।

৭২। হাদীস নং ১৯৭০, ২খণ্ড, পৃ. ২৯০।

৭৩। *আল-কুরআন*, সূরা আন-নিসা, আয়াত- ৩৪।

৭৪। প্রাগুক্ত, খণ্ড ৪, পৃ. ৪১।

৭৫। ইবনে আবেদীন লিখিত, *দুররুল মুখতারের* টীকা, খণ্ড ২, পৃ. ৬৭১।

৭৬। *ফাতহুল বারী*, ১১ খন্ড, পৃ. ৪৪৪।

৭৭। প্রাগুক্ত, খণ্ড ৮, পৃ. ৪৫১।

৭৮। *আল-কুরআন*, সূরা আন-নিসা, আয়াত- ৩৪।

৭৯। প্রাগুক্ত, খণ্ড ১১, পৃ.১১।

৮০। শুককাহ, আবদুল হালীম আবু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬।

৮১। *আল-কুরআন*, সূরা আন-নাহল, আয়াত- ৭২।

৮২। *ফতহুল বারী*, ১১ম খন্ড, পৃ.২৫৬।

৮৩। *সুনানে নাসায়ী*, হাদীস নং ৩০২৬, খণ্ড ২, পৃ. ৩৮০।

৮৪। *আল-কুরআন*, সূরা আর-রূম, আয়াত- ২১।

৮৫। প্রাগুক্ত, খণ্ড ৪, পৃ. ২০০।

৮৬। প্রাগুক্ত।

৮৭। *সহীহ মুসলিম*, প্রগুক্ত, খণ্ড ৩, পৃ. ১১৯।

৮৮। প্রাগুক্ত, খণ্ড ১১, পৃ. ৪৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

৮৯। *আল-কুরআন*, সূরা আল মায়েদা, আয়াত-২।

৯০। *আল-কুরআন*, সূরা আল বাকারা, আয়াত-২২৮।

৯১। *আল-কুরআন*, সূরা আল বাকারা, আয়াত-২৮৬।

৯২। মিশরের জাতীয় উন্নয়ন বিবয়ক মন্ত্রীর বক্তব্য, আল আহরাম, ২৬/১১/১৯৮২ ইং *নারী ও শিশু*, পৃ. ১০।

৯৩। শুককাহ, আবদুল হালীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭।

৯৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮।

৯৫। *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৬, পৃ. ১০৬।

৯৬। শুককাহ, আবদুল হালীম, প্রাগুক্ত।

৯৭। প্রাগুক্ত, খণ্ড ৯, পৃ. ১৯২।

৯৮। শুককাহ, আবদুল হালীম আবু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১।

৯৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২।

১০০। *আল-কুরআন*, সূরা আন-নামল : ৩৩।

১০১। ইবনে তাইমিয়া, *মাজমুয়াতি ফাতাওয়া*, ২৬ খণ্ড, পৃ. ১৮১।

১০২। প্রাগুক্ত, ২৩ খণ্ড, পৃ. ১৮৬-৮৭।

১০৩। প্রাগুক্ত, ২০ খণ্ড, পৃ. ৫৩৮।

১০৪। শুককাহ, আবদুল হালীম অনু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২।

১০৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৬।

১০৬। আল-মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানূন, পৃ. ১৫৫।

১০৭। ইমাম ইবনে তাইমিয়া, *মাজমু'আ ফাতওয়া*, ২৩ খণ্ড, পৃ.১৮৬-১৮৭।

১০৮। ইমাম তাইমিয়া ইবনে, প্রাগুক্ত, ২০ খণ্ড, পৃ. ৫৩৮।

১০৯। গর্ভাচেভ, মিখাইল, *পেরেস্ত্রয়কা*, পৃ. ১৩৮।

১১০। শুককাহ, আবদুল হালীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সঙ্কট এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

৬.১ বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক সঙ্কট, অস্থিরতা ও সহিংসতা

৬.২ বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক সঙ্কট ও নিরাপত্তাহীনতা

৬.৩ সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা

৬.৪ তথ্য সন্ত্রাস ও এর মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক প্রয়াস

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সঙ্কট চলছে। বাংলাদেশ এর বাইরে নয়। বিশ্বের এক অঞ্চলের সাথে আরেক অঞ্চলের যেমন উত্তর এর সাথে দক্ষিণের, এক দেশের সাথে আরেক দেশের উন্নয়নে যেমন বৈষম্য রয়েছে তেমনি বাংলাদেশেও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈষম্য বিরাজ করছে। রয়েছে অনেক সঙ্কট। যদিও কাগজে কলমে উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু বাস্তবে এর প্রতিফলন সামান্যই ঘটে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতেও সুষম উন্নয়ন ঘটেছে কি? বাংলাদেশে কোটিপতির সংখ্যা যে হারে বেড়েছে সে হারে দারিদ্র সীমার উপরের লোকের সংখ্যা বাড়েনি। এক্ষেত্রে কাগজে কলমে উন্নয়নের যে চিত্র দেখানো হয় দেশের প্রকৃত অবস্থা তার চেয়ে অন্যরকম।

৬.১ বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক সঙ্কট, অস্থিরতা ও সহিংসতা

বর্তমান সময়ে বিশ্ব বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক সঙ্কটময় সময় অতিক্রম করছে। সারা বিশ্বেই শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে গঠিত জাতি সংঘ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হচ্ছে। সংক্ষেপে UNO নামক এই সংস্থাটি পাঁচ পরা শক্তির হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে আছে। সারা বিশ্বে তারা গণতন্ত্র, মানবাধিকার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার কথা বলে বিশ্বের যে কোন দেশে অনুপ্রবেশ করছে। ইরাকে পারমানবিক অস্ত্র আছে এই অজুহাত দেখিয়ে তারা ইরাককে ধ্বংস করেছে। এখন সেখানে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার দুটোই সুদূর পরাহত। আমেরিকার অনুপ্রবেশের পূর্বের ইরাক এবং বর্তমান ইরাকের মধ্যে এখন আকাশ পাতাল পার্থক্য। সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে সেখানে সঙ্কট চলছে।

ইরাকের পর যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি পড়ে আফগানিস্তানের উপর। সেখানে তারা ওসামা বিন লাদেনকে ধরার জন্য অনুপ্রবেশ করে এবং সেখানেও রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে সঙ্কট চলছে। সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে আরো সঙ্কটময় অবস্থা বিরাজ করছে। তাদের আসল উদ্দেশ্য যদিও ছিল তৎকালীন ইসলামপন্থী সরকারের উচ্ছেদ করে তাদের তাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা। আর এই তাবেদার সরকার গঠন বেশির ভাগ দেশের রাজনৈতিক সঙ্কটের কারণ। এর কারণেই দেশে দেশে রাজনৈতিক সংঘাত সংঘর্ষ বৃদ্ধি পায়। আর এর বেশির ভাগ ঘটে তৃতীয় বিশ্বের মুসলিম দেশেগুলোতে। এক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ থাকে দুটি ক্ষেত্রে-

ক) তাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করে সংশ্লিষ্ট দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সহিংসতা সৃষ্টি করে তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করা।

খ) এগুলো যেহেতু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলোতে ঘটে তাই এক্ষেত্রে তাদের আর একটি উদ্দেশ্য হলো- ইসলাম ও মুসলিমের ক্ষতি সাধন করা।

এসব ক্ষেত্রে তাবেদার সরকার গঠন অনেক দিক থেকে বেশি সঙ্কট সৃষ্টি করে। এই জটিল সমস্যা দেখা দেয় কোন বিদেশী শক্তির ইচ্ছা আকাংখার কাছে নতি স্বীকারকারি তাবেদার দেশ ও সরকারের সামনে। আধুনিক

Dhaka University Institutional Repository

যুগের এ ধরণের বিদেশী পরাক্রান্ত শক্তি ও তার তাবেদার সরকারের উজ্জ্বলতম উদাহরণ হচ্ছে (অধুনা লুপ্ত) সোভিয়েট আধিপত্যধীন পূর্ব ইউরোপ, মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্তানের অবস্থা। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ অঞ্চল সুয়েজখালে প্রতিরক্ষা ও দখলদারীর অধীন মিশরীয় রাজতন্ত্র এবং অন্যান্য বৃটিশ উপনিবেশের অবস্থাও তদ্রুপ।[১]

এ ধরণের পরিস্থিতিতে সংস্কারকামী দলগুলোর মধ্য থেকে যারা যুলুম ও নির্যাতনের শিকার হয়, তাদের অনেকেই বিদেশী পরাক্রান্ত ও আগ্রাসী শক্তির ধ্বজাধারীও তাবেদার স্বদেশী শাসক দলের বিরুদ্ধে সহিংস পন্থা অবলম্বনে অনুপ্রাণিত হয়। বিদেশী শক্তির শৃঙ্খল মুক্ত হওয়া, যুলুম প্রতিরোধ ও স্বৈরতান্ত্রিক বাধাবিপত্তি দূর করার উদ্দেশ্যেই তারা হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করতে আগ্রহী বা বাধ্য হয়। কিন্তু স্বদেশী তাবেদারদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আক্রমণ চালানোর সময়ে এই যুলুম ও নির্যাতনের আসল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বিদেশী শাসকদের স্বার্থের কোন ক্ষতি সাধণ করতে পারে না। কারণ সেই শক্তি তাদের স্বদেশী শাসকদের কাছ থেকে কাঠামোগতভাবে অনেক দূরে অবস্থিত।[২]

সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী শক্তিরক্ষা থেকে তাবেদার শাসকদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক পন্থা প্রয়োগ করা ভুল। কেননা এ দ্বারা জাতির অভ্যন্তরে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মাঝে সশস্ত্র সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়বে এবং সে পরিস্থিতিতে জাতি বিবদমান পক্ষগুলোর বিরোধ মেটাতে কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে না। পরিণামে এই সশস্ত্র সংঘাত গোটা জাতিকেই দুর্বল করে ফেলবে এবং জাতির উপর বিদেশী শক্তির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য আরো বেশি করে প্রতিষ্ঠা করা ও তার নির্যাতনমূলক সাম্রাজ্যবাদকে পাকাপোক্ত করে নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থ করা অধিকতর সহজসাধ্য হয়ে যাবে। আর এ জন্য তাকে আগের চেয়েও কম শ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে হবে।

বস্তুত শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যকার রাজনৈতিক বিরোধ ও সংঘাত নিরসনের হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বন সর্বাবস্থায়ই অন্যায় ও অবৈধ হয়ে থাকে। হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বনের ফলে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে এবং যাবতীয় যুদ্ধবিগ্রহ ও সংঘাত উভয় পক্ষের জন্য আত্মরক্ষামূলক ও অস্তিত্ব রক্ষামূলক হয়ে দাঁড়ায়। আর যে বিরোধের কারণে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছে, তার সাথেও আর কোন সংস্রব থাকে না। বরং সেই সব বিরোধ অনেক পেছনে নিক্ষিপ্ত হয় এবং বিবেচনাহীন ও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধবিগ্রহ ও সংঘাত সংঘর্ষ থেকে কোন কল্যাণ বা উপকারিতা লাভ হয় না এবং কোন মুক্তি ও সংস্কারের লক্ষ্য ও অর্জিত হয় না। এতে সেই স্বদেশী শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থও উদ্ধার হয় না যারা নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও রাখে না, বরং তারা বিদেশী আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীর ক্রীড়নকে পরিণত হয়। তাদেরকে বিদেশী আধিপত্যবাদী শক্তি নিছক জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার এবং তার উপর ও তার রাজনৈতিক স্বার্থের অপুরণীয় ক্ষতি সাধণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। যে সমস্ত প্রতিরোধ আন্দোলনে এই তত্ত্বটি দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরা জরুরী বলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, তন্মধ্যে ফিলিস্তিনী প্রতিরোধ আন্দোলন অন্যতম। ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষের দমনমূলক পদক্ষেপসমূহের জবাবে হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বন না করাই তাদের কর্তব্য।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই পরিস্থিতি অর্থাৎ দেশীয় শাসক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বিদেশী পরাক্রান্ত শক্তির তাবেদারী ও ক্রীড়নকত্ব বিভিন্ন বিবদমান জাতি ও পক্ষ সমূহের মধ্যকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সাথে সংযুক্ত হয় এবং এর প্রকৃত প্রতিপক্ষ হলো আধিপত্যশীল বিদেশী শক্তি। সুতরাং সংঘাত সংঘর্ষ ও সহিংসতা যদি করতেই হয়, তবে তা করা উচিত বিদেশী শক্তির সাথে পরাজিত স্বদেশী শাসক গোষ্ঠীর সাথে নয়, যারা প্রকৃত পক্ষে অন্যের তাবেদার। এরূপ ক্ষেত্রে যে সংঘাত সংঘটিত হবে, তা আন্তর্জাতিক সংঘাত-সংঘর্ষের নিয়মেই সংঘটিত হবে এবং সহিংস পন্থা প্রয়োগ করতে হবে কিনা, আর করলে কতটুকু করতে হবে, তা বাস্তব পরিস্থিতি ও বৃহত্তর স্বার্থের নিরীখে নির্মিত হবে।

সহিংসতাকে একমাত্র পরাক্রান্ত বিদেশী অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে চালিত করলে ও তার মধ্যে সীমিত রাখলে জাতির ঐক্য ও একাত্মতা সংরক্ষিত হয়, সেই সাথে স্বাধীনতা সংগ্রামে নিয়োজিত মোজাহেদরা একটা আবরণও লাভ করে। একই সঙ্গে জাতীয় সরকার অধিকতর শক্তি ও সমর্থন লাভ করে। এবং কিছুটা অনুশীলন ক্ষমতা ও স্বাধীনতা অর্জন করে, যা পরিণামে মুক্তি, অধিকার ও সম্মান ফিরিয়ে আনতে জাতির শক্তিকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়।

বিদেশী স্বৈরাচারী আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারকর্মীদের পক্ষ থেকে প্রয়োজন অনুপাতে ও পরিস্থিতির দাবি অনুসারে সহিংস তৎপরতা চালানোর অনুমতি থাকলেও ইসলামের আলোকে সহিংসতার অপপ্রয়োগ ও যথেচ্ছা বাড়াবাড়ি বৈধ নয়। শুধুমাত্র শক্তি সামর্থের মাত্রা ও প্রয়োজনের মাত্রা অনুপাতের এবং ন্যায়বিচার বাস্তবায়ন, কল্যাণ লাভ ও ক্ষতি রোধের নিশ্চয়তার ভিত্তিতেই সহিংসতা প্রয়োগ করা যাবে।

এভাবে সহিংসতা সংক্রান্ত মূলনীতিটি এরূপ দাঁড়ায় : স্বদেশী রাজনৈতিক সংগঠন সমূহের মধ্যে সহিংসতা ও শক্তির প্রয়োগ অবৈধ ও নিষ্ফল। পক্ষান্তরে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও প্রতিরোধকামীদের পক্ষ থেকে বিদেশী আগ্রাসী শাসকদের বিরুদ্ধে সাধ্যানুযায়ী ও সম্ভাব্য উপায়ে শক্তি প্রয়োগ করা চলবে না। প্রয়োজনীয় মাত্রার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে, যাতে আগ্রাসী হাতকে হটিয়ে দেয়া, স্বার্থ উদ্ধার করা ও ক্ষতি রোধ করা সম্ভব হয়। এরপর যদি সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষ শান্তিতে ও ন্যায়বিচারের দিকে ঝোঁকে, তাহলে মুসলমানদের ও মযলুমদেরও উচিত হবে তাদের দিকে ঝুঁকে পড়া। সূরা মায়েদার ৮ম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "কোন জাতির সাথে তোমাদের বিদ্বেষপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেই তা যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচার থেকে বিরত থাকতে প্ররোচিত না করে।[৪] সূরা আনফালের ৬১ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, "তারা (প্রতিপক্ষ) যদি শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও তার দিকে ঝুঁকে পড় ও আল্লাহ্র উপর নির্ভর কর। নিশ্চয় তিনি সব কিছু শোনেন ও জানেন।"[৫]

অপরদিকে এ বিষয়টিকেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা দরকার যে, বিবিধ প্রকারের রাজনৈতিক সম্পর্ককে যাতে একাকার করে ফেলা না হয়, সে ব্যাপারে যেমন সতর্ক থাকতে হবে, তেমনি সম্মিলিত স্বার্থের খাতিরে একাধিক দেশ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গড়ে উঠা মজবুত সম্পর্ক যে, অনিবার্যভাবেই এ সব দেশ ও প্রতিষ্ঠানের

Dhaka University Institutional Repository

পারস্পরিক সম্পর্কের উপর আধিপত্য বিস্তারেরই নামান্তর, সে কথাও বিবেচনায় রাখতে হবে। কারণ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ভারত্বের তারতম্য কিংবা আংশিক বা পর্যায়গত বৈপরিত্য- যা কোন কোন স্বার্থের ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে, নিছক রাজনৈতিক সম্পর্কের সাময়িক প্রতিবন্ধকতা ছাড়া আর কিছু নয়। কখনো কখনো তা সম্মিলিত স্বার্থ ও সম্পর্কের জন্য অপরিহার্য হয়েও দেখা দিতে পারে।

মনে রাখতে হবে, শাসক দল ও বিরোধী দলের মধ্যে সহিংসাত ও শক্তি প্রয়োগের পরিণতি এ ছাড়া আর কিছু হয় না যে, গোটা জাতির ঐক্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, জাতির বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক অচল হয়ে যায়, জাতির বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক অচল হয়ে যায়, এবং জাতির ভেতরকার অবস্থার যথার্থ সংস্কার ও সংশোধন ও যুলুম প্রতিহত করার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মনে শক্তি ও সহিংসতা প্রয়োগ সর্বাবস্থায় বিদেশী আগ্রাসী শক্তির স্বার্থ উদ্ধারের সহায়ক হয়ে থাকে। ফলে ঐ জাতির উপর উক্ত বিদেশী শক্তির নিয়ন্ত্রণ আরো কঠোর করা সহজতর হয়ে যায় এবং ঐ বিদেশী শক্তি আপন উদ্যোগে প্রদত্ত সহায়তাক্রমে তার নিকৃষ্টতম ক্ষতি সাধনে সক্ষম হয়।

যে অত্যাচারী বিদেশী শক্তি একটি জাতির মৌলিক স্বার্থের ক্ষতি সাধন করে ঐ জাতির ও তার স্বার্থের ক্ষতি সাধনের কারণে তার নিজের স্বার্থ সুবিধার্থে যদি ক্ষতিগ্রস্থ নাও হয়, তথাপি সে তার ঐ আজ্ঞাবহ জাতি বা তার শাসক মহলের ক্ষয়ক্ষতিকে উপেক্ষাও করতে পারবে না। বরঞ্চ দুর্বল ও পরাধীন জাতিগুলোর শাসক মহলের ভেতরে বিভেদ ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের আগুন জ্বাললে তা হয়তো সমগ্র জাতির অপূরণীয় ক্ষতি সাধান করবে এবং বিরোধী ও শাসক নির্বিশেষে সকলকেই ক্ষতিগ্রস্থ করবে। আর এর ফল দাঁড়াবে এই যে, ঐ জাতির ভেতরে উপদলীয় সংঘাত ব্যাপক আকার ধারণ করবে। এটা বিচিত্র নয় যে এটাই হয়তো আধিপত্যবাদী অত্যাচারী বিদেশী শক্তির লক্ষ্য এবং এর জন্য সে প্রায়ই চেষ্টা চালায়, যাতে সে এই জাতিগুলোর উপর নিজের আধিপত্য ও অত্যাচার অব্যাহত রাখতে পারে।[৬]

সম্ভবত ন্যায়সংগত মানবাধিকার আন্দোলনকে পৃথিবীতে কাজ করার সুযোগ দিলে আন্তদেশীয় ও অভ্যন্তরীণ অত্যাচার আগ্রাসন ও সহিংসতা অনেকাংশে কমে আসতে পারে।

পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলী, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপদেশ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং অতীত ও বর্তমানকালের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত এই শিক্ষা থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানা যায় যে, মুসলিম সমাজে বলপ্রয়োগ ও সহিংসতা বর্জন করাকে কৌশলগত ও ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়, বরং নীতিগত ও বাধ্যবাধতামূলক ব্যাপারে গণ্য করা অপরিহার্য। রাজনৈতিক দল উপদলগুলোর মধ্যে সহিংসতা বর্জনের এই নীতিগত বাধ্যবাধকতা মেনে চললে পরামর্শমুলক রাজনৈতিক পদ্ধতিতে সব ধরণের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিরোধও বিতর্কের অবসানে তা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

মাঝে মাঝে এমন কিছু কিছু পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, যখন মুসলমানদের অনেক শক্তিপ্রয়োগ ও সহিংসতাকে রাজনৈতিক বিরোধ নিস্পত্তির জন্য অপরিহার্য, সফলদায়ক ও আইন সংগত বলে মনে করে। তবে তারা

Dhaka University Institutional Repository

এরজন্য প্রকৃত উপযুক্ত পরিস্থিতি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় না। আর উপযুক্ত পরিস্থিতি চিহ্নিত করতে সক্ষম না হওয়াই সম্ভবত মুসলিম জাতি ও গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে যুগ যুগ ব্যাপী দ্বন্দ সংঘাত, বিভেদ, বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধ চলতে থাকার প্রধান কারণ। অথচ এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপী সংঘাত ও গৃহযুদ্ধ কোন বিরোধেরই চূড়ান্ত নিস্পত্তি করতে সক্ষম হয়নি। বরঞ্চ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলিম জাতি গোষ্ঠী সমূহের শাসন ও ব্যবস্থাপনায় অধিকতর নিপীড়ন, স্বৈয়াচার ও সীমা লংঘনমূলক কর্মকাণ্ড উস্কে দিয়েছে। উস্কে দেয়ার এই ধারা অতীতের ন্যায় বর্তমান কালেও অব্যাহত রয়েছে।

এই সুস্পষ্ট অসতর্কতা ও উদাসীনতা, উপযুক্ত পরিস্থিতি চিহ্নিত করনে অক্ষমতা ও ব্যর্থতা, শোচনীয় ভুলত্রুটি, এবং বিচার বিবেচনার অদক্ষতা যা ইসলামী চিন্তাধারা এবং মুসলিম চিন্তাবিদ ও শাসকদের মনমস্তিষ্কে বিভ্রান্তি ও বিড়ম্বনার সৃষ্টি করেছে, এর প্রধান কারণ ছিল নিত্যনতুন চালেঞ্জের উদ্ভব, পরিবর্তনশীল অবস্থার প্রতিকার, তার চাহিদা ও তাৎপর্য উপলব্ধিতে ব্যর্থতা মুসলিম শাসনাধীন এলাকার ভৌগলিক বিস্তৃতি ও প্রসার এবং বহু সংখ্যক জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব প্রাগৈসলামিক চিন্তাধারা ও উত্তরাধিকার ইসলাম গ্রহণ। এই উপকরণ ও কার্যকারণগুলো ইসলামের বিধিসম্মত ও সর্বব্যাপী দৃষ্টিভংগী ও বিচার বিবেচনা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও বিষয়গুলোকে সর্বব্যাপী মূলনীতির আলোকে পর্যালোচনার সম্ভাবনাকে ক্ষীণ করে দিয়েছে। আর এর অনিবার্য ফল স্বরূপ সর্বস্তরের বিপুল মুসলিম জনতা ও বহু সংখ্যক মুসলিম জাতি গোষ্ঠীর পরিচালনা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকর ও ইতিবাচক ইসলামী পরামর্শ ভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি ভণ্ডল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। অন্যদিকে ইসলামের আংশিক জ্ঞান চর্চার প্রাধান্য প্রাবল্য এবং মুসলিম জনগণের অতীতের কিছু অনৈসলামিক ধ্যানধারণা মানুষের বিচার বিবেচনা ও দৃষ্টিভংগীর অস্বচ্ছতাকে এবং অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতিকে চিহ্নিত করার অক্ষমতা জনিত শূন্যতাকে আরো গভীর করেছে। কোন্ পরিস্থিতিতে শক্তিপ্রয়োগ ও সহিংসতা বৈধ এবং পরিণামে তা দ্বারা সুফল লাভের আশা করা যায়, আর কোন্ পরিস্থিতিতে সহিংসতার প্রয়োগ অন্যায় এবং পরিণামে তাদ্বারা কোন সুফল লাভের আশা করা যায়না- সেটা চিহ্নিত করতে না পারা ও তালগোল পাকিয়ে উভয় পরিস্থিতিকে একাকার করে ফেলার প্রবণতা মুসলমানদের ভেতরে অনেকাংশে বেড়ে গেছে। এ কারণে মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর ভেতরে কিংবা পরস্পর বিরোধী স্বাধীন রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে উদ্ভূত বিরোধের নিস্পত্তির উপায় হিসাবে শক্তি প্রয়োগের স্বার্থকতাও ক্ষীণ হয়ে গেছে।[৭]

এভাবেই বিশ্বে রাজনৈতিক সঙ্কট ও সহিংসতা বাড়ছে। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্র যেমন রয়েছে তেমনি মুসলমানদের অজ্ঞতা, নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতির উপর অনাগ্রহ, বিদেশী সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ প্রভৃতি কারণ দায়ী। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও এক্ষেত্রে সংঘাত ও সঙ্কটকে উস্কে দিচ্ছে। যেমন হান্টিংটন যিনি মুসলিম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকট সৃষ্টি হবে মর্মে একটি বই লিখেছেন। তা সভ্যতায় সভ্যতায় সংকট বৃদ্ধি করছে কি না? সে বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.২ বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক সঙ্কট ও নিরাপত্তাহীনতা

বিশ্ব অর্থব্যবস্থা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি, সমাজবাদী অর্থনীতি কোনটিই মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নে স্থায়ী কোন কল্যাণ আনতে পারে নি। বিশ্ব সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে বিশ্বায়নের কথা বলা হলেও সামগ্রিক বিবেচনায় কোন মতবাদই জন সম্পদের বিশ্বায়নের কথা বলেনি।[৮] বিশ্বায়ন শুধু বাণিজ্য আর শিল্পপায়নেই সীমাবদ্ধ থাকলে সামগ্রিক অর্থে মানব কল্যাণ সম্ভব নয়। বাণিজ্যের ন্যায় মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের জন্য মানবসম্পদের ব্যবহারেও বিশ্বায়ন জরুরী।[৯] বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো এই বিশ্বায়নের কথা বলেই অনুন্নত, উন্নয়নশীল এবং তাদের সাবেক উপনিবেশগুলোতে আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে। ফলে দরিদ্র এই দেশগুলো দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। শিল্পক্ষেত্রে এসব দেশ উন্নতি নয় বরং অবনতির দিকে যাচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিল্প কারখানা দিন দিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিছু লোকের নিকট অর্থের পাহাড় থাকলেও বেশিরভাগ মানুষ দু' বেলা পেটভরে খেতে পারছে না। বর্তমান বিশ্বের বেশিরভাগ রাষ্ট্র এখন আর পুলিশী রাষ্ট্র নয়, বরং কল্যাণ রাষ্ট্রের পরিচয় পুরোমাত্রায় না হলেও কিছু কিছু ধারণ করেছে। তারপরও দরিদ্র জন গোষ্ঠী মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে। এক্ষেত্রে আর্থিক অব্যবস্থাপনা ও সম্পদের অসম বন্টন দায়ী। এই যখন অনুন্নত বিশ্বের অবস্থা তখন উন্নত বিশ্ব যে খুব ভাল অবস্থানে রয়েছে তা নয়। যেমন কয়েক বছর আগেও ই সি বা ই. ইউ ভুক্ত দেশ তাদের চালুকৃত ইউরো মুদ্রা নিয়ে যেমন ভাল অবস্থানে ছিল, বর্তমানে তার অবস্থা ভাল নয়।[১০] এছাড়া অন্যান্য দেশেও চলছে নানা সংকট। এসবের জন্য পুঁজিবাদী কৌশল কি দায়ী নয়?

পুঁজিবাদী শোষণের কৌশলসমূহ

পৃথিবীর উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহ উপনিবেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহসহ বিভিন্ন কায়দায় সম্পদ লুণ্ঠন করে প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয় করেছে, শিল্পোন্নত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে শিল্পজাত দ্রব্য তৃতীয় বিশ্বে অসম বাণিজ্যের মাধ্যমে রপ্তানী করে নতুনতর শোষণ প্রক্রিয়া চালু করেছে। গতানুগতিক অর্থে ঔপনিবেশিক যুগ অনেকাংশে অবক্ষয়িত হলেও পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ নিত্য নতুন কায়দায় তৃতীয় বিশ্বে তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ আজও অব্যাহত রেখেছে। বলা যায় ছদ্মবেশী নয়া উপনিবেশবাদের উদ্ভব হয়েছে। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাদের প্রাক্তন উপনিবেশকে পদানত করে রাখার জন্য নয়া কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করেছে। এসব কৌশলের চরিত্র যথেষ্ট সূক্ষ্ম এবং এর মন্দ দিকগুলো আপাত দৃষ্টিগোচর নয়। কিন্তু এসব লুকানো কৌশলের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী শোষনের মূল মর্মবস্তু ঠিকই অটুট থাকে। এসব কৌশলের মধ্যে পড়ে প্রাক্তন উপনিবেশের কৃষি-ব্যবস্থার বৈপ্লবিক সংস্কার সাধনের বিরোধিতা করা এবং এই ভাবে খাদ্যের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী পরিনির্ভরতা সৃষ্টি, অসম বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদ হস্তান্তর, শর্তযুক্ত সাহায্য প্রদান ও চিরস্থায়ী পরনির্ভরতা সৃষ্টি বহুজাতিক কোম্পানীর পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদের শোষণ, স্থানীয় একচেটিয়ার সঙ্গে অজ্ঞাত, মুৎসুদ্দী শ্রেণী সামন্তচক্র-একচেটিয়া শিল্পপতিদের স্বার্থের ধারক-বাহকদের রাজনৈতিক ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখা ইত্যাদি। এক কথায় বলা যায়–নব্য

Dhaka University Institutional Repository

উপনিবেশবাদের উদ্ভবের ফলে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষণ তার নির্লজ্জ উলঙ্গ প্রত্যক্ষ রূপের পরিবর্তে গোপন, পরোক্ষ ও মিশ্র রূপ ধারণ করেছে। এ শোষণ কৌশলের ফলশ্রুতিতে অনুন্নত-উন্নয়নশীল দেশগুলো পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের শৃংখলে ক্রমশ: বেশি করে আষ্ঠে পৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ছে ও দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে।

পুঁজিবাদী শোষণের কৌশলসমূহ নিম্নরূপ:

১। বিশ্ব সংস্থাসমূহের মাধ্যমে শোষণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব শান্তির প্রয়োজনে গড়ে তোলা হয় জাতিসংঘ। ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ শোষণের উদ্দেশ্যে এক সময় এশিয়া, আফ্রিকা ও অন্যান্য অঞ্চলের বহু দেশকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাদের সাম্রাজ্যের সেই সীমাহীন প্রাসাদ ভাঙতে শুরু করে। এশিয়া ও আফ্রিকায় সৃষ্ট ব্যাপক জণ জাগরণ পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের পতনকে ত্বরান্বিত করে। প্রতিষ্ঠালগ্নে জাতিসংঘের লক্ষ্য উদ্দেশ্য যদিও দৃশ্যতঃ মহৎ ছিল কিন্তু অচিরেই এ বিশ্ব সংস্থার মোড়ল পুঁজিবাদী দেশসমূহ যখন দেখল সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত তাদের সাবেক উপনিবেশগুলোকে শোষণ করতে না পারায় তারা চরম লোকসানের শিকার হচ্ছে, তখন পরোক্ষভাবে দেশগুলোকে শোষণের হাতিয়ার খুঁজতে লাগলো। তাদের এই অসৎ চিন্তার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক পুঁজির ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান: বিশ্ব ব্যাংক (WB), আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (IDA), ইন্টারন্যাশনাল ফাইনান্স কর্পোরেশন (IFC), গ্যাট (GATT) [যা বর্তমানে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নামে পরিচিত], এডিবি ইত্যাদি। এছাড়াও সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত অভিজাত ও ধনী সংস্থা ILO, FAO, UNIDO, UNESCO ইত্যাদির মাধ্যমেও সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে নিবিড় করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা এসব নানা ধরণের নানা রং-এ প্রস্ফূটিত পদ্মের মতো প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে প্রমাণ করতে চায় যে তারা তৃতীয় বিশ্বের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ।[১১]

২। বহুজাতিক কোম্পানীর মাধ্যমে শোষণ

পুঁজিবাদী নয়া উপনিবেশবাদের শোষণ কৌশল বহুজাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠাগুলোর কাজকর্ম থেকে ধরা পড়ে। বহুজাতিক কোম্পানীর পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদের শোষণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। বর্তমানে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর প্রধান বাজারে পরিণত হয়েছে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত উন্নয়নগামী উন্নয়নশীল দেশগুলো। এসব দেশে অস্ত্র থেকে শুরু করে বেবীফুড পর্যন্ত অবাধে উচ্চ মুনাফায় রফতানী করছে বহুজাতিক সংস্থাগুলো। দুনিয়াজোড়া শোষণের থাবা প্রসারিত করার জন্য বহুজাতিক সংস্থাগুলো অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিকেও বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করছে।

বহুজাতিক কোম্পানীরসমূহের কার্যক্রম এবং পুঁজিবাদী দেশসমূহের ভূমিকা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। এ বহুজাতিক কোম্পানীগুলোই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি, রাজনৈতিক শক্তি আবার এ রাষ্ট্রগুলো বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি। গত কয়েক

Dhaka University Institutional Repository

দশকে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। এ বিকাশ ও বিস্তার তাদের অধিকতর মুনাফা, নিয়ন্ত্রণ ও শোষণ নিশ্চিত করেছে।

বহুজাতিক কোম্পানীগুলি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ঢুকে ছলে বলে কৌশলে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। এসব দেশে শ্রমের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। শ্রমের জন্য, সমাজের জন্য পরিবেশ দূষণ থেকে মুক্ত রাখার জন্য যে খরচ হয় তা উন্নত বিশ্বের চাইতে অনেক কম। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে কর অনেক কম। অথচ এখানে মুনাফার হারটি অত্যন্ত বেশি। তদুপরি পুঁজিবাদী বিশ্ব থেকে আগত পুঁজি বিনিয়োগকারীরা অনুন্নত দেশের ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীকে অত্যন্ত দুর্বল, লোভী ও পরনির্ভরশীল মনে করে। এসব দেশের আমলাদের অর্থ, ডিগ্রী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিয়ে বশ করা যায়। তাই তারা এসব দেশের সরকারগুলোকে তেমন গুরুত্ব দেয় বলে মনে হয় না। নানা ছল চাতুরী ও প্রতারণামূলক কলাকৌশল অবলম্বন করে বহুজহাতিক কোম্পানীগুলি একটি অনুন্নত দেশের ব্রাঞ্চের উদ্বৃত্ত অর্থ অনুন্নত দেশের ব্রাঞ্চে পাচার করে। এভাবে তৃতীয় বিশ্বের দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে একই বহুজাতিক কোম্পানী Intra Firni pricing arrangement এর মাধ্যমে স্থানীয় করের বোঝা কমাতে পারে। শুধু তাই নয়, এরা অনুগত সরকারগুলিকে হাজার হাজার একর জমি ইজারা (লীজ) দিতে বাধ্য করে। তারা দেশীয় শাসকদের চাপ সৃষ্টি করে ভালো ভালো জমিগুলি হয় সরাসরি কিনে নিচ্ছে নতুবা দীর্ঘমেয়াদী লীজ নিচ্ছে ফলে জমির দাম বেড়ে যাচ্ছে।

বিশ্ব বাজারে রপ্তানী প্রক্রিয়াটি বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর হাতে চলে পড়ার দরুন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অভ্যন্তরীণ উদ্বৃত্তটি আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলির ব্যবসার দরুণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে চমকপ্রদ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বহুজাতিক কোম্পানীগুলি সাম্রাজ্যবাদীদের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বাড়িয়ে তুলছে। দেশীয় পণ্যের বাজার ক্রমান্বয়েই সংকুচিত হচ্ছে।

মোটকথা সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৈতিক রাজত্বটি বহুজাতিক কর্পোরেশনের মাধ্যমে অতিদ্রুত বেগে বিকাশ লাভ করছে।

গত কয়েক দশকে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো কি ব্যাপক ও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ:

এক. জাতিসংঘের এক সমীক্ষানুযায়ী ১৯৩৮ সালে বিশ্বের বৃহৎ নয়টি তেল কোম্পানী ৪০টি দেশে অপরিশোধিত তেল উত্তোলন ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল। ১৯৬৭ সাল নাগাদ ৯৬ টি দেশে ছড়িয়ে পরে যা ২০০৬ সালে ১৯০টি দেশে বিস্তৃত হয়। ইতোমধ্যে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর উৎপাদিত তেলের সাবসিডিয়ারী পণ্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫১ থেকে ১৪৪২।

দুই. যেসব দেশে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো তাদের ব্যবসা ছড়িয়ে রাখে সেসব দেশকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এসব কোম্পানীকে বিভিন্ন সুবিধা ও নিশ্চয়তা দিতে হয়। কোন জনপ্রিয়

Dhaka University Institutional Repository

জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারও যদি এ ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করে তবে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর স্বপক্ষে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটতেও দেরী হয় না।

তিন. বহুজাতিক কোম্পানীর স্বার্থের পরিপন্থী কোন দলের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা সৃষ্টি হলেও এরা ছলে-বলে কৌশলে তা ঠেকানোর চেষ্ট করে। এ জন্য প্রয়োজন হলে এরা সামরিক বাহিনীকে রাজনীতিতে টেনে আনে। তুরস্কে ১৯৭৯ সালে সামরিক ক্যু (COUP) এবং ১৯৯০ সালে আলজেরিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপে ঐদেশে অবস্থানরত বহুজাতিক কোম্পানীর ভূমিকা ছিল। আর এর মূল লক্ষ্য ছিল তুরস্কে মিল্লি সালাতম পার্টির অগ্রগতি রোধ করা এবং আল জিরিয়ায় ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্টকে নিশ্চিত ক্ষমতা লাভ থেকে হটিয়ে দেয়া।

চার. বহুজাতিক কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষায় পুঁজিবাদী আধিপত্যবাদী দেশগুলোর গোয়েন্দা সংস্থাও তৎপর থাকে। আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ ধরণের ঘটনায় বহুজাতিক সংস্থাগুলোর অংশ গ্রহণেরও প্রমাণ রয়েছে।[১২]

বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর শর্ত

মুক্ত বাণিজ্য এলাকা, রফতানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা হচ্ছে কোন দেশে বহুজাতিক সংস্থার ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ভিত্তি। দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো কোন পুঁজিবাদের পুঁজি বিনিয়োগে এগিয়ে এসেছিল তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে কোম্পানীর কর্মকর্তারা নিজেরাই বলেছেন: আমরা এমন একটি জায়গা চেয়েছিলাম যার একপ্রান্তে থাকবে চীন এবং অন্য প্রান্তে মার্কিন নৌবহর। খুব সহজে সামগ্রী, মানুষ ও অর্থ আনা নেয়া করা যায় এমন জায়গা আমাদের চাই। শ্রমিক সংগঠনগুলোকে বাগে আনতে যেসব দেশের সরকার সক্ষম সেসব দেশেই কেবল আমরা পা দেই।[১৩]

এ থেকেই বুঝা যায় বহুজাতিক কোম্পানীগুলো কেন এশিয়ার এ অঞ্চলে পাড়ি জমিয়েছে। তাদের পুঁজি যাতে বাজেয়াপ্ত বা জাতীয়করণ করা না হয় সে জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও তাদের কাম্য। এ জন্য তারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করে এবং কৃষিতে পশ্চাৎপদতা দূর করার প্রয়োজনে বলিষ্ঠ কোন সংস্কার বা আমূল পরিবর্তনকারী পদক্ষেপ নিতে বাধা দেয়। তাদের ইচ্ছামত সাবসিডি উঠিয়ে নিতে, বর্ধিত সুদের হার নির্ধারণে, সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি এবং ঘাটতি অর্থায়নের সিদ্ধান্ত নিতে সরকারকে বাধ্য হতে হয়। অন্য কথায় বহুজাতিক কোম্পনীকে খুশী করার জন্য সরকারকে যেসব শর্ত পূরণ করতে হয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১) সস্তা শ্রম

২) কাস্টমস শুল্ক মওকুফ

৩) আমদানি বিধি-নিষেধের অনুপস্থিতি

৪) বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার

৫) অসীম মুনাফা সৃষ্টির নিশ্চয়তা

Dhaka University Institutional Repository

৬) দীর্ঘ ট্যাক্স বিরতি

৭) ধর্মঘট বিরোধী নির্যাতন মূলক শ্রম আইন

৮) শতকরা ১০০ ভাগ বিদেশী মালিকানা/কখনো কখনো শর্তসাপেক্ষে যৌথ মালিকানা ইত্যাদি

৯) শ্রমঘন শিল্প স্থাপনের পরিবর্তে পুঁজিনিবিড় শিল্প স্থাপনের তাগিদ।[১৪]

এ শর্তগুলোর মধ্যে সস্তাশ্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর ফলে তাদের উচ্চাহারে মুনাফা নিশ্চিত হয়। এজন্য সস্তা শ্রমের দেশগুলোই বহুজাতিক কোম্পানীসমূহের স্বর্গ। বহুজাতিক কোম্পানীর অবস্থান ও তাদের উচ্চহারের মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য দেশী শিল্প পণ্যসমূহের উপর বেশি শুল্ক আরোপ করা এবং পাশাপাশি বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর পন্যসমূহকে শুল্কমুক্ত করার নিশ্চয়তাও আদায় করা হয়। এছাড়া ট্যাক্স হলিডে দেয়া, করপোরেট ইনকাম ট্যাক্স, ইমপোর্ট ডিউটিজ, প্রপার্টি ট্যাক্স ইত্যাদি থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়া হয় এবং নতুন নতুন আইনগত সুবিধা দিয়ে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর ব্যবসার ক্ষেত্র নিশ্চিত করা হয়।

বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর বহু ধরণের শাখা প্রশাখা থাকে। একই কোম্পানীর অধীনে বিভিন্ন নামে অসংখ্য কোম্পানী ছড়িয়ে থাকে। স্থানীয় কোন এজেন্টের সাথেও যৌথভাবে অনেক সময় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। যার ফলে অনেক সময় বহুজাতিক কোম্পানীকে চিহ্নিত করারও দুরূহ হয়ে উঠে।

বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর শোষণ প্রক্রিয়া চালু থাকার ফলে যে সব ঘটনা ঘটছে তা হচ্ছে:

১. প্রাকৃতিক ও খণিজ সম্পদের উপর বহুজাতিক কোম্পনীগুলের লোভাতুর দৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রন থাকার ফলে এর উত্তোলন, ব্যবহার শিল্পোন্নয়ন ইত্যাদিতে দেশীয় প্রযুক্তি ও দক্ষতার সুষ্ঠু ব্যবহার হয় না।

২. বহুজাতিক কোম্পানীগুলো দেশে স্বাধীন প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সব সময়ই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রের গবেষকদের উল্লেখযোগ্য অংশকে কিনে নেয়ার চেষ্টা করা হয় বিভিন্ন স্কলারশীপ, প্রকল্প ব্যবসা, উচ্চ বেতনের চাকুরী ও বিদেশ সফর ইত্যাদির বিনিময়ে। কিনে নেয়া গবেষকগণ তাড়াটিয়া গবেষক হিসেবে নিষ্ঠার সাথে বহুজাতিক কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষায় কনসালটেন্ট, এ্যাডভাইজার, রিসোর্স পারসন হিসেবে কাজ করেন। সিভিল সমাজ নামে পরিচিত এসব তাড়াটিয়ারা দেশ ও জাতির স্বার্থের প্রশ্নে একেবারে মৌন হয়ে পড়েন। কোন টু-শব্দ নেই, কোন কথা নেই।

৩. দেশীয় প্রচার মাধ্যমকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়।

৪. বহুজাতিক কোম্পানীগুলি মুক্ত বাণিজ্য এলাকায় ভিত্তি গেড়ে বসে। বিকাশোন্মুখ জাতীয় শিল্প তাদের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মুখে নিঃশেষ হয়ে যায়।

৫. বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর শোষণ প্রক্রিয়ায় অর্জিত মুনাফার একটি অংশ দালালরা পেয়ে স্ফীত হয়, দেশে দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক সংকট গভীরতর রূপ নিতে থাকে।[১৫]

নিউ জার্সির স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানী বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থা। স্টান্ডার্ড অয়েল এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় জনসাধারণকে কি পরিমাণে শোষণ করছে তার একটা হিসাব পল ব্যারান ও পল সুইজী[১৬] দিয়েছেন। তারা বলেছেন ১৯৯২ সালে স্টান্ডার্ড অয়েল মোট মূলধনের ৬৭% মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র ও

Dhaka University Institutional Repository

কানাডায় বিনিয়োগ করে। কিন্তু লাভ পায় ৩৪%। অপরপক্ষে মূলধনের ২০% ল্যাটিন আমেরিকায় বিনিয়োগ করে লাভ করে ৩৯% এবং পূর্ব গোলার্ধে মূলধনের ১৩% বিনিয়োগ করে লাভ করে ২৭%। অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশ মূলধন বিনিয়োগ করে লাভ হয় এক-তৃতীয়াংশ আর এক-তৃতীয়াংশ বিনিয়োগ করে লাভ হয় দুই-তৃতীয়াংশ। এর থেকে খুবই স্পষ্ট যে কি পরিমাণ শোষণ স্টান্ডার্ড অয়েল কোম্পানী করছে। আর একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ১৯৯৭ সালে কোলগেট পামওলিভ কোম্পানী যা লাভ করেছিল তার অর্ধেকের বেশি এসেছিল বিদেশ থেকে। এ হল বহুজাতিক কোম্পানীর লাভের বহর। আর বিপুল লাভ মানে বল্গাহীন শোষণ। জেনারেল মোটরস হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৭ সালে এই কোম্পানীর মোট উৎপাদন মূল্য জাতিসংঘের ১৯০টি দেশের মধ্যে ১১২টি রাষ্ট্রের প্রত্যেকের মোট জাতীয় উৎপাদনকে (G.N.P) ছাড়িয়ে গিয়েছিল।[১৭]

৩। অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শোষণ

পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার অন্যান্য সহযোগীরা নয়া সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের সাহায্যে তাদের আধিপত্য ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার বিশাল ভু-খন্ডের উপর স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। পুঁজিবাদী শক্তি প্রথমত: অনুগত সরকার বা মৎসুদ্দি সরকার (Comprador Goverments) গঠনের মাধ্যমে তাদের কাজ হাসিল করে। মুৎসুদ্দি সরকারের কাজ হলো। নয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হুকুম অনুযায়ী চলা। এ সমস্ত সরকারকে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শোষণের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সুবিধাবাদী রাজনৈতিক এলিট, সাবেক সামরিক এলিট ও সাবেক আমলাদের সাথে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গোপন লেনদেন ও যোগাযোগ থাকে। বিশেষ করে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর পরোক্ষ প্রভাবে মুৎসুদ্দি সরকার পরিচালিত হয় এবং প্রতিদানে এরা নানারকম আর্থিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। লাভের ভাগ পায়। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণকে শোষণ করার পথ এরা এইভাবে কন্টকহীন করে। মুৎসদ্দি সরকার যদি কোন কারণে পুঁজিবাদী আধিপত্যবাদীদের মর্জি মত চলতে অস্বীকার করে অথবা সরকারের মধ্যে কোন গোলমাল দেখা দেয় তাহলে কাল বিলম্ব, না করে সে সরকারের পতন ঘটান হয় এবং তার স্থলে নতুন অনুগত সরকারকে ক্ষমতায় বসানো হয়। কিন্তু কোন অবস্থাতেই পুঁজিবাদী বিদেশী শক্তি বা তাদের প্রতিনিধিরা সরাসরি মঞ্চে আবির্ভূত হয় না। দেশের কোন না কোন গোষ্ঠীকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। সরকারের উত্থান-পতন বা সামরিক অভ্যুত্থান একটা অতি সাধারণ ব্যাপার। এই ভাঙ্গা-গড়ার কাজে পুঁজিবাদী মোড়ল দেশের গোয়েন্দা সংস্থা এবং বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে কাজে লাগানো হয়। এরা স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে কোন রকম রাজনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ যেন না ঘটে সেদিকে কড়া নজর রাখে। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে বর্তমানে ইসলামী রেনেসাঁর প্রতি যুব সমাজের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ সমস্ত দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এ ধারণা ক্রমশ গড়ে উঠছে যে দেশ ও জনগণের মুক্তি ও উন্নতির জন্য ইসলামের বাস্তবায়ন অপরিহার্য। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী ইসলামের মুকাবিলায় সভ্যতার

Dhaka University Institutional Repository

সংঘাতের নামে বর্বরতাকে উস্কে দিয়েছে। এরা সুনিপুনভাবে ইসলাম ও মুসলিমদেরকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে।

৪। সাংস্কৃতিক শোষণের কৌশল।

বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদী শক্তিধরদের রণকৌশল হিসেবে সাংস্কৃতিক শোষণ কৌশল এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, Cultural Imperialism বা Cultural Aggression ইত্যাদি পরিভাষাগুলো সমগ্র বিশ্বের একাডেমিসিয়ানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আগ্রাসী সংস্কৃতি হচ্ছে 'A victory without war' আর এই অদৃশ্য যুদ্ধের সৈনিকরা হচ্ছেন পরজীবী সুশীল সমাজ, দেশীয় সাংস্কৃতিক কর্মী, তাড়াটিয়া রাজনীতিবিদ এবং সংশ্লিষ্ট মুৎসুদ্দি ব্যবসায়ী। একটি জাতি তার স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে যে চেতনার বলে, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সে চেতনাকে ভোতা করে দেয়। সংস্কৃতিক আগ্রাসন একটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। যুদ্ধ বা আগ্রাসন তিন ধরণের হতে পারে। একটি সামরিক আগ্রাসন, একটি অর্থনৈতিক আগ্রাসন এবং অপরটি সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এই তিনটিরই উদ্দেশ্য এক, দেশ জয় করা- সেই দেশের উপর আধিপত্য কায়েম করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতা দেখে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ভাবতে লাগল যুদ্ধ ছাড়াই একটি দেশকে কিভাবে কব্জা করা যায়। অর্থনৈতিক শোষণের পথ আবিষ্কার করতে গিয়ে তারা দেখল একটি দেশের স্বাতন্ত্র্যবোধ, অহংবোধ, জাতিসত্তা মুছে দিতে পারলেই চিরস্থায়ীভাবে সেই দেশটিকে পদানত করে রাখা সম্ভব। এই চিন্তার ফলশ্রুতি হিসেবেই আবিস্কৃত হল সাংস্কৃতিক শোষণ কৌশল আর আগ্রাসনের বর্তমান ধারা। এর বাহন বা মূল অস্ত্র হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে প্রচার মিডিয়া এবং সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি প্রকাশের বিষয়বস্তুকে। আন্তর্জাতিক মিডিয়া যা মিডিয়া সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে পরিচিত গরীব ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় খুবই তৎপর মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। উপনিবেশবাদী প্রচার মিডিয়াসমূহ সাংস্কৃতিক কসমোপলিপনিজম, ধর্মের প্রতি অনাস্থা, স্বদেশের প্রতি শিথড়হীন অস্তিত্ব সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিগুলোকে যেমনঃ নাচ, গান, নাটক, সিনেমা, থিয়েটার, সাহিত্য, কবিতা প্রভৃতিকে এমনভাবে ব্যবহার করার কৌশল উদ্ভাবন করে যাতে করে এগুলোর মাধ্যমে প্রান্তদেশের মানুষদের মধ্যে সংস্কারবদ্ধতা, শিকড়হীন অস্তিত্ব, সাংস্কৃতিক কসমোপলিটনিজম, ধর্মের প্রতি অনাস্থা, স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি হীনমন্য বৃত্তিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। অর্থাৎ পুঁজিবাদী নব্য সাম্যাজ্যবাদী শক্তি মিডিয়া শক্তির সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে স্বনির্ভর স্বাধীন দেশের মানুষগুলোর মধ্যে এমন এক ধরণের হীনমন্যতাবোধ সঞ্চার করতে সক্ষম হয় যাতে প্রভুর নির্দেশে মোহাচ্ছন্নের মত তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতিরোধ শক্তি এবং আত্মরক্ষার প্রাচীরটিকে গুঁড়িয়ে দেয়। এটি বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদী আধিপত্যবাদের এক নতুন রণকৌশল। কারণ বর্তমান বিশ্বে স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি জাতিসমূহ এত সচেতন যে একটি কুয়েত আক্রান্ত হলে সমগ্র বিশ্ব তার আজাদীর জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু লেখাপড়া, সাহিত্য সংগীত, নাটক, শিল্পকলা দ্বারা যদি একটি দেশকে জয় করা যায় তাহলে তার আজাদীর জন্য কেউ এগিয়ে আসবে না। তাই পুঁজিবাদী আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক শোষণ-কৌশল ও আগ্রাসনই হচ্ছে সবচেয়ে বিপজ্জনক।

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক শোষণ কৌশল ও আগ্রাসনের কবলেই দেশের অভ্যন্তরে হুহু করে বিদেশী অর্থে প্রতিপালিত বিশেষ গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনীতিতে বিদেশী বংশবদ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর বিরাট অংশ বিদেশী স্কলারশিপ, পদক, খেতাব, পুরস্কার এবং নগদ অর্থপ্রাপ্তির লোভে লালায়িত হয়ে আত্মবিক্রয় করে বিদেশের গোলাম শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে বসে আগামী শক্তির স্বার্থে তারা নিজেদের মেধা নিয়োজিত করে থাকে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটা যুদ্ধ। এই যুদ্ধের শত শত মিসাইল মুসলিম দেশসমূহের নতুন প্রজন্মের ইসলামী চেতনা বিশ্বাসকে চুরমার করে দিচ্ছে।[১৮]

৫। আন্তর্জাতিক অর্থায়নে পরিচালিত সেকুলার এনজিওসমূহ

বর্তমান বিশ্বে কর্মতৎপর সেকুলার এনজিওসমূহ পুঁজিবাদী নব্য সাম্রাজ্যবাদের ভ্যানগার্ড হিসেবে কাজ করছে। দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তারা শোষণের জাল বিস্তার করেছে। এদের আসল এজেন্ডা জনগণের সেবা বা দারিদ্র্য বিমোচন নয়, বরং অন্যকিছু। এরা এক ধরণের সাম্রাজ্যবাদকেই লালন করছে। বড় বড় এনজিওগুলো গড়ে তুলছে বিশাল বাণিজ্য সাম্রাজ্য এবং সুউচ্চ ভবন। চড়া সুদের ব্যবসায় তাদের তৎপরতা নব্য সাম্রাজ্যবাদী শোষণের দিকটিই সুস্পষ্ট করে তোলে। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ক্ষমতাকে পাশ কাটিয়ে সরাসরি এনজিওদের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করছে। সরকারী সাহায্যের পরিবর্তে বেসরকারী পুঁজিপ্রবাহকে বর্তমানে অধিকতর মাত্রায় উৎসাহিত করা হচ্ছে।

পুঁজিবাদী শোষনের অন্যান্য কৌশল

১. অনুন্নত ও উন্নয়ণশীয় দেশে বিশেষ মতলবে শিল্পায়ন অনুমোদন; পুঁজিবাদী শোষকরা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও বিশেষ কৌশলের অংশ হিসেবে শিল্পায়ন অনুমোদন করেছে। কিন্তু তা হতে হবে বিশেষ ধরণের শর্তাধীন। যেমন: মূল পাইলট প্লান্ট কেন্দ্রে রেখে সাব কন্ট্রাক্ট এর ব্যবস্থা করা বা আংশিক প্রক্রিয়াজাতকরণ এর জন্য প্রান্তে শিল্পের শাখা গড়ে তোলা। খনিজ পদার্থ নিষ্কাশন, প্রাথমিক কাঁচামালের অর্ধ প্রসেসিং, শ্রমঘন ও বেশি বিদ্যুৎ এবং শক্তি প্রয়োজন এমন শিল্প পুরোটা বা তার অপারেশনের অংশ বিশেষ পরিবেশ দুষিত হতে পারে এমন সব রাসায়নিক ঔষধ শিল্প ইত্যাদি সবই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষকরা এখন তৃতীয় বিশ্বে স্থানান্তর করতে প্রস্তুত। তবে এসব ক্ষেত্রে তারা মূলত মিশ্র উদ্দ্যোগ এবং বহুজাতিক কোম্পানীর সংগে স্থানীয় পুঁজিবাদী এজেন্টদের সংযুক্ত উদ্যোগের পক্ষপতি।

২. শেয়ার/স্টক মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ

৩. মুদ্রার উপর হামলা (মালয়েশিয়াসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ১৯৯৮ সালে যা হয়েছে)।

৪. অর্থনৈতিক, সামরিক এবং অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা (ইরান, সুদানের ওপর যা চলছে)।

৫. বিশ্বব্যাপী ইসলামবিরোধী ক্রুসেডে মৌলবাদী খৃস্টান, ইহুদী ও হিন্দুত্ববাদীদের একযোগে কাজ করা।

৬. অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শাসক গোষ্ঠী ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য প্রভু পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভর না করেই পারে না। আর অনুন্নত দেশটির আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন হবে কি না, কতটুকু হবে সেটা পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর স্বার্থ দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৭. পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বভোড়া গণমাধ্যমকে (রেডিও, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট চ্যানেল, সংবাদপত্র, সাংস্কৃতিক সংস্থা ইত্যাদিকে) নানা ধরণের আর্থিক ও প্রকৌশলী সাহায্য দিয়ে তাদের ভাবধারা জীবনাচারণ ও আদর্শকে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

৮. পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের দেশে নিয়ে গিয়ে বহু শিক্ষিত ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি এবং অতি অল্প সময়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রি দিয়ে ঐ সব দেশে পাঠিয়ে দেয় তাদের ভাড়াটিয়া হিসেবে কাজ করার জন্য।

পাশ্চাত্যের অধিকাংশ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই বর্তমানে ধর্মান্ধ শাসকগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকেই মুসলিম বিশ্বকে এই নব্য সাম্রাজ্যবাদী এবং ধর্মান্ধ গোষ্ঠী তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

ধর্মীয় বিশ্বাসে নতুনভাবে দীক্ষিত গোঁড়া খ্রিস্টান, উগ্রজাতীয়তাবাদী ইহুদী এবং চরম সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সমন্বয়ে গঠিত মোর্চা বিশ্বব্যাপী তাদের আগ্রাসী তৎপরতা চালানোর তাত্ত্বিক অনুপ্রেরণা লাভ করছে স্যামুয়েল পি হান্টিংটনের তথাকথিত ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন থিওরী থেকে। বিগত এক যুগ ধরে যে সব মুসলিম রাষ্ট্র পুঁজিবাদী মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে তথাকথিত ইচ্ছুকদের মোর্চা দ্বারা আক্রান্ত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে সেই দেশগুলোর ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ করলে শোষণ আগ্রাসন প্রক্রিয়ার একটি পরিষ্কার প্যাটার্ন বিশ্ববাসীর কাছে দৃশ্যমান হয়।[১৯]

সাম্প্রতিক বিশ্ব পরিস্থিতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দ্যোতক নয়। ১৭৭৫ থেকে ১৮২৫ সালের মধ্যে ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহ ইউরোপীয় পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পেরেছিল। কিন্তু দেড়শো বছরের বেশি সময় রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করেও অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন হয়ে উঠতে পারেনি। মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থাও একই রকম। যত দিন ল্যাটিন আমেরিক বা মধ্যপ্রাচ্য খনিজ তেল ও কাঁচামাল সমৃদ্ধ থাকবে ততদিন পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে মুক্ত হতে পারবে না। নব্য সাম্রাজ্যবাদ বা নব্য উপনিবেশবাদ যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে শোষণের নিত্য নতুন কৌশল বের করবে। এছাড়াও পুঁজিবাদের মধ্যেই এর সংকটের কারণ নিহিত আছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যত রকম কলাকৌশলের আশ্রয় হোক না কেন সংকট থেকেই যাবে। তাই বলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শাসক ও শোষক গোষ্ঠী শোষণের কলাকৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগের কখনোই শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দেবে না। মানুষের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভক্তির মাধ্যমে মানবিক সংহতি নষ্ট করে জনে জনে প্রতিহিংসামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক ও নৈতিক এবং তার ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টির মুনাফা কামানোই তাদের শোষণ কৌশলের অংশ। যুদ্ধবাজ মুনাফা কমাতে ব্যর্থ হলে, যুদ্ধাবস্থা মুনাফা কামাবে। পুঁজিবাদী নব্য সাম্রাজক্যবাদের নব নব কৌশলের কাছে যেন বিশ্ববাসী জিম্মি হয়ে গেছে। মন্দা ও বিশ্বব্যাপী সামাজিক ঘৃণা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে পুঁজিবাদীরা শেষ পর্যন্ত খ্রিস্ট সাম্রাজ্যবাদকে ব্যবহার করা শুরু করেছে। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের ধাক্কা দেয়ার সময় হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অভ্যন্তরীণ সংকট কাটাতে যে যুদ্ধ পরিকল্পনা পুঁজিবাদীরা কৌশল হিসেবে নিয়েছে সেটি মানবিক ঐক্যের মাধ্যমে প্রতিহত করা এবং অমানবিক জঙ্গীভাব পরিহার করে নিয়মতান্ত্রিকপন্থায় পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের মুনাফা সংগ্রহের কৌশলকে অকার্যকর করার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির নিয়ত বিস্তারকে রুদ্ধ করতে হবে।

সুতরাং পুঁজিবাদী বিশ্বের তৈরি বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন তাদের শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বিশ্বে অর্থনৈতিক সংকট ও অস্থিরতা তৈরি করছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ইসলামের প্রকৃত ও সঠিক অনুসরণই পারে বিশ্বকে অর্থাৎ মুসলিম বিশ্বকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছলতা ও স্থিতিশীলতা এনে দিতে যা এর পূর্বের অধ্যায়গুলোতে আলোচিত হয়েছে।

৬.৩ সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা

অর্থনৈতিক ও রাজনীতি যেখানে সমাজের মূল চালিকাশক্তি সেখানে এ দুটির জন্ম দেয়। বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্ব নিজেদের স্বার্থের বাইরে অন্যকাউকে তারা দেখে না। ফলে বিশ্বের অর্ধেকের বেশি দরিদ্র জনসংখ্যার জীবনে সকল ক্ষেত্রে নিরাপত্তহীনতা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না। দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের জীবনে রোগ, শোক, দুঃখ, জরাজীর্ণতা প্রভৃতি নিয়ে বেঁচে থাকবে। ধনী দেশগুলোতে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা দেখা যায়। সেখানে বৃদ্ধাবস্থায় বৃদ্ধাশ্রমই ভরসা। যদিও এক্ষেত্রে ইসলামের রয়েছে সুন্দর দিক নির্দেশনা। বিশ্ব মুসলিম দরিদ্রতা ও অভাব সহ্য করতে পারে না। কুরআনে দারিদ্র ও অভাবকে "শয়তানের প্রতিষ্ঠান" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এহেন অনগ্রসরতা ও দারিদ্রের করাল গ্রাস থেকে মুসলমানদের মুক্তি পেতে হলে কঠোরভাবে সূচীবদ্ধ কাজে অংশগ্রহণে উদ্যোগী হতে হবে। প্রাথমিকভাবে পেশাগত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠন থেকে গ্রাজুয়েশন নেয়ার পর তাদেরকে মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োগ করতে হবে। তাদেরকে স্বাস্থ্য সম্মত কাজে নিয়োগ করার সাথে আধুনিক প্রশিক্ষণ ও বর্ধিত ক্ষমতা অর্জনের সুবিধা প্রদান করতে হবে। সে সাথে তাকে তার পরিবার পরিজনের ব্যয় নির্বাহের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ভোগের পর উৎপাদনের যে অংশ অতিরিক্ত থাকবে তা অন্ততঃ বর্তমান বংশধরদের সাধারণ কোষাগারে (কমনওয়েলথ) চলে যাবে, ততদিন পর্যন্ত সমাজ দরিদ্র, অভাব ও নির্ভরশীলতা দূর করে ভবিষ্যতের সকল উম্মাহ্‌র জন্য উন্নত জীবনযাত্রা নির্বাহে প্রচুর মূলধনী সম্পদের ব্যবস্থা করতে না পারে।[২০]

৬.৪ তথ্য সন্ত্রাস ও এর মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক প্রয়াস

সন্ত্রাসবাদ ও সংগঠিত অপরাধ মোকাবেলায় অগ্রগতি সন্ত্রাসবাদ ও সংগঠিত অপরাধের বেশিরভাগই বিশ্ব প্রেক্ষাপটে ঘটছে। বিশ্বায়নের যুগে তথ্য প্রযুক্তির বিরাট উন্নয়নের ফলে ধ্যান-ধারণা, দ্রব্য ও সেবার প্রবাহ বেড়ে যাওয়ার কারণে এ উন্নয়নগুলো সন্ত্রাসী ও সংগঠিত চক্রের অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। তথ্য ও কম্পিউটার জগত বিবিধ অপরাধের সাথে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়েছে। ফলে অপরাধ পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে ঘটতে পারে। আর কম্পিউটার ব্যবহারকারী যে কারো বিরুদ্ধে ঘটাতে পারে। তথ্য প্রযুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংগঠনকারী নির্ধারণ ও আইন বাস্তবায়নের অসুবিধার কারণে অপরাধী মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এসব কঠিন অপরাধের কারণে সকল রাষ্ট্রকে এগুলোর মোকাবেলোয় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়াতে হবে। সন্ত্রাস ও সংগঠিত অপরাধ দমনের জন্য এবং এসব চক্রকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য নির্বাহী কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। সন্ত্রাসবাদ ও সংগঠিত অপরাধ দমনে নিরাপত্তাভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এরপরও বলতে হবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার চেয়ে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় নিম্নবর্ণিতি পদ্ধতিগুলোকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে হবে:

১) সন্ত্রাসবাদ ও সংগঠিত অপরাধ মোকাবেলায় এবং সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সকল রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে।

২) সকল রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থাকে একযোগে অনুন্নয়ন, দারিদ্র ও বঞ্চনাকে মোকাবেলা করতে হবে। এ কারণগুলো সন্ত্রাসবাদী ধ্যান-ধারণা ও বিভিন্ন ধরণের অপরাধ বৃদ্ধির জন্য সহায়ক।

৩) আন্তর্জাতিক বিবাদ ও উদ্বেগ ন্যায়ভিত্তিক ও সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে এবং সকল ধরণের উপনিবেশিক দখলদারিত্ব ও জাতিগত বিভেদ দূর করতে হবে।

৪) মানবাধিকার ও মানব মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। এ অধিকারগুলো ক্ষুন্ন হয় এ অজুহাতে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার ন্যায় সন্ত্রাসবাদ ও সংগঠিত অপরাধ মোকাবেলায় চুপচাপ বসে থাকা যাবে না। [২১]

তথ্য প্রযুক্তি শুধু ক্ষতিকারকই নয় এর সুফল দিকও রয়েছে এবং সুফলতাকে কাজে লাগাতে পারলে তা উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মনে করেন।

পরিশেষে বলতে পারি যে, বর্তমান বিশ্ব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক সংকটময় অবস্থায় রয়েছে। এরজন্য দায়ী মানুষ বিশেষ করে পুঁজিবাদী বিশ্বের মানুষ। আর এর শিকার হলো তৃতীয় বিশ্বের দেশ বিশেষ করে মুসলিম দেশ এবং এক্ষত্রে মুসলমানরাও কম দায়ী নয়। কারণ তারা তাদের নিজস্ব ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ভুলে বিজাতীয় সংস্কৃতি অর্থনীতি ও রাজনীতির প্রতি বেশি নির্ভরশীল। যার কারণে তারা পদে পদে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এরূপ অবস্থায় নৈতিক উন্নয়নই পারে এ ব্যবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে।

তথ্য নির্দেশিকা

১। সুলায়মান, ডা. আবদুল হামীদ আহমাদ, "ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রন" বি.আই.আই. টি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৫৯

২। প্রাগুক্ত।

৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

৪। আল কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত ৮।

৫। আল কুরআন, সূরা আনফাল, আয়াত ৬১।

৬। সুলায়মান, ডা. আবদুল হামীদ আহমাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

৮। নোয়াম, চমস্কি, "বিশ্বায়ন ও উন্নয়নশীল দেশ এর উপর লেখা, দৈনিক ইত্তেফাক, ২০০৬।

৯। আমিন, এম. রুহুল, *ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা সামাজিক প্রেক্ষাপট*, বি.আই.আই.টি, ঢাকা, ।

১০। দৈনিক ইত্তেফাক, আন্তর্জাতিক সংবাদ, ২২-০৫-২০১০ খ্রি.

১১। ইসলাম, মুহাম্মদ, নূরুল, *পুঁজিবাদী শোষণের নানা কৌশল*, পৃথিবী, ফেব্রুয়ারী, ২০০৮, পৃ. ৪০।

১২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

১৩। Transnational Corporation and Export Dipak Nayar, Economic Journal, March 1978.

১৪। ইসলাম, মোহাম্মদ, নূরুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

১৫। প্রাগুক্ত।

১৬। Paul A. Banna and Paul M. Sweezy Monopoly Capital, P-193.

১৭। Modern Capitalism, Moscow, P-231.

১৮। ইসলাম, মুহাম্মদ নূরুল, পুঁজিবাদী শোষণের নানা কৌশল, *মাসিক পৃথিবী*, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ২০০৮, পৃ. ৩৯।

১৯। ১৯৭০-এর দশকের মধ্যে আগের উপনিবেশবাদের বিলুপ্তি ঘটে এবং ২১ শতকে আবারও এই তৎপরতা বিশ্বরাজনীতিতে আবির্ভূত হয়েছে। ইউরোপীয়রা আমেরিকাসহ সমগ্র বিশ্বেই কলোনী স্থাপন করেছিল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সামনে রেখে। এটি সুস্পষ্ট যে পুঁজিবাদী মার্কিন নয়া সাম্রাজ্যবাদ সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছে। আফগানিস্তানে তো এক রকম কলোনী তৈরি হয়েই গেছে। পূর্বতন উপনিবেশবাদী শাসকগোষ্ঠী যেমন স্থানীয় জনগণের মধ্য থেকে নিজেদের পছন্দনীয় প্রতিনিধি বাছাই করে পরোক্ষভাবে শাসন করতো আফগানিস্তান ও ইরাকে একই কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

২০। আমিন, এম. রুহুল, "ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা, সামাজিক প্রেক্ষাপট, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

২১। আমিন, এম. রুহুল, "সন্ত্রাস, সন্ত্রাসবাদ এর মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক প্রয়াস"OIC সম্মেলনের সুপারিশমালা অনূদিত গ্রন্থ- সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম পৃ. ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

সমাস্যা সমাধানে ইসলাম : প্রেক্ষিত মদীনা সনদ

মদীনা রাষ্ট্র ও খলিফাদের শাসনামল

৭.১ বর্তমান সমস্যার প্রকৃতি

৭.২ মদীনা সনদের পটভূমি ও প্রকৃতি

৭.৩ মদীনা সনদে তৎকালীন সমস্যার সমাধান

৭.৪ মদীনা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃতি

৭.৫ খিলাফত-ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা

৭.৬ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা

৭.৭ ইসলামে রাজনৈতিক উন্নয়নের তাত্ত্বিক নির্দেশাবলী : প্রসঙ্গত হযরত আলীর চিঠি

৭.৮ বর্তমান বিশ্ব সমস্যা সমাধানে মদীনা সনদ

Dhaka University Institutional Repository

রহমাতুল্লিল আলামীন মহানবী (সা.) শুধুমাত্র একজন নবীই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একাধারে একজন শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক ও মহান রাষ্ট্রনায়ক। তিনি ছিলেন ধর্ম ও রাষ্ট্র উভয় সংস্থার পরিচালক।[১] তাঁর জীবন সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। গোত্র কলহে লিপ্ত যাযাবর ও মরুবাসী আরববাসীকে অসামান্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাংগঠনিক ক্ষমতা ও একনিষ্ঠতার মাধ্যমে একই সূত্রে গ্রথিত করে সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে তিনি গোড়া পত্তন করেন একটি 'উম্মাহ্' ভিত্তিক রাষ্ট্রের। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শুধুমাত্র আল্লাহর প্রভূত্ব এবং মানুষে মানুষে সাম্য। শিরকের সকল চিহ্ন মূলোৎপাটিত হয়েছিল সমাজের অঙ্গন হতে। অবসান হয়েছিল মানুষের উপর মানুষের প্রভূত্বের। মানুষ স্বাদ পেয়েছিল মুক্তি ও স্বাধীনতার, ফিরে পেয়েছিল মানুষ হিসাবে বিকশিত হবার সকল মৌলিক অধিকার। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আইন ও ন্যায়ের শাসন। শাসক পরিণত হয়েছিলেন জনগণের সেবকে। মানুষের নিরাপত্তা ও মৌলিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল রাষ্ট্র। সমাজে নারীরাও পেয়েছিলেন মর্যাদার আসন। রচিত হয়েছিল ক্রীতদাস ও দাসীদের মুক্তির সোপান। সমাজ হতে শোষণের হাতিয়ার সুদ উচ্ছেদ হয়ে তদস্থলে প্রবর্তিত হয়েছিল জন কল্যাণমুখী যাকাত ব্যবস্থা। ধনী ও দরিদ্রের আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয়েছিল সংকুচিত। মদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছিলেন রসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বয়ং। মহান আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান অবতীর্ণ করতে থাকেন। আর মহানবী (সা.) তাঁর সাথীদের সাথে শূরা বা পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে সেইসব বিধি-বিধান কার্যকর করতে থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল একটি সুন্দর প্রশাসনিক ব্যবস্থা।[২] ঐতিহাসিকদের মতে, মদীনার এই রাষ্ট্রটি ছিল মানব ইতিহাসের প্রথম সাংবিধানিক সরকার এবং সর্বোত্তম জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই এই রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ঘটেছিল মদীনা শহর ছাড়িয়ে আরবের প্রায় ১৯ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে।[৩]

রাষ্ট্র চিন্তার ইতিহাসে মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রটি এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।[৪] শুধু তাই নয় মদীনা রাষ্ট্রের মত এত সুন্দর জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও আছে কি? যেখানকার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এমন ছিল যে, যাকাত বা সাদকা নেওয়ার মত লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। সমাজিক নিরাপত্তার এমনই দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল যে, রাষ্ট্রের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কোন মহিলা অনায়াসে কোন বাধা বিঘ্ন ছাড়াই চলে যেতে পারত। অথচ আজকের বিশ্বে এমন ঘটনা সহসা ঘটে না। বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বে বিশেষত বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে অবস্থা বিরাজ করছে তাতে সকল ক্ষেত্রে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা কতটুকু আছে? এমতাবস্থায় একটি ৮৫% মুসলমানের দেশ হিসেবে ইসলামের সোনালি অতীতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকসহ সকল ব্যবস্থা অনুসরণ করে সুখী সমৃদ্ধ দেশ গঠন সময়ের দাবী। যেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে সুষম মাত্রায়। প্রমাণ হবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ধর্ম কোন বাধা নয় বরং সহায়ক।

৭.১ বর্তমান সমস্যার প্রকৃতি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি মানব জীবন যেমন করেছে গতিশীল, তেমনি দিয়েছে অনেক স্বচ্ছন্দ। কিন্তু মানব জীবন হারিয়েছে তার শান্তি। লোভ ও স্বার্থের বশবর্তী হয়ে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে

Dhaka University Institutional Repository

বেড়েছে সংঘাত ও সহিংসতা। এ দন্দ্ব সংঘাতও আবার কয়েক রকমের হয়ে থাকে। কোনটা ইতিবাচক, কোনটা নেতিবাচক, কোনটা শান্তিপূর্ণ, আর শান্তিপূর্ণ হওয়ার কারণে আলাপ আলোচনা ও অব্যাহত যোগাযোগ তার প্রধান বৈশিষ্ট্য, আবার কোনটা উগ্র ও জংগীবাদী এবং সে কারণে সংঘর্ষ ও সহিংসতায় পরিপূর্ণ।

সভ্যতায় সভ্যতায় এই যে সংঘাত এর মূল উপাদান হলো আধিপত্য, নেতৃত্ব ও অবদানের প্রতিযোগিতায় একে অপরকে পেছনে ফেলার নিরন্তর প্রচেষ্টা।[৫] বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক সম্পর্কে ও বিভিন্ন জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ও জীবন যাপন পদ্ধতিতে সৃষ্ট বিড়ম্বনা ও অচলাবস্থা এ প্রচেষ্টাকে জোরদার ও তীব্রতর করে। কেননা এই বিড়ম্বনা ও অচলাবস্থা অধিকতর শক্তিশালী ও ভারসাম্যের অধিকারী পক্ষকে দুর্বলতার শেষ বিন্দুতে ঠেলে দেয় এবং এর পরিণতিতে সে তার শূন্যতা পূরণ করতে ও অক্ষমতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। দুর্বলতার শেষে বিন্দুতে ঠেলে দেয়ার এ কাজটা কখনো সম্পন্ন হয় শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং প্রভাব বিস্তার আপোষ রফা, পারস্পরিক আদান প্রদান ও লেনদেনের মাধ্যমে সেটা হয়ে থাকে আবার কখনো সে কাজটা হিংসাত্মক পন্থায়, সংঘাত ও সংঘর্ষের মাধ্যমে এবং বল প্রয়োগ আগ্রাসন ও আধিপত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়।

শান্তিপূর্ণ ও আপোষমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে সভ্যতায় সভ্যতায় গঠনমূলক সংঘাতের একটা রূপ, যা সংস্কার, উন্নয়ন, প্রগতি নিশ্চিত করে এবং জ্ঞান পিপাসা জাগ্রত করে। মহান আল্লাহ্ মানবীয় প্রকৃতিতে এই গুণগুলোকে সংরক্ষণ করেছেন এবং মানবীয় প্রকৃতিকে এমনভাবে নির্মাণ করেছেন যে, সে এগুলো অর্জনের আকাঙ্খা পোষণ করতে বাধ্য। সভ্যতায় সভ্যতায় এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা দুনিয়ার সকল জাতি তার প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে এবং সভ্যতাগত প্রশান্ত অর্জনের সংগ্রামে অধিকতর সফল হয়। এর মাধ্যমে তারা তাদের জীবনে কোন না কোন দিক উৎকৃষ্টতর ও অধিকতর কার্যকর পদ্ধতি খুঁজে পায়।

পক্ষান্তরে সভ্যতায় সভ্যতায় ও জাতিতে জাতিতে আগ্রাসনমূলক ও সহিংস সংঘর্ষ সামগ্রিকভাবে সভ্যতার দুর্যোগের বিভিন্ন স্তর ছাড়া আর কিছু নয়। এগুলো মানব সভ্যতার বিড়ম্বনাকে আরো বাড়িয়ে দিতে পারে এবং বিশ্ব মানব সমাজকে অধিকতর ভারসাম্যপূর্ণ সভ্যতার সন্ধানে ও সভ্যতার উৎকৃষ্টতর স্তরে উন্নীত করার প্রচেষ্টায় আরো দীর্ঘকাল নিয়োজিত রাখতে পারে, যা মানব সমাজের জন্য শোচনীয় দুর্ভোগ বয়ে আনবে। সন্দেহাতীতভাবে এর চেয়ে অনেক ভালো এমন গঠনমূলক ও শান্তিপূর্ণ পন্থায় প্রতিযোগিতা করা, যা গঠনমূলক ও ন্যায় সংগত ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং মানবজাতির উন্নতি ও অগ্রগতির চাকাকে অধিকতর সমন্বয় ও সাহসের মাধ্যমে সামনে এগিয়ে দিতে পারে।

আজকাল পাশ্চাত্য ও মুসলিম বিশ্বের দুই সভ্যতার মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে। ভাবখানা এই যে, মুসলিম বিশ্ব ও পাশ্চাত্যের সম্পর্কের ইতিহাসে এটা যেন একটা নতুন বিষয়। অথচ প্রকৃত ব্যাপার

Dhaka University Institutional Repository

এই যে, এই দুই সভ্যতার দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা কয়েক শতাব্দি আগেই শুরু হয়েছে। এটা শুরু হয়েছে ইসলামী সভ্যতার উন্নতি ও সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ ও তার গঠনমূলক, জননন্দিত মুসলিম আধিপত্য ও কর্তৃত্ব লাভের পর থেকে যা পৃথিবীর অধিকাংশ জাতির হৃদয়কে একাত্ম করে নিয়েছিল এবং তাদের সভ্যতাগুলোকে নিজের সভ্যতার সাথে একীভূত করে নিয়েছিল।

উসমানী সাম্রাজ্য ও ইসলামী সভ্যতার কাঠামোগত ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটা ও দুর্বলতা দেখা দেয়ার কারণে পাশ্চাত্য ও মুসলিম বিশ্বের সভ্যতার এই দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা তার শেষ পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদী ও শোষণমূলক নেতিবাচক বলপ্রয়োগ ও আধিপত্যের ভূমিকা পালন করা শুরু করেছে। আর এই অবস্থাটা পাশ্চাত্য শক্তিকে আধিপত্যবাদী আগ্রাসনে প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ করছে, যাতে মুসলিম বিশ্বের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং তাকে পাশ্চাত্যের স্বার্থের সামনে নতি স্বীকার করানো যায়। এ কারণে এই দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা এমন একটা তিক্ত, দীর্ঘস্থায়ী ও নেতিবাচক সামরিক সংঘাতে রূপ নিয়েছিল, যা সহিংস পন্থায় পাশ্চাত্যের আধিপত্য ও কর্তৃত্বকে, তার ফ্যাসিবাদী, জড়বাদী, বর্ণবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে এবং তার বাস্তাববাদী, ভোগবাদী ও নাস্তিক্যবাদী পঁচা নোংরা রীতিনীতিকে মুসলিম জাহানের উপর চাপিয়ে দিতে নিরন্তর সচেষ্ট ছিল।[৬]

উল্লেখিত দুটো সংঘাতমুখর বিশ্ব সভ্যতার এই নেতিবাচক প্রতিযোগিতার প্রকৃতি পাল্টে গিয়ে ইতিবাচকে পরিণত হওয়া অত্যন্ত জরুরী। ইতিবাচকে পরিণত হলে সেই সব মানবীয় বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া সম্ভব হবে, যা মুসলিম বিশ্বকে বস্তুগতভাবে ও পশ্চিমা জগতকে আধ্যাত্মিকভাবে আহত করেছে। উক্ত নেতিবাচক প্রতিযোগিতার ইতিবাচকে পরিণত হওয়া কেবল তখনই সম্ভব, যখন উভয় সভ্যতার মধ্যকার ইতিবাচক উপাদানগুলোর মাঝে পারস্পরিক উদ্বুদ্ধকরণ ও সমন্বয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানব সভ্যতার ইতিবাচক ভারসাম্য ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং এই দুই সভ্যতার বিনির্মাণগত প্রকৃতির নিরীখে এবং উভয়ের অগ্রগতির ইতিহাসের আলোকে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ ও উভয় সভ্যতার মংগল সাধনের লক্ষ্যে সভ্যতার অগ্রগতির এই সংগ্রামটা শান্তিপূর্ণ, ইতিবাচক ও গঠনমূলক উপায়ে পরিচালিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যে আংশিক বস্তুগত শক্তি পাশ্চাত্য বুদ্ধিবৃত্তির হস্তগত, তার জন্য ইসলামের মহাজাগতিক চেতনায় আওতাভুক্ত তাওহীদবাদী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পূর্ণাংগ শক্তি অর্জন একান্ত জরুরী। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পশ্চিমা ও ইসলামী বিশ্বের মাঝে সভ্যতার এই প্রতিযোগিতার ভবিষ্যতের দিকে ইতিবাচক গন্তায় দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন, যাতে তা সংঘাতের নিকটতর হওয়ার পরিবর্তে সংলাপ ও মতবিনিময়ের নিকটতর হয়।

বস্তুত শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা, গঠণমূলক আলোচনা, তামাদ্দুনিক উন্নতি, প্রগতি ও জ্ঞানের অন্বেষণই হচ্ছে ইসলামী সভ্যতার আসল ভিত্তি। মহান আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র গ্রন্থে বলেন: "ইসলামে কোন বল প্রয়োগের অবকাশ নেই।"[৭]

"যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমার উপর আক্রমণ চালায়না এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করে না, তাদের প্রতি সদাচরণ ও সুবিচার করতে আল্লাহ্ নিষেধ করেন না। বরঞ্চ সুবিচারকারীদেরকে

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ ভালোবাসেন। আল্লাহ তো শুধু সেই সব লোকের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা তোমাদের উপর ধর্মের ব্যাপারে আক্রমণ চালায় এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারা অত্যাচারী।" (আল-মুমতাহিনা, আয়াত ৮-৯)

"নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচার, মহৎ আচরণ ও আত্মীয় স্বজনকে সাহায্য প্রদানের আদেশ দেন, আর অশ্লীলতা অন্যায় ও ব্যভিচার করতে নিষেধ করেন। তোমরা যাতে স্মরণ করতে পার, সে জন্য তিনি তোমাদেরকে নিরন্তর উপদেশ দেন।" (আন-নাহল আয়াত: ৯০)

"হে আহলে কিতাব, এমন একটা বাণীর দিকে এস, যার ব্যাপারে, আমরা ও তোমরা একমত। বাণীটি এই যে, আমরা যেন আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো আনুগত্য না করি। তার সাথে আর কাউকে শরীক না করি, এবং আমরা একে অপরকে আল্লাহ্র বিকল্প মনিব হিসাবে গ্রহণ না করি। কিন্তু তারা যদি প্রত্যাখ্যান করে, তবে বলে দাও তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলমান। (আল-ইমরান: ৪৬)

"তোমরা ভালো কাজ ও আল্লাহ্ভীতির সকল কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং গুনাহর কাজে ও অত্যাচারে পরস্পরকে সহযোগিতা করোনা । (আল-মায়েদা, ৪৬) পড় তোমার সেই প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (আল-আলাক: ১)

"বল, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হয়? একমাত্র লোকেরাই তো শিক্ষা গ্রহণ করে। বল, হে আমার ঈমানদার বান্দারা তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যারা পৃথিবীতে সৎ কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। আর আল্লাহ্র জমীন তো প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদেরকে বিনা হিসাবে প্রতিদান দেয়া হয়।" (আয যুমার: ৯-১০)

"বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, তারপর দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন।" (আল-আনকাবুত : ২০)

"আর তিনি আকাশে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব কিছুকেই তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন।" (আল জাছিয়া:১৩)

"হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে ইহলোকেও কল্যাণ দাও, পরকালেও কল্যাণ দাও। আর আমাদেরকে দোজখের আযাব থেকে নিস্কৃতি দাও।" (আল বাকারা:২০১)

"বল, তোমরা কাজ করতে থাক, আল্লাহ্ তার রসূল ও মুমিনগণ তোমাদের কাজ দেখবেন।" (আত-তওবা : ১০৫)

মদীনার সনদ, নাজরানের খৃষ্টানদেরকে দেয়া রসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতিশ্রুতি অগ্নিউপাসক ও তারকাপূজারীদের সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক আহলে কিতাবের মত আচরণ, মুসলমানদের সাথে যারা শান্তিতে থাকতে চায় তাদেরকে যিম্মী তথা চুক্তিবদ্ধ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত অমুসলিম নাগরিক রূপে অভিহিত করন এবং এ কারণে কোন মুসলমান বা অমুসলমানকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও আকিদা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন

Dhaka University Institutional Repository

কিছু গ্রহণে বা বর্জনে বাধ্য করা যায় না, যুদ্ধরত প্রত্যেক মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক বিজয়ী মুসলিম সেনাদলগুলোকে নির্দেশ প্রদান, এসবই ইসলামের সূচনাকাল থেকেই তার সভ্যতাসূলভ শান্তিকামিতা ও ইতিবাচকতা তার উদারতা, তার সংলাপপ্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সমন্বয় প্রীতির উজ্জ্বল উদাহরণ।[৮] বর্তমান আন্তর্জাতিকতার যুগে ইসলামের এই সভ্যতা চেতনা তার শান্তিপূর্ণ, প্রগতিশীল ও সভ্যতাসুলভ বক্তব্যের বদৌলতে এই উত্তরাধিকারের অধিকতর উপযোগী। কেননা এই উত্তরাধিকারকে কাজে লাগিয়ে সে সভ্যতার সংলাপ, মানবসেবামূলক শান্তিপূর্ণ ও প্রগতিমুখী সভ্যতা ও পৃথিবীর বুকে তার খেলাফতের বাণী বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

এই পটভূমিতে আজকের নেতিবাচক ও আধিপত্যবাদী দ্বন্দ-সংঘাতের অবসান ঘটানো যেমন জরুরী, তেমনি পাশ্চাত্য ও ইসলামী সভ্যতার মধ্যকর দ্বন্দ-সংঘাতের পক্ষগুলির নৈতিক ও বস্তুগত শক্তির যথাযথ উপলব্ধি অর্জন এবং পারস্পরিক মত বিনিময়ও অপরিহার্য। এ দ্বারা এই নেতিবাচক দ্বন্দ্ব সংঘাতকে এমন একটা আদান-প্রদান প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা যাচ্ছে, যা ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার, পারস্পরিক সাহায্য ও অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর কাছে সভ্যতার অনুকূল ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

আজকাল যে ধরণের নেতিবাচক দন্দ্ব-সংঘাত চলছে এবং যেভাবে কেউ কেউ এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আগুনে ঘি ঢালছে, তাদ্বারা যুলুম নিপীড়ন ও বেদানাদায়ক ঘটনাবলী ঘটানো, মানবাধিকার লংঘন এবং উভয় সভ্যতায় চলমান সংস্কার আন্দোলন গুলোকে ব্যাহত করা ছাড়া আর কোন লাভ হবে না। তাই নেতিবাচক দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে এমন একটা ইতিবাচক দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে এমন একটা ইতিবাচক আদান-প্রদানে রূপান্তরিত করার এখনই সময়, যার ভিত্তি হবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সংলাপ ও মত বিনিময়, সখ্যতা ও সমমর্মিতা, এবং প্রত্যেক পক্ষের ইতিবাচক উপকরণ দ্বারা উপকৃত হওয়া। এতে করে আজকের এই বিশ্ব পল্লীতে এমন এক নজীরবিহীন মানবিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে, যা অতীতে কখনো হয়নি এবং যা আজকের মত এত সম্ভাবনাময়ও আর কখনো ছিল না।[৯]

জাতিতে জাতিতে ও সভ্যতায় সভ্যতায় ইতিবাচক আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াটা মূলত সভ্যতার অনুকূল ভূমিকা ও ভারসাম্যের উচ্চতর স্তরগুলোর দিকে উঠার প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়। এই প্রতিযোগিতা যখন সংলাপ ও সংগ্রামের শান্তিপূর্ণ উপায় অনুসরণ করে পরস্পরের পরিপূরক ও ইতিবাচক আদান প্রদান প্রক্রিয়ার দিকে এবং মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভাবমূর্তির প্রতি ও তার চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দিকে এগিয়ে যায়, তখন তা বিরাট ইতিবাচক অবদান রাখে।

ইসলামের রয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক মূলনীতি, বিধিমালা, ও সীমারেখা, যা মানবীয় সমাজ ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষার জন্য অপরিহার্য। বিশ্ব প্রকৃতির অন্যান্য অংশের জন্য নিয়ম শৃঙ্খলার প্রয়োজন, তেমনি মনুষ্য সমাজের জন্যও এর প্রয়োজন রয়েছে। নচেৎ তার ধ্বংস অনিবার্য ছিল।

ইসলামের এই সব মূলনীতি জানা বর্তমানে পাশ্চাত্যের জন্যও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কেননা এই মূলনীতিগুলো মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাধীনতার সীমারেখা চিহ্নিত করে, এবং সংরক্ষণ করে মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি সত্তাকে ও তার মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে। আজকের বিশ্বে একমাত্র ইসলামই পাশ্চাত্য জগৎকে সেই বিধিবিধান উপহার দিতে সক্ষম, যা দ্বারা সে তার সভ্যতার ভারসাম্য, সমাজের ব্যক্তিগত ও 'সমষ্টিগত জীবনের ঐক্য ও অবিভাজ্যতা রক্ষা করতে পারে।[১০] ইসলামের যে জটিল ও অকাট্য ঐশী বিধান রয়েছে, যার সমতুল্য ও বিকল্প কোন বিধান পাশ্চাত্যের কাছে নেই, তার মাধ্যমেই সে পাশ্চাত্যকে সেই ভারসাম্যপূর্ণ বিধিবিধান উপাহার দিতে পারে। তাই আজ পাশ্চাত্য জগতে যারা ইসলামী ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্বকে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের দিকে ঠেলে দিতে সচেষ্ট, যাতে তা নেতিবাচক ও আগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করে, তাদের এই চেষ্টা থেকে বিরত হওয়া উচিত। কেননা এ চেষ্টা কখনো সহিংসতাকে বন্ধ বা প্রশমিত করবে না। অনুরূপভাবে তা ইসলামী সভ্যতাকেও ধ্বংস করতে পারবে না। কেননা এ সভ্যতা ছড়িয়ে রয়েছে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে, ইতিহাসের পাতায় পাতায় এবং মানুষের আধ্যাত্মিক চাহিদার মর্মমূলে। সহিংসতা ও বলপ্রয়োগ উস্কে দেয়ার যাবতীয় কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র ইসলামী ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মাঝে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন ও সংলাপের প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্থ করার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভারসাম্যকেই আরো বেশি করে ব্যাহত করবে। উভয় সভ্যতার ইতিবাচক দিকগুলো দ্বারা পরস্পরকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টাকে বাধাগ্রস্থ করার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভারসাম্যকেই আরো বেশি করে ব্যাহত করবে। উভয় সভ্যতার ইতিবাচক দিকগুলো দ্বারা পরস্পরকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টাকে তা আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এই নেতিবাচক প্রচেষ্টা সারা পৃথিবীতে মানুষের দুঃখ, বেদনা, দুর্ভোগ, তিক্ততা ও বিপর্যয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে, দীর্ঘায়িত করবে উভয় সভ্যতার মাঝে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টার মেয়াদকে। ফলে বিশ্ব সভ্যতার প্রত্যাশিত সংস্কার ও সমন্বয় বিলম্বিত হবে। অথচ এই সংস্কার ও সমন্বয় পাশ্চাত্যের ও মুসলিম বিশ্বের স্বার্থকে সমভাবেই উপকৃত, সংরক্ষিত ও নিশ্চিত করতে সক্ষম।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় যে বস্তুগত শক্তি ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতা নিহিত রয়েছে, তা দ্বারা লাভবান হবার জন্য যথাসাধ্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করা মুসলিম চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্য। এভাবে মধ্যপন্থী মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামী সভ্যতা বস্তুগতভাবে তার কার্যকারিতা ও ভারসাম্য পুনর্বহাল করতে সক্ষম হবে। উক্ত ভারসাম্য আভ্যন্তরীণভাবে অর্জন করার জন্য পাশ্চাত্যের সাথে গঠনমূলক সংলাপের ব্যবস্থা করাও মুসলিম চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্য। পাশ্চাত্যবাসীর কাছে ইসলামী সভ্যতার তাওহীদবাদী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ও মতবাদ সমূহ উপস্থাপন করেই তারা এই কর্তব্য পালন করতে পারেন। এই সব মূল্যবোধ ও মতবাদ পাশ্চাত্যের অনেক উপকার ও কল্যাণ সাধন করতে পারে এবং তার মানবিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থতার জন্য অপরিহার্য সামাজিক ভারসাম্য ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করতে পারে। এর অভাবে শুধু পাশ্চাত্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতি নানা রকমের অরাজকতা, সামাজিক বিকৃতি, অপরাধমূলক সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য ও অপরিমেয় অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে চলেছে। আর ভবিষ্যতে এর আরো যে কত বিষময় পরিণাম তাদেরকে ভোগ করতে হতে পারে, তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য এবং তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

Dhaka University Institutional Repository

এই সাথে পাশ্চাত্যের কর্তব্য বস্তুগত ক্ষমতার গর্বে মত্ত হয়ে বলপ্রয়োগ ও আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা না করে এবং ইসলামী সভ্যতাকে শেষ করার ব্যর্থ চেষ্টা থেকে বিরত হয়ে পারস্পরিক সংলাপ ও আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া চালু করা। তার মনে রাখা উচিত যে, ইসলামী সভ্যতা অন্য যে কোন সভ্যতার তুলনায় সেই সব মানবীয় উপাদানে অনেক বেশী পরিমাণে সমৃদ্ধ, যা তার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে। স্বার্থপর ও অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত উগ্রপন্থীরা যুদ্ধে বলপ্রয়োগ, আধিপত্যবাদ ও ধ্বংসের যে আওয়াজ তুলছে পাশ্চাত্য ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে যারা উত্তেজনা ও লড়াই উস্কে দিতে সচেষ্ট, এবং যারা এই উভয় সভ্যতাকে ভারসাম্য ও মানবীয় সভ্যতার সিঁড়ি বেয়ে উচ্চতর স্তরগুলোতে আরোহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে তৎপর, তাদের আহ্বানে পশ্চিমা চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের আর কর্ণপাত করা উচিত নয়।[১১]

বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকামী লড়াই এর পৃষ্ঠপোষকতা বর্তমান যুগে একটা বর্বরোচিত ধৃষ্টতাপূর্ণ, রক্ষণশীল, অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ও অপরিণামদর্শী কাজ, যার অশুভ পরিণাম বিশ্ব সমাজের পক্ষে অসহনীয়। এ ধরণের অবাঞ্ছিত সংঘাতের হোতাদের ও তাদের কুপ্ররোচনাদায়ক আহ্বানের কোন স্থান সমকালীন বিশ্বে নেই। কেননা তাদের আহ্বান মানবতার ধ্বংস, বিপর্যয় ও ক্ষয়ক্ষতির আহ্বান ছাড়া আর কিছু নয়। বুদ্ধিমান মানব গোষ্ঠির পক্ষে এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান না করার কোন যুক্তি নেই।

সুতরাং চূড়ান্ত বিবেচনায় যে বিষয়টা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, যে বিষয়টা জ্ঞানীগুণী বোদ্ধাদের হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য তা হচ্ছে মানব জীবনের মানোন্নয়ন, সমন্বয় ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা এবং জাতিতে জাতিতে ও সভ্যতা সভ্যতায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামী ও পাশ্চাত্য সভ্যতাদ্বয়ের মাঝে পারস্পরিক সংলাপ, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, মত বিনিময়, স্বার্থ বিনিময় ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করা অত্যন্ত জরুরী।[১২] এই বিনিময় অন্যান্য সভ্যতার মধ্যেও হওয়া জরুরী। কেননা এই বিনিময় ও সংলাপ সমকালীন সভ্যতা সমূহের মাঝে প্রত্যাশিত ও প্রয়োজনীয় আদান প্রদান ও সভ্যতায় সভ্যতায় গঠনমূলক প্রতিযোগিতা তদারকীর একমাত্র মাধ্যম ও উপায়। একমাত্র এই উপায়েই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা ও লাভজনকভাবে প্রভাব বলয় সম্প্রসারিত করা সম্ভব।[১৩]

সংঘাত ও সংঘর্ষের এইরূপ বাংলাদেশেও বর্তমান রয়েছে। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে মুসলিম রাষ্ট্র মানেই ইসলামী রাষ্ট্র নয় এবং মুসলিম নাম ধারণ করলেই শুধু মুসলমান হওয়া যায় না। বরং এর জন্য প্রয়োজন ইসলামী বিধি-বিধান অর্থাৎ আল-কুরআন ও আল-হাদীস এর শিক্ষা অনুযায়ী জীবন পরিপূর্ণভাবে গঠন। আমাদের দেশে প্রকৃত মুসলমানের সংখ্যা নেহাতই খুব কম। ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে চলছে দূরাবস্থা ও অব্যবস্থাপনা।

বৃটিশরা যখন বাংলাসহ ভারতবর্ষ ঘেরাও করে, তখন এ অঞ্চলের শিল্প কৃষি যতটা সমৃদ্ধশালী ছিল; বর্তমানে সে তুলনায় যেমনটি হওয়ার কথা তেমনটি হয় নাই। পক্ষান্তরে ইউরোপ এগিয়েছে অনেক বিশেষ করে বস্তুগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে। প্রকৃত উন্নয়ন যদিও হয় নাই। এক্ষেত্রে আমাদের দেশের এ অবস্থার জন্য দীর্ঘদিনের

Dhaka University Institutional Repository

উপনিবেশিক শাসনকে দায়ী করা হয়। এটি একমাত্র না হলেও একটি এবং এর সাথে রয়েছে আমাদের দেশ প্রেমের অভাব। কারণ বিশ্বের অনেক দেশ উপনিবেশিক শাসনের অবসানে নিজের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করতে পেরেছে। যেমন-ভিয়েতনাম। দেশপ্রেম ছাড়াও আমাদের দেশে জাতীয় সংহতির সমস্যা, নৈতিক উন্নয়নের অভাব প্রভৃতি রয়েছে। বর্তমানে ধর্ম-নিরপেক্ষ সমাজও ন্যায় ভিত্তিক উন্নয়নের প্রত্যয় নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে তবে তারা নৈতিক উন্নয়নের জন্য তেমন গুরুত্ব প্রদান করে না। কিন্তু নৈতিক উন্নয়ন ব্যতীত ন্যায় ভিত্তিক বস্তুগত উন্নয়ন কোন সমাজেই সম্ভব নয়।[১৪]

৭.২ মদীনা সনদের পটভূমি ও প্রকৃতি

বর্তমানে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে যে সমস্যা চলছে তেমনি সমস্যা সংকুল ছিল তৎকালীন আরব। আর সেই সমস্যা সংকুল আরব ভূখন্ডে শান্তির সুবাতাস বইয়েছিলেন যিনি তিনি হলেন মানব শ্রেষ্ঠ মহামানব ইসলামের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রসূল মুহাম্মদ (সা.)। তিনিই বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তি (International Maghnacharta) সম্পাদন করে মদীনায় ইসলামী সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।[১৫] তাই ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে মহানবী (সা.)-এর সময়কালীন আরবের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

মহানবীর সময়কালীন আরবের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আল্লাহ্‌র দুই মহান নবী যীশু (হযরত ঈসা আ.) ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন নবীর আগমন ঘটেনি। ইসলামে এই সময়টাকে আইয়ামে জাহেলিয়া বা মূর্খতার যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যা ইসলামী জ্ঞান ও আলোর যুগের বিপরীত। জাহেলী যুগে আরবরা দুই বৃহৎ অংশে বিভক্ত ছিল।[১৬]

মক্কার অভিজাত পরিবারসমূহ কতিপয় নির্দিষ্ট কার্যাদি সম্পাদন করত। এসবের মধ্যে ছিল পর্যটক ও হাজীদের সেবা প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণ। এসকল সেবামূলক কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য তারা মদীনার মধ্যদিয়ে যাতায়াতকারী বাণিজ্য কাফেলার কাছ থেকে কর আদায় করতেন। মহানবী (সা.) এই মরুবাসী বেদুইন ও শহরবাসী আরবদেরকে তাদের নিজ নিজ ধর্ম, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও গোত্রীয় প্রথা অটুট রেখে একই উম্মাহ বা জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত করে সূচনা করেছিলেন একটি এককেন্দ্রিক কল্যাণকামী রাষ্ট্রের।[১৭]

মদীনা রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পটভূমি

মহানবী (সা.)-এর জীবন সাধনার একটি তাৎপর্যপূর্ণ সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত ছিল, মক্কা হতে মদীনায় হিজরত। এই হিজরত উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসকেই শুধু বদলে দেয় নি, ইসলামের বিকাশে একটি বিশেষ পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। মদীনায় আগমনের পর রসূলুল্লাহ্ (সা.) মসজিদ নির্মাণ, মুহাজিরগণের বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সাংসারিক ও পারিবারিক কাজ সমাধা করে সর্বপ্রথমেই মনোযোগ দিলেন দেশের শান্তি রক্ষার প্রতি। বস্তুত এটাই ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের সূচনা। যীশু খ্রিস্টের মৃত্যুর ৬২২ বছর পর, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঐতিহাসিক প্রয়োজনে তাঁর মাতৃভূমি মক্কানগরী ছেড়ে মদীনায় হিযরত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন মদীনায় মুহাযির এবং আনসাররা ছাড়াও অনেক ইয়াহুদী বসবাস করত। তারা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল সে সময়ে মদীনায় প্রধানত: তিন শ্রেণীর লোকের বাস ছিল। যথা: (১) মদীনার আদিম পৌত্তলিক সম্প্রদায়; (২) বিদেশী ইহুদী সম্প্রদায়; এবং (৩) নব দীক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়।[১৮] এদের কারো সাথে কারো আদর্শের মিল ছিল না, বরং তার উপর ছিল দলগত হিংসা ও বিদ্বেষ। এ সকলবিভিন্ন গোত্র এবং ভিন্ন ধর্মের অনুসারী লোকদের মধ্যে শান্তি ও সমঝোতা স্থাপনের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রাথমিকভাবে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তা একখানি দলীলে লিপিবদ্ধ করা হয়। ওটাকেই কিতাব-উর-রসূল বা রসূল (সা.)-এর কিতাব বা দলীল বলা হয়।[১৯] এই দলীলই ইসলামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক মদীনা সনদ নামে পরিচিত। Reuben Levy-এর মতে, এই মদীনা সনদের মধ্যেই নিহিত ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের বীজ।[২০] এই সনদের মাধ্যমেই গোড়াপত্তন হয় ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থার ভীত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞানুযায়ী: একটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রয়োজন হয় চারটি উপাদানের (১) একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ড (২) একটি জনগোষ্ঠী (৩) সার্বভৌম সরকার (৪) জনগণের মধ্যে একাত্মবোধ। মহানবী (সা.) হিযরতের সময় মদীনায় ভূখন্ড এবং জনগোষ্ঠী ছিল, কিন্তু কোন সরকার ছিল না এবং জগণের মধ্যে একাত্মবোধেরও অভাব ছিল। মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক এই কিতাব (সনদ) জারী করার ফলে, তাঁর নেতৃত্বাধীন একটি প্রাতিষ্ঠানিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এছাড়াও সনদের শর্তানুযায়ী, মদীনা রাষ্ট্রে বসবাসকারী সবাই মিলে একই উম্মাহ্ বা জাতিতে পরিণত হয়।[২১] এই উম্মাহ শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে ছিল না, ছিল সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যাপারেও। এতে বুঝা যায় যে, এখানে উম্মাহ শব্দটি নাগরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অপারদিকে এই সনদের (সংবিধান) মাধমে মদীনায় যে প্রাতিষ্ঠানিক সরকার ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটে, মুহাম্মদ (সা.) হয়েছিল সেই সরকারের প্রধান।[২২]

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই সর্বপ্রথম জগতে এই আদর্শ স্থাপন করলেন। তিনি মদীনায় সকল সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোকদের সম্মেলনে যে আন্তর্জাতিক চুক্তি পত্র (International Magnacharta) লিখলেন, সেখানে আনসার মুহাজির এবং অন্যান্য মুসলমানদের পরস্পরের সম্বন্ধ ও স্বত্বাধিকার এবং তাদের সামাজিক সমস্ত বিষয়ের শাসন ও বিচারের ব্যবস্থা প্রথমে লিখেন। এরপর মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে, ইয়াহুদী ও পৌত্তলিকদের মধ্যে এবং এদের প্রত্যেক সম্প্রদায় ও গোত্রের মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ ও স্বত্বাধিকার থাকবে, তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উল্লেখ করা হয়েছিল। এই চুক্তি পত্রে ধর্ম সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়কেই পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল।[২৩] বর্তমান বিশ্বের বিশেষ করে আমাদের দেশের হাজারো সমস্যায় এখন প্রয়োজন এমনই একটি চুক্তির, এমনই একটি রাষ্ট্রের এবং এমনই একটি রাষ্ট্রনায়কের যিনি সকলজাতি, উপজাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পন্ন করে একটি সুন্দর রাষ্ট্র উপহার দিবেন। আর এমন একটি রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বার্ট্রান্ড রাসেল। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছিলেন যে, এই বিশ্ব যদি একটি রাষ্ট্র হত এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) যদি এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হতেন তাহলে বিশ্বে কোন সমস্যা থাকত না। মদীনা সনদের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধারা নিম্নে উল্লেখ করা হলো যা থেকে এই চুক্তির প্রয়োজনীয়তা ফুঠে উঠবে এবং সম্পূর্ণ সনদ পরিশিষ্টে উল্লেখ্য।

Dhaka University Institutional Repository

মদীনা সনদ

মদীনা সনদে ধর্ম সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়কেই পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। যে সমস্ত শর্ত লিখিত হয়েছিল তন্মধ্য হতে কয়েকটি এখানে উদ্ধৃতি করা হলো:

১. মদীনায় পৌত্তলিক, ইয়াহূদী এবং মুসলমান সকলেই এক উম্মৎ (Nation)

২. এই সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত জাতিসমূহ সকলেই ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীন থাকবে, কেউই কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না।

৩. এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত কোন সম্প্রদায় শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে সকলে সম্মিলিতভাবে তা প্রতিহত করবে।

৪. প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মিত্র জাতি সমূহের স্বত্বাধিকারের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

৫. মদীনা আক্রান্ত হলে সকলে মিলে যুদ্ধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের যুদ্ধব্যয় নিজেরা বহন করবে।

৬. উৎপীড়িতকে রক্ষা করতে হবে।

৭. মদীনায় রক্তপাত করা আজ হতে 'হারাম' বলে গণ্য হবে।

৮. দিয়ত বা খুনের বিনিময়পণ পূর্ববৎ বহাল থাকবে।

৯. কোন সম্প্রদায় বাইরের কোন শত্রুর সাথে গোপন ষড়যন্ত্রে যেতে পারবে না।

১০. নিজেদের মধ্যে কেউ বিদ্রোহী হলে অথবা শত্রুর সাথে কোন প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে তার যথাযথ শাস্তি দেয়া হবে এবং সে যদি তার পুত্রও হয়, তবুও ক্ষমা করা যাবে না।

১১. কোন সম্প্রদায় কুরায়শদিগের সাথে কোন প্রকার গোপন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে না, কেউ তাদের কোন লোককে আশ্রয় দিতে পারবে না।

১২. অমুসলমানদের মধ্যে কেউ অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ বলে গণ্য হবে।

১৩. মুহাম্মদ (সা.) এই সাধারণতন্ত্রের প্রধান নির্বাহী নির্বাচিত হলেন। যে সকল বিষয়ের মীমাংসা সাধারণভাবে না হয় সেগুলোর মীমাংসা তাঁর উপর ন্যস্ত করা হল। তিনি আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী মীমাংসা করে দিবেন।

১৪. যারা এই চুক্তি ভঙ্গ করবে তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাৎ।[২৪]

৭.৩ মদীনা সনদে তৎকালীন সমস্যার সমাধান এবং বর্তমান প্রেক্ষিত

ঐতিহাসিক মদীনা সনদ তৎকালীন আরবের সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি অনাগত ভবিষ্যতের জন্যও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। মহানবী (সা.) কর্তৃক সপ্তম শতাব্দীতে রাষ্ট্রগঠনের ঘটনাকে কেউ কেউ ঐতিহাসিক প্রয়োজন বা সে সময়কার পরিস্থিতিজনিত উদ্যোগ বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু এর পেছনে যে যৌক্তিক কারণ ও সুদূর প্রসারী উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, তা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্ট।[২৫] পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে নবী ও রসূলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন শুধু নিজ নিজ সম্প্রদায়কে হেদায়েতের পথে আহ্বান করার জন্য। তাঁরা কেউ কখনও নতুন সমাজ গঠন বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হননি। কিন্তু হযরত

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ (সা.) প্রেরিত হয়েছিলেন বিশ্বের সর্বযুগের সকল মানুষের জন্য রহ্‌মাতুল্লিল আলামীন হিসেবে (আল কুরআন ৩৪:২৮) পূর্বের নবীগণের দায়িত্ব ছিল শুধু মানুষকে সত্য, ন্যায় ও আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথে আহ্বান জানানো। এসকল সাধারণ বিষয় ছাড়াও মহানবী (সা.) কে বিশেষভাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার (আল-কুরআন ৩ : ১১০); মানুষকে সৎকামের নির্দেশ প্রদান ও অসৎকর্ম প্রতিহত করার (আল-কুরআন, ৩: ১১০) এবং মানুষকে অধীনস্থ রাখার সকল ধরণের কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রভুত্বে সবার জন্য সমান মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার।[২৬]

সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা, সৎকর্মের নির্দেশ ও অসৎকর্ম প্রতিহতকরণ এবং মানব মুক্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন সামাজিক কতৃত্বের, অর্থাৎ নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কর্মী সংগঠন ও নেতৃত্ব প্রদানের অধিকার। অতএব, আল্লাহ আনুগত্যের ভিত্তিতে সংগঠিত সমাজে উপরোল্লিখিত দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদন প্রক্রিয়ায় রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামী রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা।[২৭]

সারণী ৭.১ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সচিবালয় ও সম্মানিত সচিবগণ

মহানবী (সা.) (ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রধান এবং প্রধান বিচারপতি)	
দপ্তরসমূহ	**সচিবালয় (মসজিদুন্ নববী) সচিবগণ**
আল্লাহর ওহী (প্রত্যাদেশ) সমূহ লিপিবদ্ধকরণ	হযরত আলী ও হযরত উসমান (রা.) তাঁদের অনুপস্থিতিতে উবাই-বিন-কা'ব ও জবেদ-বিন সাবিত)
যাকাত ও সদকা হতে প্রাপ্ত অর্থ ও সম্পত্তির হিসাব সংরক্ষণ	আল জুহাইম-বিন আলসাত এবং আল জুবাই বিন আল আওয়াম
খেজুর হতে সম্ভাব্য আয়ের হিসাব তৈরি	হুদা'ইফা বিন আল ইয়ামন
জনগণের মধ্যকার যোগযোগ রেকর্ড	আল মুগীরাহ বিন সুআইব এবং আল হাছান বিন নামির
বিভিন্ন গোত্র ও তাদের পানির হিসাব সংরক্ষণ (এছাড়াও এই দপ্তরে আনছার, পুরুষ ও মহিলাদের রেকর্ড রাখা হত)	আবদুল্লাহ্‌ বিন আল আরকাম এবং আলা বিন উখবাহ্‌
রাজন্যবর্গ ও গোত্র প্রধানদের কাছে প্রেরিত চিঠির খসড়া তৈরি	জায়েদ বিন সাবিত এবং আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আকরাম
রাষ্ট্রীয় আয়ের হিসাব সংরক্ষণ	মুয়াকিব বিন আবি ফাতিমা
সিলমোহর সংরক্ষণ	হানজালাহ বিন আল রাবী

উৎস: S.M. Imamuddin, A Political History of the Muslims, Vol. 1, "Prophet and the Pious Caliphs" (Dacca: S.M. Shahabuddin, 1970,) P. 230.

৭.৪ মদীনা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃতি

মহানবী (সা.)-এর রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ধর্ম রাষ্ট্র, সমতা, শ্রম বিভাজন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার উপর গুরুত্বারোপ, পদসোপানীতি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রশাসনিক জবাবদিহিতা, মানবতার বিকাশ, অমুসলিমদের স্বার্থ সংরক্ষণ, মহানবী (সা.)-এর সাংগঠনিক নেতৃত্ব প্রভৃতি এগুলোর থেকে মদীনা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

এগুলোর মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি হচ্ছে শূরা বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে, ওয়া আমরুহুম শু,রা বাইনাহুম অর্থাৎ 'তোমরা নিজেদের মধ্যে কার্য সম্পাদন কর আলাপ আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে'।[২৮] মদীনা রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা ছিল পুরোপুরি গণতান্ত্রিক। যদিও মহানবী (সা.) ছিলেন মুসলিম উম্মাহ্‌র সর্বময় নেতা এবং তাঁর অনুসারীরা তাঁর আদেশ বিনা বাক্যে মেনে চলতেন, তথাপি তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ ও মত বিনিময় করতেন। উদাহরণস্বরূপ, বদরের যুদ্ধের সময় রসূল (সঃ) প্রথমদিকে মুসলিম যোদ্ধাদেরকে বদরের প্রান্তরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাবু খাটানোর নির্দেশ প্রদান করেন। বিষয়টি চূড়ান্তকরণ নিয়ে সাহাবাদের সাথে পরামর্শের সময় জনৈক সাহাবা ভিন্নতর জায়গায় যেখানে পানির ফোয়ারা অবস্থিত, তথায় সেনা ছাউনী সরিয়ে নেবার পরামর্শ দেন যাতে শত্রুপক্ষ পানির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় । পরার্মশটি যুক্তিসঙ্গম মনে হওয়ায় এবং এর উপাকারিতা বিবেচনা করে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তা গ্রহণ করেন এবং মুসলিম বাহিনীকে তাদের ছাউনী পানির ফোয়ারার পার্শ্ববর্তী স্থানে সরিয়ে নেবার নির্দেশ প্রদান করেন। অনুরূপভাবে ওহুদের যুদ্ধের সময়ও অধিকাংশ সাহাবার মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর নিজস্ব মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও মদীনা নগরীর বাইরে গিয়ে শত্রুপক্ষের মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । মহানবী(সঃ)- কে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য উজারা (মন্ত্রীবর্গ)এবং খাত্তাব (সেক্রেটারীগণ) ছাড়াও ছিলেন প্রিয় সহচর বা সাহাবীগণ। হযরত (সঃ) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এভাবে ইসলামী প্রশাসনে জনগণের অধিকার ও অংশগ্রহণ হয়েছিল কার্যত স্বীকৃত। এমনকি, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারে অমুসলিমদের সাথেও পরামর্শ করার নজির রয়েছে।

২) অমুসলিমদের স্বার্থ সংরক্ষণ

অমুসলিমদের সাথে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ চুক্তি ও তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করাটা ছিল মদীনা রাষ্ট্রের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। মহানবী(সঃ) যিযিযার (নিরাপত্তা কর) বিনিময়ে অমুসলিমদের সাথে যে সকল মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন, তার মূল বিষয়বস্তু ছিল:

(ক) তারা অমুসলমানরা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে মুসলমানরা তাদের রক্ষা করবে;

(খ) তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্যকরা হবে না;

(গ) তাদেরকে সকল প্রকার নিরাপত্তা দেয়া হবে;

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্পত্তি অধিকারের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে;

(ঙ) তাদের ধর্ম, ধর্মস্থান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও গীর্জাদির কোন ক্ষতি করা হবে না বা ধর্ম পালনে বাধা প্রদান করা হবে না;

(চ) তাদের কোন নাগরিক অধিকার ক্ষুন্ন করা হবে না ;

(ছ) তাদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী প্রেরণ করা হবে না বা সামরিক বাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করা হবে না; এবং

(জ) ধর্মীয় ও বিচার ব্যবস্থায় তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হবে।[২৯]

বস্তুতঃ

মদীনারাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলমানদের জান-মাল ও ধর্ম পালনে নিরাপত্তা প্রদান এবং তাঁদের সাথে ন্যায়বিচারের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। মহানবী(সঃ) বলেন,"যাদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে কেউ যদি তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করে কিংবা তাদের উপর বহন করার অতিরিক্ত বোঝা (কর) চাপায়, তবে আমি শেষ বিচারের দিনে তাদের জিম্মার পক্ষে ওকালতি করব"।[৩০]

৩) মহানবী (সা.)-এর সাংগঠনিক নেতৃত্ব

হযরত (সঃ)-এর রাষ্ট্র তথা প্রশাসন ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়টির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষিত হয় তা হচ্ছে, তার নেতৃত্বের গুণাবলী। ওয়েবারীয় ধারণামতে তিনি কোন গতানুগতিক (Traditional) নেতা ছিলেন না।এ প্রসঙ্গে Al Buracy বলেন,"He did not assert the right to rule and lead by virtue of his birth or class.[৩১]

কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী, হযরত (সাঃ)-কে কেবলমাত্র আরব জাতির জন্য নয় বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য রসূল বা আল্লাহর বার্তাবাহক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, ওয়ামা আরছালনাকা ইল্লা কা'ফফতান লিন্নাসে বশীরাঊ ওয়ানজিরা অর্থাৎ আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে।[৩২] তার ভেতর ছিল সহজাত নেতার শাশ্বত সকল গুণাবলী। অতএব, তাকে আধ্যাত্মিক (Charismatic) ও আইনগত (Legal) নেতা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তিনি তার মিশনের প্রাথমিক অবস্থায় অনুসারীদেরকে ধর্মীয়,রাজনৈতিক এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে উচ্চ পর্যায়ের যোগ্যতার দ্বারা পরিচালিত করেছিলেন।এ কারণে সারা বিশ্বের মুসলমান হযরত (সঃ) কে তাদের পথ প্রদর্শক, পরিচালিত ও নেতা হিসেবে বিবেচনা করে এবং তার ইন্তেকালের প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পরও তার পথ অনুসরণে ও তার নির্দেশ পালনে সচেষ্ট।একজন মহান নেতা হিসেবে হযরত(সঃ)-এর দক্ষতার কথা বহু লেখক বিভিন্নভাবে বিবৃত করেছেন। তার সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক সামর্থের বর্ণনা দিতে গিয়ে Williarm Hocking বলেন, "মুহাম্মদ (সঃ) এর চিন্তা ও কাজের মধ্যে ছিল অভিন্নতা এবং এই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তার শাসন ব্যবস্থা। তিনি একদিকে ছিলেন আল্লাহর রসূল এবং অন্যদিকে ছিলেন আইন প্রণেতা ও ম্যাজিস্ট্রেট।"[৩৩] সৈয়দ আমীর আলী বলেন,"মুহাম্মদ (সঃ)ইসলামি কমনওয়েলথের প্রধান হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

আবির্ভূত হওয়ার দশ বৎসরের মধ্যে আরব জাতির চরিত্রে এক ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়।সর্বদা কলহ-বিবাদে লিপ্ত দল ও গোত্রসমূহের মধ্যে এক মহান আদর্শের প্রভাবে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় সাফল্য অর্জন ইতিহাসে নজির হিসেবে চির অম্লান থাকবে"[৩৪]। তাঁর এ মহান আদর্শের প্রভাব সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এখনও সমানভাবে বিরাজিত রয়েছে।আর এজন্যইMichael H. Hart বিশ্বে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী ১০০ জন ব্যক্তির মধ্যে হযরত (সঃ)-কে সর্বপ্রথম স্থান দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "He was the only man in history, who was supremely successful on both religious and secular levels"[৩৫]

রসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্র যদিও আধুনিক রাষ্ট্রের ন্যায় সুস্পষ্ট প্রশাসন যন্ত্র ছিল না, তথাপি সে সময়ের প্রেক্ষিতে মহানবী (সা.)-এর প্রশাসনিক ব্যবস্থার যথার্থতা ছিল সন্দেহাতীত। শরীয়া নীতির উপর ভিত্তি করেই এ ধরণের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এবং যার ব্যাপক ভিত্তি ছিল ব্যক্তির মানবিক গুণাবলী যথা সততা, ন্যায়বোধ ও সহানুভূতি। এ প্রসঙ্গে আধুনিক লোক-প্রশাসন চিন্তাধারায় সাম্প্রতিক ধারণার প্রবক্তা আরব লোক-প্রশাসনবিদ আবদেল হাদী বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়ের প্রশাসনিক তত্ত্ব ও প্রয়োগের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। মহানবী (সা.) পৃথিবীতে এক মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। সে কারণে মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠারও একটা মহান উদ্দেশ্য ছিল। আর সেই উদ্দেশ্য হল ইসলাম ও এর আদর্শকে বাস্তাবায়ন করা। তিনি মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কার্যাবলীকে পৃথকভাবে দেখেন নি, বরং একের সঙ্গে অপরকে সম্পর্কযুক্ত করে মানুষকে মহান হবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি জনসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পরামর্শের মাধ্যমে সম্পন্ন করার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ছিলেন সমাজে জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত কর্তৃত্বের সংরক্ষক ও পরিচালক। তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেছিলেন নিজ নিজ প্রশাসনিক দায়িত্ব। সে কারণে মদীনা রাষ্ট্রকে একটি আদর্শ রাষ্ট্র বলা যেতে পারে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে আমীর হাসান সিদ্দিকী মদীনা রাষ্ট্র সম্পর্কে বলেন, "It was a unique welfare state ever disigned by mankind."[৩৬]

Luther Gulick এবং James Pollock নামক আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দু'জন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ ১৯৬২ সালে প্রদত্ত তাদের রিপোর্টে লিখেছেন: ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে আধুনিক সময়ে একটি শক্তিশালী সরকার এবং সুদক্ষ আমলাতন্ত্র গঠনের শ্রেষ্ঠ ভিত্তি।[৩৭] তারা আরো বলেন, "ইসলামী শরীয়া (কুরআন, সুন্নাহ ও ইজতেহাদ) মিশরীয়দেরকে (অতএব সকল মুসলিম দেশসমূহকে) তাদের নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মৌলিক নীতিমালা প্রদান এবং জাতির সার্বিক স্বার্থে নেতৃত্বের গুণাবলীর যথাযথ ব্যবহার ও দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে।[৩৮] কোন মৌলবাদী মুসলিম গবেষক নয়, বরং বিশ্ব বরেণ্য পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের এ সকল উক্তি বিশ্বের নবজাগরিত মুসলিম জাতিসমূহকে হীনমন্যতা পরিহার এবং আত্মবিশ্বাসী হতে অনুপ্রাণিত করবে--এটাই প্রত্যাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

মদীনা রাষ্ট্রের অনুরূপ প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের মধ্য দিয়ে কোন জাতি যদি দেশের রাজনৈতিক উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয় তাহলে এর মধ্য দিয়েই দেশ ও জাতির একাত্মতাবোধ অর্জন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নও করা সম্ভব।

সারণী ৭.২ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা : জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত নির্বাহি বিভাগ

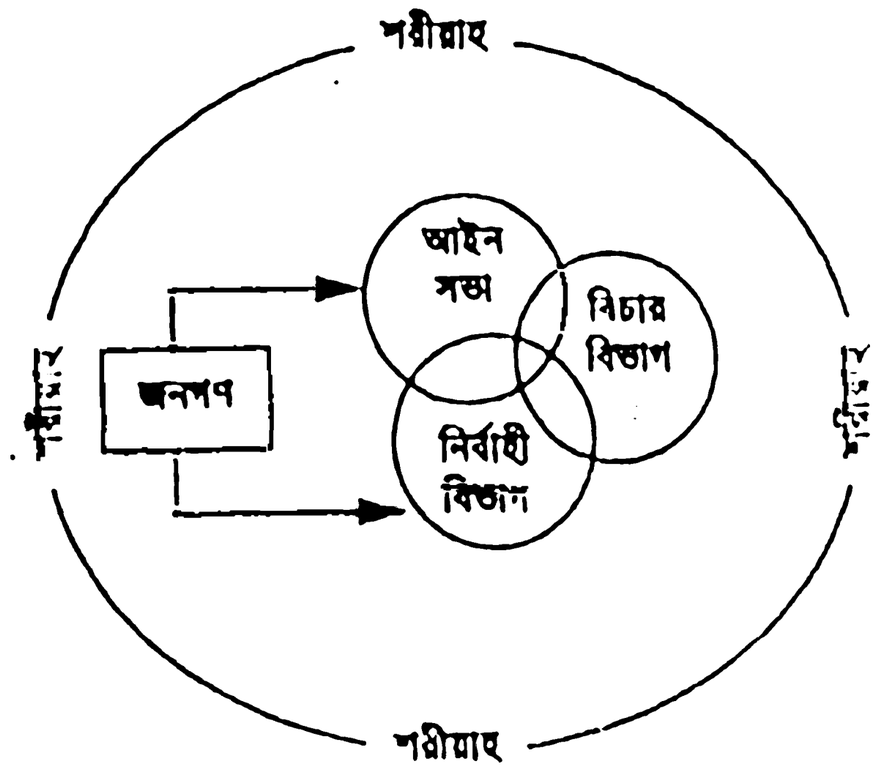

——→ নির্বাচিত করে

- - - -→ মনোনয়ন দান কর

সারণী ৭.৩ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা : পরোক্ষভাবে নির্বাচিত নির্বাহী বিভাগ

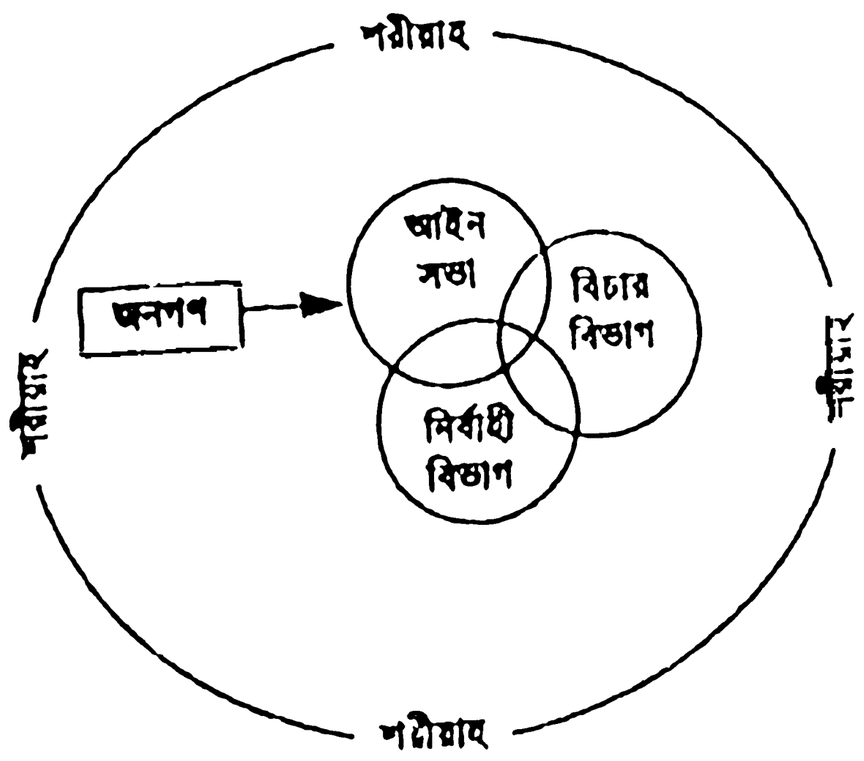

——→ নির্বাচিত করে

- - - -→ মনোনয়ন দান কর

Dhaka University Institutional Repository

৭.৫ খিলাফত: ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা

ইসলাম ধর্মের সাথে রাজনীতি, আইন ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, খলিফাতুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে মানুষের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে- এই গুরুত্বারোপের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঐশী ইচ্ছা ও নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্বসমাজকে সঠিকভাবে গঠন ও রূপদান। ইসলাম ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা অবশ্যই সমর্থক নয়, তবু রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ইসলামে ধর্মব্যবস্থা বাস্তবায়নের বাহন হিসেবে গণ্য করা হয়।[৩৯]

উপনিবেশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন সমূহে ইসলাম মূল ঐক্যশক্তি হিসেবে কাজ করছে এবং বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছে যার প্রেক্ষাপটে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রশ্নটি পুনর্জীবিত ও উত্থাপিত হয়েছে। তখন হতে উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান-সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করেছে যেখানে ইসলামী রাষ্ট্র বিষয়ে ভাবনা, চিন্তা ও বিশদভাবে বিশ্লেষণ হয়েছে; তবু এর প্রকৃতি, ধরণ ও রূপরেখা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অস্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থতা এখনো রয়ে গিয়েছে এবং পাশ্চাত্যের জাতি রাষ্ট্রের ধারণার সাথে প্রায়শই এর তাত্ত্বিক ধারণার বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে।[৪০]

রাষ্ট্র

গ্রীক দার্শনিকগণ প্রথম রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে সুবিন্যস্ত আলোচনার সূত্রপাত করেন। এরিস্টটলের মতে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে রাজনৈতিক জীব, একটি যুথবদ্ধ রাজনৈতিক পরিবেশে বাস করা তার প্রকৃতি, কেবলমাত্র যার মধ্যদিয়ে সে তার সর্বোচ্চ নৈতিক সত্তার বিকাশ ঘটাতে পারে।[৪১] প্লেটো ও এরিস্টটলের মতে সাধারণ কল্যাণ ও নৈতিক পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্র কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক সংগঠন নয় বরং এটা একই সাথে ধর্মীয় সম্প্রদায় সংঘ ও সামাজিকীকরণ সংস্থা হিসাবে কাজ করে-যা সাধারণভাবে ব্যক্তি মানুষের মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনে লিপ্ত থাকে। তাঁরা ব্যক্তিমানুষকে এমন এক সত্তারূপে দেখেছেন যার স্বাভাবিক প্রবণতা শুভের দিকে এবং তাই তারা মানুষের নৈতিক দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাজনৈতিক আবহে মানুষের যুথবদ্ধতার অনুভূতির কথা নৈতিক বিশ্বাসের সাধারণ ঐক্যমতের উপর তারা জোর দিয়েছেন।[৪২]

রাষ্ট্র সম্পর্কে কার্লমার্ক্সসের ধরণা

মার্ক্সের মতে, রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণী স্বার্থ বিরোধ ও শ্রেণী সংগ্রামের ফসল এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী গোষ্ঠী দ্বারা।[৪৩]

ইসলামে রাষ্ট্রের ধারণা

জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা, যার আরবী পরিভাষা হচ্ছে 'দাওলাহ' তা ইউরোপে সার্বভৌমত্বের (সিয়াদাহ) ধারণার মতই সাম্প্রতিক ধারণা ও পরিভাষা। ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তির সাথে জাতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণাটি সম্পৃক্ত এবং সার্বভৌমত্বের ধারণাটি প্রথমত: ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে জীন বডিন (১৫৩০-৯৬খ্রি.) কর্তৃক

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ভাসিত। তাই এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে রাষ্ট্রের পরিভাষাটি যেমন কুরআনে ব্যবহৃত হয়নি তেমনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময়েও এ পরিভাষাটি প্রচলিত ছিল না।[৪৪] প্রথম যুগের ফকিহগণ খিলাফত বা ইমামত শব্দদ্বয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা বুঝাতে ব্যবহার করেছেন। দাওলাহ্ পরিভাষাটি হিজরী সপ্তম শতকের প্রথম দিকে বহুলভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং ক্ষমতাহীন খলিফার নামেমাত্র আনুগত্যশীল মুসলিম রাজবংশ সমূহকে আখ্যায়িত করতে ব্যবহৃত হয়।[৪৫] খিলাফত শব্দের বিকল্প হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্র পরিভাষাটি প্রচলন লাভ করতে আরো আটশতাব্দী পেরিয়ে যায়।[৪৬]

মহানবী (সা.) ও তাঁর খলিফাগণ

মহানবী (সা.)-এর শাসন সম্পর্কে পূর্বে আলোচিত হয়েছে এবং চার খলীফার শাসনও ছিল তার অনুরূপ। কিন্তু মহানবী (সা.) এবং চার খলিফাগণের সময়কার মদীনার আদর্শ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা হতে পরবর্তীকালের শাসন পদ্ধতি অনেকদূরে সরে গিয়েছিল এবং ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। খিলাফতকে কেন্দ্র করে বিচ্যুতি ও বিতর্ক মুসলিম আইনজ্ঞ ও চিন্তাবিদদের লিখনীতে স্থান পেয়েছে। বিচ্যুতি ও পার্থক্য সমূহকে বড় করে দেখাতে গিয়ে পশ্চিমা প্রাচ্যবিদরা অনেক সময় বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে মুসলমান চিন্তাবিদগণ মুসলিম শাসন পদ্ধতির যে সাধারণ ঐক্যভিত্তি অবলোকন করেছেন তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। মুসলিম পণ্ডিতগণ নিশ্চিতভাবে দেখিয়েছেন যে, মদীনার মডেলটি ছিল সর্বোচ্চ আদর্শস্থানীয়; ইসলামী রাজনৈতিক কর্তৃত্বের লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ণভাবে ইসলামের সংরক্ষণ ও শরিয়াহর বাস্তবায়ন, যা আদল ও শুরার ভিত্তিতে সংস্থাপিত; রাজনীতিকে কখনো নৈতিক মূল্যবোধ হতে বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয় এবং রাজনীতি ও ধর্মের মধ্যেও কোন সংঘাত থাকা উচিত নয়। বস্তুতপক্ষে এসব চিন্তাবিদ ও আইনবিশারদগণ রাজনীতিকে ধর্ম ও নৈতিকতা হতে উদ্ভুত প্রয়োজনীয় বর্ধিত অংশ বলে মনে করতেন।[৪৭]

ইসলামী আইন বিভাগ

আমীর কাজ করবেন আইন পরিষদের সাথে পরামর্শ ক্রমে। সমকালীন পণ্ডিতগণ আইন পরিষদকে শুরা, ইজতিহাদ ও ইজমা এর বহিঃপ্রকাশ ও সমার্থক মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হাসান আল তুরাবী খিলাফত ব্যবস্থাকে 'নির্বাচিত পরামর্শক সংস্থা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। পরবর্তীকালে এই মহান প্রতিষ্ঠান বংশানুক্রমিক, স্বৈরাচারী বা বলপূর্বক দখলকারী রূপ পরিগ্রহ করে।[৪৮]

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগ, যা 'কাদা' নামে অভিহিত, নির্বাহী বিভাগ হতে স্বাধীন এবং শরিয়ার কঠোর অনুবর্তিতার মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করা এর কাজ। উলেমা কনভেনশন তাদের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের রূপরেখা এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছে যে বিচার বিভাগ হবে সকল দিক থেকে স্বাধীন যাতে নির্বাহী বিভাগের সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্তভাবে বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা হবে।[৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

সরকার গঠন ও ধরণ

সমকালীন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে একমত যে কুরআন ও সুন্নাহ কোন বিশেষ ধরণের সরকারের রূপরেখা অথবা বিস্তারিত শাসনতান্ত্রিক তত্ত্ব বর্ণনা করেনি। এ হতে মতামত উপস্থাপিত হয়েছে যে ইসলামে রাজনৈতিক সরকার নানা রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, এটা কোন যুগে মুসলমানরা কি ধরণের সরকার চায় তথা যেটি তাদের উপযোগী সেভাবেই মুসলিম জনগণ সরকার গঠন করবে।[৫০]

৭.৬ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা

পশ্চিমা রাজনীতির সাথে ইসলামী রাজনীতির কোন সামঞ্জস্য বা মিল নেই। তবে রাজনীতির অর্থ যদি হয় কল্যাণময় জীবন-যাপন এবং আল্লাহ্‌র পাকের আরাধনা ও সন্তুষ্টি বিধানের জন্য জীবনচর্চা তবে সে রাজনীতি ইসলামের মূল বিষয়।[৫১] যদিও রাষ্ট্র বা রাজনীতি শব্দদ্বয় কুরআনে ব্যবহৃত হয়নি, তবে এর অপরিহার্য যে উপাদানসমূহ একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা গঠন করে, তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আল কুরআনে রয়েছে। এ হতে প্রতীয়মান হয় যে, পরিভাষা না হলেও এ ধারণাগুলো আল-কুরআনে বর্ণিত এবং বোঝান হয়েছে।[৫২] উদাহরণস্বরূপ কুরআনে কতিপয় নীতিমালা বা কার্যবলীর উল্লেখ রয়েছে যা একটি সমাজ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অস্তিত্বের নির্দেশ করেছে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়নের জন্য সংগঠিত কর্তৃত্বের উল্লেখ রয়েছে। এসবের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে এমন শব্দাবলী যেমন 'আহদ' (চুক্তি), 'আমানাহ' (বিশ্বস্ততা), 'ইতায়াহ' (আনুগত্য) এবং 'হুকুম' (কানুন বা বিচার)।[৫৩] যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি স্থাপনের জন্য রয়েছে সাধারণ আইন বা নির্দেশনা। যাহোক, ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা সারণীর মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার চিত্র বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সারণী ৭.৪ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা

নীতিমালা	অর্থ	কুরআনের প্রাসংগিক আয়াত
তাওহীদ	আল্লাহপাকের অবিচ্ছেদ্য অবিতাজ্য ঐশ্বরিকতা	১:২; ৩:১৫৪; ৫:৩৮-৪০; ৬:১০২, ১৬৪; ৭:৩, ৫৪; ১০:৩১; ১২:৪০; ১৩:৩৭; ১৫:৩৬; ৪২:১০; ৪৮:৪; ৫৭:২-৩; ১১২:১-৪;
শরীয়াহ	'পানির প্রস্রবনের দিকের পথ' কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক ইসলামী আইন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা	৫:৪৮; ৭:১৬৩; ৪২:১৩; ২১:৪৫:১৮;৪:৫৮;১৩৫;৫:৩; ৯',৪৫; ৭:২৯; ১৬, ৯০, ১৫২; ৪২:১৫; ৫৫:৯
স্বাধীনতা (হুররিয়াহ)	শরীয়াহ সীমারেখার মধ্যে ব্যক্তি ও সামষ্টিক কল্যাণ লাভের জন্য ব্যক্তি ইচ্ছার প্রবণতা অনুযায়ী কাজ করার স্বাধীনতা	২:২৮৬; ৪:৮০; ১০:৯৯; ১৮:২৮; ৭৪:৩৯, ৫৬; ৭৬:২৯;৮১:২৮
সমতা (মুসাওয়াহ)	ব্যক্তিমানুষের প্রতিভা ও কর্মশক্তি সর্বোচ্চ স্ফুরণের জন্য সমতাভিত্তিক সুযোগ	২:৩০; ৪:১; ৬:১০৪, ১৫১; ১২:৪০'
শুরা	পারস্পারিক পরামর্শ	২:২৩৩; ৩:১৫৯; ৪২:৩৮

উৎস: মোতেন, আবদুল রশিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান: ইসলামী প্রেক্ষিত আবিষ, এম আব্দুল সম্পাদিত, বি. আই. আই. টি. ঢাকা, এপ্রিল, ২০০৮, পৃ.৯৬।

ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কুরআন কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা প্রদান করেছে (সারণী ৭.৪ দ্রষ্টব্য)। প্রথম হচ্ছে তাওহীদ, যার অর্থ ও তাৎপর্য হচ্ছে আল্লাহর অবিচ্ছেদ্য ও অবিতাজ্যঐশ্বরিকতা। এই

Dhaka University Institutional Repository

নীতিমালা স্বকীয় ও নিজস্ব ক্ষমতা, কাউকে কতিপয় বিষয় করা বা না করার নির্দেশ দানের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা থাকা স্বীকার করে না– আদেশদানকারী সে সত্তা 'হবস' বর্ণিত সম্রাট বা আইনগত কাঠামোর 'রাষ্ট্র' যাই হোক না কেন। কেননা কুরআন ঘোষণা করে, 'আদেশ দান করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র' (৬:৫৭)। 'কে এই মহাবিশ্বের প্রভু' (১:১) এবং (কে) হিদায়েত প্রদান করেন' (৮৭:৩)। আল্লাহ্‌র আদেশ ও নির্দেশ মানবজাতির কাছে দু'ভাবে এসেছে: প্রথমত কুরআন, যে ঐশী গ্রন্থ হতে ইসলামের সকল নির্দেশনা ও অধ্যাদেশ সমূহ অনুসৃত। । দ্বিতীয়তঃ শেষ নবী (সা.)-এর আদর্শ জীবনাচরণ বা সুন্নাহ যা কুরআনের সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাদানকারী সূত্র। এ দুয়ের সমন্বয়ে গঠিত শরীয়াহ যা সকল কর্তৃত্বের উৎসমূল।

পরবর্তী নীতি হচ্ছে 'আদালাহ' তথা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, 'যদি তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন এমন কি নিজের বিরুদ্ধেও হয়' (৪:৫৫, ৪:১৩৫)। বিশ্বাসীদের ন্যায়পরায়ণ হতে আদেশ করা হয়েছে, কেননা 'ধর্মপরায়ণতার পরেই ন্যায়পরায়ণতার স্থান' (৩৮:২৪)। নবী-রসূলগণ আগমন করেছেন যাতে মানুষ ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে পারে।' (৫৭:২৫)

আদালাহ হচ্ছে স্বাধীনতা ও সমতা'র দুটি মৌলিক নীতি দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ হচ্ছে ন্যায় ও সুবিচারের মনে একটি অপরিহার্য শর্ত ও পরিবেশ যে, জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের নৈতিক ও শুভ ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক ইচ্ছা ও পছন্দ ঘোষণা করতে পারে এবং বিশ্বাস ও পছন্দমাফিক স্বীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।[৫৪]

কুরআনের বাণী 'লা ইকরাহা ফী আদ-দ্বীন' (২:২৫৬) যার অর্থ 'দীন-ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই।' শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয়ের প্রসঙ্গেই বলা হয় নাই, বরং মানবজীবনের সকল বিষয়ের দিকে এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মানব জীবনকে জোর জবরদস্তির মাধ্যমে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের মত বিষয়কে কুরআন প্রত্যাখ্যান করেছে। ইসলামে যে ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে তা শুধু মুসলমানদের জন্যই প্রযোজ্য নয় বরং ইসলামী রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু ও অমুসলিম সমাজের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য।[৫৫]

নৈতিক উচ্চমান ও তাকওয়া ব্যতিরেকে কুরআন কোন ব্যক্তির উপর অন্য ব্যক্তির, জাতির উপর অন্য জাতির, কোনরূপ প্রাধান্য স্বীকার করে না (৪৯:১৩)। বিদায় হজ্বের ভাষণে রসূলুল্লাহ্‌ ঘোষণা করেন, 'আজ হতে সকল আভিজাত্যের অবসান হলো।' হাদীস অনুসারে এক আদমের সন্তান হিসাবে সকল মানুষ 'চিরুনীর দাঁতের মত সমান'। আল্লাহ্‌ই একমাত্র আইন দাতা, তাঁর আদেশের অনুবর্তীতায় সকল মানুষ সমান। এই নীতিমালাসমূহ কুরআন ও হাদীসে অতীব গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। এবং সকল সময়ে শরিয়ার অপরিবর্তনীয় নীতি হিসাবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। মোহাম্মদ আসাদের মতে, 'কেবলমাত্র এই নীতিমালার আলোকে ও ভিত্তিতে ইসলামী সমাজের ধারণাটি যুক্তিগ্রাহ্যতা ও তাৎপর্য খুঁজে পায়।[৫৬]

সর্বশেষে কুরআন ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিমালা হিসাবে শূরার (পারস্পরিক আলোচনা বা পরামর্শ) বিধান ঘোষণা করেছে।[৫৭]

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মহানবী (সা.) কে জনগণের বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা বা পরামর্শের নির্দেশ দিয়েছেন (৩:১৫৯) এবং ঈমানদার হিসাবে তাদের উল্লেখ করেছে যারা নিজেদের বিষয় পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পন্ন করে। (৪২:৩৮)। আবদুল ওয়াহিদ আল সুলায়মান শুরা ব্যবস্থার ব্যাখ্যায় বলেন:

(শুরা) ঐ পদ্ধতি যাতে মুসলমানগণ পরস্পর বসে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ আলোচনা করে এবং ন্যায়বিচারের দার্শনিক ধারণার আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে পালনীয় করে নেয়।[৫৮] শুরা ব্যবস্থা স্বৈরাচারী শাসন প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করে। তবে শুরা ব্যবস্থা কার্যকরীভবে কাজ করে কেবল মাত্র যদি স্বাধীনতা ও সমতার দু'টি মৌলিক নীতি সঠিকভাবে পালন করা হয়।[৫৯] তাই দেখা যাচ্ছে, ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, সরকার শুধুমাত্র আইনের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করবে না, একই সাথে জনগণের আশা-আকাংখা ও ইচ্ছা অনুসারে সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়িত করবে। তাই ইকবালের ভাষায় এটা বলা যুক্তিযুক্ত যে, ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা সময়-কালের প্রেক্ষাপটে তাওহীদ, আদল, সমতা, শুরা ও স্বাধীনতার ধারণা সমূহকে একটি সুনির্দিষ্ট মানব সংগঠনের মাধ্যমে রূপদানের প্রচেষ্টা।[৬০]

৭.৭ ইসলামের রাজনৈতিক উন্নয়নের তাত্ত্বিক নির্দেশাবলী: প্রসঙ্গত হযরত আলীর চিঠি

ইসলামী প্রশাসনের ভিত্তিমূলে অন্যান্য উৎসগুলোর মধ্যে একটি হল প্রাথমিক মুসলিমদের বিভিন্ন দলিল, পাশাপাশি কিছু অক্ষত পান্ডুলিপিও রয়েছে। যা সারা বিশ্বের বিভিন্ন পাঠাগার ও যাদুঘরকে সমৃদ্ধ করে রেখেছে। এগুলো থেকে ইসলামে রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃতি বোঝা যায়। এখানে শুধু হযরত আলীর চিঠি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে যা রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যদলিল হিসেবে পরিগণিত হয়। এটি ইসলামের চতুর্থ ধার্মিক খলিফা আলী ইবন আবি তালিব (৩৫/৬৫৬-৪০/৬৬) লিখিত মিশরের গর্ভণর Malik al-Ashtar-al-Nukhhai এর নিকট এক ঐতিহাসিক চিঠি যা কিছু নির্দেশনাসহ পাঠানো হয়েছিল।

এই দলিলটির বিষয়বস্তু হল একজন নবনিযুক্ত গভর্ণরের প্রতি একজন খলিফার উপদেশ ও নির্দেশনা। চিঠিটিতে ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সরকার ও প্রশাসনের মূলনীতিসমূহ সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)-র দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। সুতরাং ইসলামের শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশাসন ও ন্যায়বিচারের মূলনীতির একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবেই উক্ত চিঠিটি সংরক্ষিত ও বিবেচিত। প্রশাসনের ক্ষেত্রে সমসাময়িক মুসলিম গবেষক, Abdel Hadi (১৯৭৩:২০২) এটাকে ইসলামের দৃষ্টিতে প্রশাসনিক নেতৃত্বের জন্য ইসলামের ইতিহাসের অধিক গ্রহণযোগ্য দলিল বলে চিহ্নিত করেন।

খলিফা আলী (র.)-র কাজগুলোর সম্পাদনাকারী Sheikh Hassan Saeed -র মতে, চিঠিটি শাসক ও প্রশাসনের কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা নিয়ে আলোচনা করে: তাদের প্রধান কর্তৃত্ব ও দায়িত্বাবলী; সচিব ও অধীনস্থ কর্মচারীদের সাথে তাদের সম্পর্ক; প্রশাসনের বিভিন্ন শাখার মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের বন্টন; তাদের একে অন্যের সাথে সমন্বয় সাধন ও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা ইত্যাদি। চিঠিটি দুর্নীতির বিরুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

উপদেশ দেয়, প্রশাসনিক ন্যায়পরায়ণতার কথা বলে, কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতাকে উৎসাহিত করে, এবং প্রধান গভর্ণরকে কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যেকার বিশৃঙ্খলা ও অনাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা বলে; যাতে করে মুনাফাখোরী, মজুদদারী, পণ্যের একচেটিয়া কারবার ও কালোবাজারীর গ্রাস থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এটি সম্পদ ও সুযোগের সমবন্টন নীতির উপর; এতিমদের লালন-পালন; বিকলাংগ-অক্ষম, কাজ করতে অক্ষম ও পঙ্গুলোকদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং শাসক ও শাসিতের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করে (Abu Talib, ১৯৭৭:২৪৭)

সংক্ষেপে, এ চিঠিটি কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে প্রশাসনের মূলনীতির একটি সুসমাচার; পাশাপাশি সদয় ও উপকারী প্রশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়ম, নীতিমালা, ও ন্যায়বিচারের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করে; বদান্যতা-দয়া ও সহানুভূতির উপর দৃষ্টি দেয়। এটি জনহিতকর ও ধর্মীয় নেতৃত্ব এবং প্রশাসনের জন্য নীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে এক প্রকার আদেশ ও বটে, 'যেখানে ন্যায়বিচার ও অনুকম্পা মানুষের কাছে শ্রেণী বর্ণ ও ধর্মমত নিরপেক্ষ, যেখানে দরিদ্রতা শুধু অপবাদই নয় বরং এক প্রকার অযোগ্যতাও বটে, যা ন্যায় বিচার, স্বেচ্ছাচারী, আত্মীয়করণ, প্রাদেশীকরণ বা ধর্মোন্মত্ততার প্রতিনিধিত্ব করে না'। অন্যদিকে এটি একটি অভিসন্দর্ভ যা উচ্চতর স্তরের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের কথা বলে (Saeed উদ্ধৃত করেন Abu Talib,, ১৯৭৭:২৪৭)। বিখ্যাত আরব খ্রিস্টান, বিচারক, কবি ও দার্শনিক Abdul Maseeh Antaki, যিনি শতাব্দীর প্রথম দিকে মারা যান, তিনি লিখেন:

> এটি (খলিফা আলীর চিঠি) মুছা ও হাম্মোরাবি প্রদত্তনীতিমালার চেয়ে অধিকতর উত্তর ও উৎকৃষ্ট বিধান; এটি মানুষের প্রশাসন ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত তা ব্যাখ্যা করে ও ব্যাখ্যা করে তা কিভাবে পরিচালিত হবে এবং এটি মুসলিমদের দাবীর প্রতিও সোচ্চার যে, ইসলাম একটি খোদায়ী প্রশাসনের কথা বলে যা জনগণের মাধ্যমে জনগণের জন্য ও জনগণের দ্বারা সৃষ্ট এবং এটি এমন একজন প্রশাসক চায়, যে শুধু নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয় বরং সকল শাসিতের সন্তুটি বিধান করতে চায় এবং ইসলামের পূর্বে কোন ধর্মই তা অর্জন করতে চেষ্টা করেনি।[৬১] আলী মিশরের গভর্ণর (Wali) প্রতি নিম্নোক্ত উপদেশাবলী তাঁর নির্দেশনার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে। খলিফা আলী (Malik Al-Ashtar an-Nukhai) কে উপদেশ প্রদান করেন যে:

১) অনুসারী নাগরিক ও তার কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাছে একটি উত্তম আদর্শ হতে।

২) তাঁর প্রশাসনের জন্য অত্যন্ত ধার্মিক, সৎ, সত্যবাদী ও খোদাভীরু লোক বাছাই করতে।

৩) নিরপেক্ষ হতে ও ন্যায়বিচার করতে এবং ক্ষমতার ভিত্তিতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে।

৪) গিবতকারী ও অপবাদ প্রদাণকারীদের বিরুদ্ধে সতর্ক হতে।

৫) তাঁর সচিব ও সহায়তা প্রদাকারীদের কার্যাবলী তদারক করতে এবং সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার যাতে সর্বদা রক্ষিত হয় এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে।

৬) কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করতে এবং কর্তৃত্ববাদী নির্দেশ প্রদান না করতে, যা তাঁকে একক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে তৈরি করবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭) দুর্নীতি, অন্যায় অবিচার ও জনগণের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের খারাপ আচরণের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করতে।

৮) তাঁর কর্মকর্তাদের যে কোন ভুলভ্রান্তির জন্য দায়িত্বশীল হতে যাতে সে এ ব্যাপারে জানে ও সহ্য করে।

৯) গভর্ণর ও কমিশনারদের সাথে নিয়মিত ও স্থায়ী যোগযোগ রক্ষা করতে।

১০) আত্মপ্রশংসা ও আত্মোপলব্ধির বৈশিষ্ট্য যাতে জাগ্রত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে।

যে সম্পদ সাধারণ জনগণের বা যাতে প্রত্যেকের সমান অধিকার রয়েছে (যেমন পানি, শক্তি, বাতাস) তা নিজের জন্য বা তার আত্মীয়দের জন্য সংরক্ষণ করে না রাখতে। ইসলামের তাত্ত্বিক নির্দেশাবলী মধ্যে অন্যান্য আরো অনেক পাণ্ডুলিপি, চিঠি রয়েছে। তবে এখানে শুধু তাত্ত্বিক নির্দেশনাবলীর অন্যতম নিদর্শন ইসলামের চতুর্থ খলীফার চিঠি এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অন্যান্য পাণ্ডুলিপি পরিশিষ্টে উল্লেখ্য।

৭.৮ বর্তমান বিশ্ব সমস্যা সমাধানে মদীনা সনদ

এ অধ্যায়ে পূর্বে আলোচিত বিষয়গুলো হতে একথা পরিষ্কার হয়েছে যে, তৎকালীন আরবের বিশৃংখল অবস্থায় মদীনা সনদ শান্তি স্থাপনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল। তৎকালীন আরবে গোত্রে গোত্রে কলহ বিবাদ, মারামারি, হানাহানী, যুদ্ধ বিবাদ, অন্যায়ভাবে অনেক সম্পদ গ্রাস করা, সুদ, জুয়া, মদ, নারীর প্রতি অবহেলা প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। যা তৎকালীন আরবের বুকে অশান্তির রাজত্ব কায়েম করেছিল। এমন পরিস্থিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নেতৃত্বে মদীনা চুক্তি এবং তার উপর ভিত্তি করে মদীনা রাষ্ট্র স্থাপন সবই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

বর্তমান বিশ্ব বিশেষ করে মুসলিম বিশ্ব এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। সকল ক্ষেত্রে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ছে। অথচ মুসলমানদেরই রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। বিজাতীয় কৃষ্টি কালচার গ্রহণের প্রতি ঝোঁক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের অনুসরণ প্রভৃতিই এসবের জন্য দায়ী। ইসলামের ইতিহাসের মহান রাষ্ট্রনায়ক হযরত মুহাম্মদ (সা.), চার খলিফা, পরবর্তী সময়ের দু একজন শাসক এবং অন্যান্য জ্ঞানী-গুনী মুসলিম দার্শনিকদের দর্শন বাদ দিয়ে আজকের মুসলিম বিশ্ব পাশ্চাত্য দার্শনিকদের দর্শন অনুসরণের চেষ্টা করছেন। ফলে তারা কাঙ্খিত উন্নয়ন হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। কারণ পাশ্চাত্যের মডেল অনুসরণের ফলে পাশ্চাত্যই যখন প্রকৃত উন্নয়নের সন্ধান পাচ্ছে না সেখানে মুসলিমরা কিভাবে এর সুফলতা পেতে পারে তা ইসলামী চিন্তাবিদদের বোধগম্য নয়। তাই আরবের বুকে শান্তি ফিরিয়ে আনতে যেমন মদীনা সনদ কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল, তেমনি আজকের সমস্যা সংকুল মুসলিম বিশ্বের সকল রাষ্ট্র একত্র হয়ে মদীনা সনদের প্রয়োজনীয় ধারা গ্রহণ করে বর্তমান সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে-

- সকল মুসলিম রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।
- মুসলমানদের মধ্যে একতাবদ্ধ হওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে।
- মদীনা সনদে, যেমন ইহুদি, পৌত্তলিক এবং মুসলমান সবাইকে এক উম্মত ঘোষণা করা হয়েছে বর্তমান বিশ্বেও এমনটি চিন্তা করতে হবে। সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

- মদীনা সনদে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে ধর্ম ভিত্তিক স্বাধীনতার উপর জোর দেয়া হয়েছিল, বর্তমান বিশ্বেও তেমনটি করতে হবে।
- হযরত মুহাম্মদ (সা.) যেমন পরমতসহিতার উপর অত্যধিক জোর দিয়েছিলেন তেমনি আজকের বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠায় এ বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

৭.৫ ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি আদর্শ মডেল (৬পি ভাষ্য)

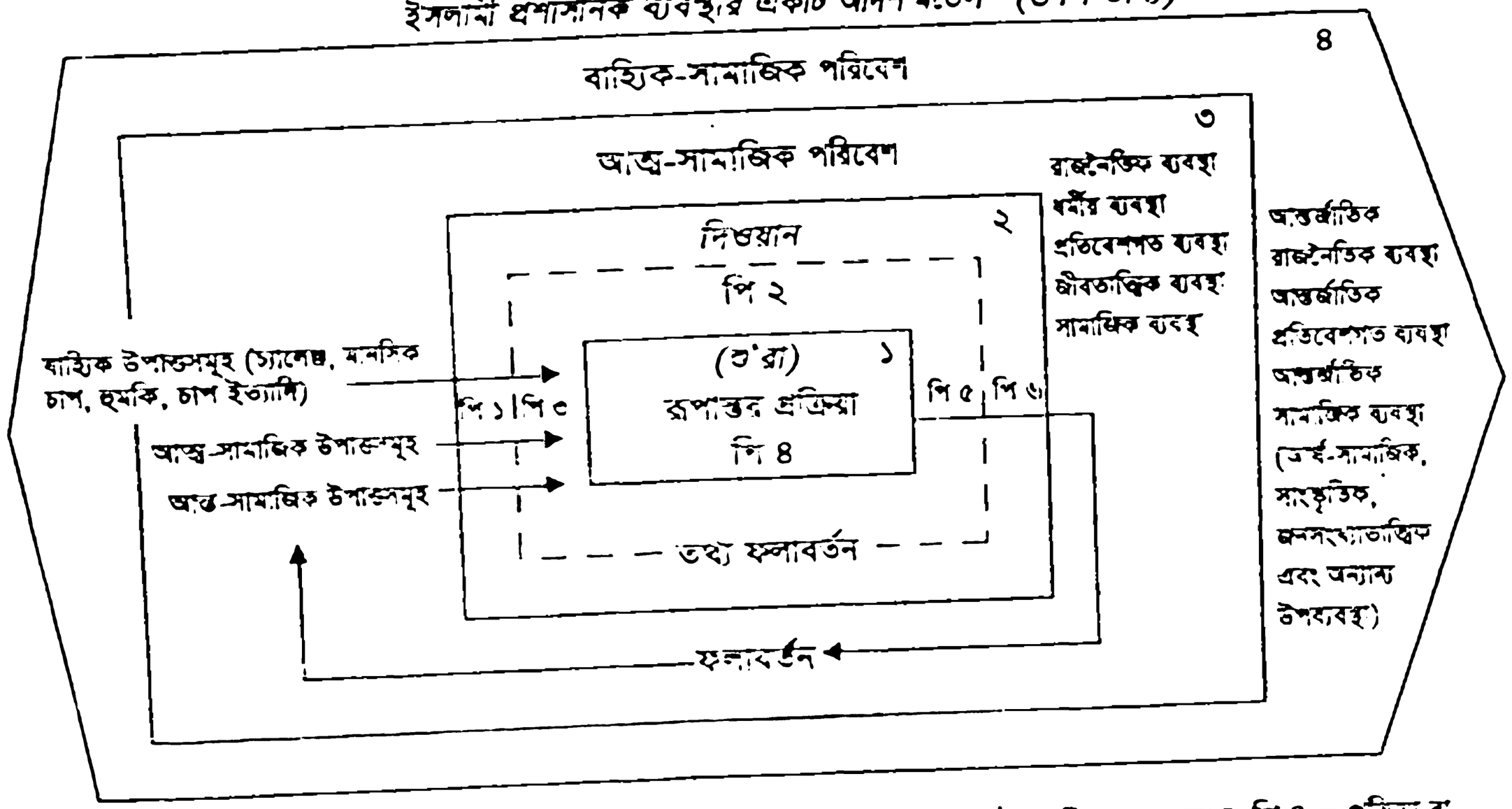

*মূল উপাদানসমূহ : পি ১ = জনগণ (সেবকারী কর্মচারী); পি ২ = স্থান (দিওয়ান বা সংগঠন); পি ৩ = সময়; পি ৪ = প্রক্রিয়া বা কার্যবিধি; পি ৫ = পরিকল্পনা (কর্মসূচি, নীতিমালা); পি ৬ = কর্মফল (নীতিমালার বাস্তবায়ন বা প্রয়োগ)

পি ১ = জনগণ (সাধারণ বা সরকারি কর্মচারী, আমলা, সালা মানুষ, কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি)

পি ২ = স্থান (দিওয়ান) বা সংগঠন, বোর্ড, সালা, ব্যুরো, অফিস ইত্যাদি। চিত্রে ২ নং বক্সে তা দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পি ৩ = সমস্যা (চাহিদা ও সহযোগিতা যা পি১ দ্বারা পরিচালিত, পর্যবেক্ষণ ও সংশ্লেষিত হবার পড়র উপাত্তের প্রধান উপাদন হিসেবে স্বীকৃত)

পি ৪ = প্রক্রিয়া বা কার্যবিধি (রূপান্তর প্রক্রিয়া) যা শূ'রা হিসেবে পরিচিত। এটি হচ্ছে প্রধান প্রক্রিয়া যা দ্বারা পি ১ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। চিত্রে ১ নং বক্সে তা দেখানো হয়েছে।

পি ৫ = পরিকল্পনা, নীতি বা কর্মসূচি। এটি সাধারণত মূল ব্যবস্থার ফলাফল হিসেবে চিহ্নিত। পি৫-র মাধ্যমে উপাত্তের রূপান্তর পরবর্তী ফলাফল, পি১ ইতিমধ্যে শ্রেণীবদ্ধ ও সংগঠিত চাহিদা ও সহযোগিতাকে পি৩, সমস্যা নামে চিহ্নিত করেছে।

পি ৬ = কার্যক্রম সম্পাদন (নীতি বা নীতিমালাগুলোর বাস্তবায়ন এবং প্রয়োগ করা বুঝায় যা পি৫ নামে পরিচিত অথবা ফলাফল যা সর্বশেষ অবস্থায় সিদ্ধান্ত ও নীতিমালাগুলোর সমাপ্তি ঘটায়)

তথ্যের ফলাবর্তন = বক্স ২ এ ভাঙ্গা লাইন দিয়ে দেখানো হয়েছে---- যা চাহিদা ও সহযোগিতার প্রত্যাবর্তিত প্রবাহ নির্দেশ করে। পি১ তাদের পূর্বের আচরণের সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। এ কৌশল পি১ কে এমন একটা অবস্থানে নিয়ে আসে, যাতে তথ্য ও ফলাবর্তনের সুযোগ পাওয়া যায় এবং যা তাদেরকে পরিচালিত করতে পারে বা তাদের লক্ষ্য অর্জনে আচরণকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

ফলাবর্তন = যা একটানা লাইনে--- দেখানো হয়েছে, তা হল ফলাবর্তন, যা আত্ম-সামাজিহক পরিবেশের দিকে আসন্ন সাংগঠনিক পরিবেশের সীমা ছাড়িয়ে যায়। তথ্যের ফলাবর্তনের মতো ফলাবর্তনেরও একই রকম কাজ রয়েছে তবে তা অত্যন্ত ব্যাপক। এখানে ফলাবর্তনও আত্ম-সামাজিক পরিবেশ থেকে ঘটে যেখানে অন্য বিবয়গুলোর মধ্যে রয়েছে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় ব্যবস্থা যেখানে অন্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে. রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় ব্যবস্থা, প্রতি প্রতিবেশগত ব্যবস্থা, জীবতাত্ত্বিক ব্যবস্থা ও সামজিক ব্যবস্থা।

আত্ম-সামাজিক পরিবেশ = রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় ব্যবস্থা, প্রতিবেশগত ব্যবস্থা, জীবতাত্ত্বিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক ব্যবস্থাসমূহ, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। তা চিত্রে বক্স৩-এ দেখানো হয়েছে।

বাহ্যিক-সামাজিক পরিবেশ = আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক প্রতিবেশগত ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক সামাজিক ব্যবস্থা (আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, জনসংখ্যাতাত্ত্বিক, এবং অন্যান্য উপব্যবস্থাসমূহ)। যা চিত্রে বক্স ৪-এ দেখানো হয়েছে।

এ ছাড়া যুদ্ধ সংক্রান্ত, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে মদীনা সনদে যেভাবে সমাধান দেয়া হয়েছিল তা অনুসরণ করতে হবে। মদীনা সাধারণতন্ত্রের প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। বর্তমান সময়ে তাঁর মত ব্যক্তিত্ব পাওয়া না গেলেও তাঁর সর্বাধিক অনুসরণকারীকে প্রধান শাসক নির্বাচিত করতে হবে। বর্তমান সময়ের জাতিসংঘ যদিও ব্যর্থ হয়েছে তথাপি মদীনা সনদ এবং ইসলামের মূল বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করে গঠিত কোন সংঘ অবশ্যই বর্তমান সংঘাতময় বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে বলে বিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী দার্শনিকগণ মনে করেন। ইসলামের অনুসরণ বলতে নামমাত্র মুসলিম হলে চলবে না, কাজে ও কথায় ইসলামের প্রতিফলন দেখাতে হবে।

উল্লেখিত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, ইসলামের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিশ্বের ইতিহাসে একটি অনন্য ব্যবস্থা। বিশেষ করে এই অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে যদিও এর প্রশাসনিক ব্যবস্থা আধুনিককালের প্রশাসনিক ব্যবস্থার মত এতটা উন্নত প্রশাসন ছিল না কিন্তু গুণগত মানের দিক থেকে তা ছিল অনেক ভালো প্রশাসনের উদাহরণ। এ প্রশাসনের মাধ্যমেই ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে সফল রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। যে রাষ্ট্রে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকসহ সকল নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছিল। আর এর সূচনা হয়েছিল যে আন্তর্জাতিক দলিল সম্পাদনের মধ্য দিয়ে তা হলো পৃথিবীর প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সনদ যাকে মদীনা সনদ নাম দেয়া হয়েছে। বর্তমান সমস্যা সংকুল বিশ্বে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে প্রয়োজন এমনই একটি চুক্তি বা সনদের যা এসব দেশের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসা করে শান্তি ও সমৃদ্ধময় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উপহার দিতে পারে।

তথ্য নির্দেশিকা

১। মফিজুল্লাহ্ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ* (ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ৮৭।

২। মাসিক পৃথিবী, আগষ্ট, ১৯৯৫, পৃ. ৭।

৩। হামিদুল্লাহ্, ড. মুহাম্মদ, *মহানবী (সা.)-এর যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা*, আ.ক.ম. আব্দুল কাদের অনূদিত পৃ. ৪৫।

৪। নূর, আবদুন, লোক প্রশাসন সংগঠন, প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা, বি আই আই টি, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০০৬, পৃ. ৯০।

৫। আবু সুলায়মান, ড. আবদুল হামীদ আহমদ, *"ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রন*, প্রকাশনা, বি. আই. আই. টি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৭১।

৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৭। আল-কুরআন, (২:২৫৬)।

৮। সুলায়মান, ড. আবদুল হামীদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫।

৯। প্রাগুক্ত।

১০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

১২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৪। হামীদুল্লাহ্, ড. মুহাম্মদ, *আহাদে নববী মে নেজামে হুকুমরানী*, পৃ. ৩৩।

১৫। Reuben levy, *The Social Structure of Islam* (London: Cambridge University Press, 1979), P.275.

১৬। মোস্তফা, গোলাম, *বিশ্বনবী* (ঢাকা: ১৯৪২), পৃ. ১৪৭।

১৭। নূর, আবদুন, লোক প্রশাসন, *সংগঠন প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা*, গ্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

১৮। মোস্তফা, গোলাম, বিশ্বনবী (১৯৪২), পৃ. ১৪৭।

১৯। আবদুল করিম, *কিতাবুর রসূল*, (ইসলামের ইতিহাসের প্রথম সংবিধান), আব্দুল করিম সম্পাদিত, ইসলামী ঐতিহ্য, জুন ১৯৮৫, বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেবণা প্রতিষ্ঠান, পৃ.১।

২০। Reuben Levy, The social Structure of Islam (London: Cambridge University Press, 1979), P. 275.

২১। The Madina Charter Article-1, BIIT, Library.

২২। নূর, আবদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

২৩। The Madina Charter, প্রাগুক্ত, ধারা ২।

২৪। হোছাইন, শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা তফাজ্জল ও হোছাইন, ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হযরত *মুহাম্মদ (সা.)-এর সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, পৃ. ৪৪২।

২৫। *আল কুরআন*, ৮:৫।

২৬। *আল কুরআন*, ৭ : ১৫৭।

২৭। নূর আবদুন *'লোক প্রশাসন'* প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

২৮। আবূ দাউদ শরীফ।

২৯। ড. মুহাম্মদ আলী আসগর খান, মোখলেছুর রহমান ও শেখ লুৎফুর রহমান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, পৃ. ৪৩।

৩০। আমীর হাসান কর্তৃক উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

৩১। Muhammad Al-Buraey, ibid., P. 246.

৩২। আল-কুরআন, (৩৪:২৭)

৩৩। Muhammad Al-Buraey, ibid., P. 243.

৩৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩।

৩৫। Michael. Hart. *The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in the History* (New York, Hart Publising, 1978), P. 33.

৩৬। মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ, পৃ. ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

৩৭। উদ্ধৃত করেছেন আবদুন নূর "*ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মকাঠামো*" মনযিল, ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ, ১৯৯১; পৃ. ১৮।

৩৮। প্রাগুক্ত।

৩৯। মোতেন, আবদুর রশিদ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান: ইসলামী প্রেক্ষিত*, বি.আই.আই.টি, এপ্রিল, ২০০৮, পৃ. ৯১।

৪০। প্রাগুক্ত।

৪১। Aristotle '*The Politics*; অনুবাদ, জে. এ. সিনক্লেয়ার (ইংল্যান্ড পেনগুইন বুকস, ১৯৯২), পৃ. ২৮)

৪২। মোতেন, আবদুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

৪৩। এঙ্গেলস, ফ্রেডরিক, (Origin of the Family, Private Property and the state), মস্কো, প্রগ্রেস পাবলিশার্স, ১৯৬৯, কালমার্কস, খ., ১৮ প্রাগুক্ত।

৪৪। Ahmet Davutoglu, 'Alternative Paradigms: The Impact of Islamic and Western Welanschauung on Policitical Theory, P.190.

৪৫। আবু জাফর, মোহাম্মদ ইবনে জারীর আল তাবারী, তারিখ আল তাবারী, সম্পাদনা এম. জে. দি গোয়েজী (লইডেন: ই.জেলব্রিল, ১৯৯১) খ. ১-১ পৃ. ৫-১১৫

৪৬। এনায়েত, হামিদ, *Modern Islamic Plitical thought*, (লন্ডন, ম্যাকমিলান প্রেস, ১৯৮১,) P.69

৪৭। এনায়েত, হামিদ, ibid, P. 2-8.

৪৮। তুরাবী, হাসান আল The Islamic State, Edite., Esposito John L. Voices of Resurgent Islam (New York Harpar and Row, 1979), ibid, P. 173

৪৯। Mawdudi, The Islamic State, P. 334.

৫০। Asad, The Principles of state and Government in Islam, P. 23.

৫১। (মোতেন, আবদুল রশিদ, *রাষ্ট্র বিজ্ঞান: ইসলামী প্রেক্ষিত*, বি.আই.আই.টি., ঢাকা, এপ্রিল, ২০০৮, পৃ. ৩০)

৫২। মজিদ খাদ্দুরী, The Nature of the Islamic state ইসলামিক কালচার, ভলিউম-২১, ১৯৪৭, পৃ. ৩২৭।

৫৩। আহমেদ, মনযুর উদ্দিন, *Islamic Political System in the Modern Age: Theory and Practice,* (করাচী), সাদ, ১৯৮৩), পৃ. ২৭-৪৩)

৫৪।আবু মুসার সূত্রে আল বোখারী ও মুসলিম শরীফের এই হাদীসটি মোহাম্মদ আসাদ কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে The principles of State and Government in Islam' জিব্রালটার, দারআল আন্দালুস, ১৯৮০) পৃ. ৩১।)

Dhaka University Institutional Repository

৫৫। মোতিন, আবদুল রশিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান: ইসলামী প্রেক্ষিত, আযিয, এম আব্দুল সম্পাদিত, বি. আই. আই. টি. ঢাকা, এপ্রিল, ২০০৮, পৃ.৯৬।)

৫৬। মোহাম্মদ আসাদ, The Principles of State and Government in Islam' জিব্রালটার, দার আল আন্দালুস, ১৯৮০,) পৃ. ৩৩।))

৫৭। কুরআন 'শুরা' শব্দটি ৩ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে (২:২৩৩; ৩:১৫৯; ৪২:৩৮) ধাতুরূপ 'শাওয়ারা' বা 'শউইর' অর্থ আলাপ করা, পরামর্শ দেয়া এবং এভাবে 'শুরা'র অর্থ আলাপ আলোচনা। আল তাবারী ও আল কুরতুবী উভয়েই একমত পোষণ করেছেন যে, আলাপ আলোচনা ও পরামর্শের বিধান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে একটি অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ এবং 'যে সব বিষয়ে কোন ঐশী প্রত্যাদেশ নেই, সে সব ক্ষেত্রে আলাপ আলোচনা করা অপরিহার্য। দ্রষ্টব্য আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ ইবনে আহমদ কুরতবী, Al Jamili-Ahkam Al-Quran')বৈরুত,Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1958) ভলিউম-২; পার্ট-৪, পৃ.জ২৪৯ এবং আল-তাবারী Tafsir' ভলিরুম; ৩-৪, পৃ.১০০ উল্লেখ্য নবী করিম (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদার সময় 'শুরা' প্রচলিত ছিল এবং এই সময়কালকেই আদর্শ সময়কাল হিসাবে ধরতে হবে। ইসলামের পরবর্তী ইতিহাসে 'শুরা' তার মৌলিক রূপ হারিয়ে ফেলে। তবে বর্তমানে বিষয়টি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তবে এর তেমন কোন প্রয়োগ হচ্ছে না।)

৫৮। সোলায়মান, আবদুল হামিদ Islamization of Knowledge with special Reference to Political Science' American Journal of Islamic Social Science, ভলিউম-২, সংখ্যা-২; ১৯৮৫, পৃ.২৮৫)

৫৯। (Ahmet Davutoglu, Alternative Paradigms'পৃ.১৩২।)

৬০। ইকবাল, মোহাম্মদ The Reconstruction of Religious Thought in Islam লাহের: মোহাম্মদ আশরাফ, ১৯৭১).,.১৫৫।)

৬১। Antaki (Saeed কর্তৃক Abu Talib [১৯৭৭:২৪৭]-এ উল্লেখিত) উপসংহার টেনে বলেছেন যে: 'আলীকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত এ জন্য যে তিনি এসব মূলনীতি তাঁর সরকার ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করেন এবং উন্নয়নের জন্য এসব লিখিত করে রেখে গেছেন'। কিছু মূলনীতির ব্যাপারে Antaki বলেন যে, এসব এখনও সমসাময়িক মুসলিম দেশের কার্যকর প্রশাসনিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় উঁচু মাপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এসব মূলনীতির কয়েকটি হল, পরিকল্পনা, সংগঠন ও সমন্বয়ের মূলনীতি; আমলাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি ও পদচ্যুতি ইত্যাদি কার্য তাদের উচ্চ পদস্থদের দ্বারা সম্পাদন; নাগরিক সম্পর্ক; তত্ত্বধান ও নির্দেশনা প্রদান; এবং অর্থায়ন। তাছাড়ও, পরবর্তী কাজটি প্রেষণা ও পুরস্কার প্রদান (বা শাস্তি প্রদান), সমতা ও ন্যায় বিচার, বেতন প্রদানের নীতিমালা এবং তাদের অভিযোগ ও তার ক্ষতিপূরণের বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত করে।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত আলোচনায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে আধুনিক ও ইসলামী ধারণা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর উপসংহারে এসে বলা যায় যে, ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা নয় বরং সহায়ক। বিশেষ করে ঐতিহাসিক মদীনা সনদের পর প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র মদীনা রাষ্ট্র, পরবর্তী চার খলিফার শাসনামল, বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্বদের গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডের পর একথা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত যে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। যার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রয়েছে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। বর্তমান বিশ্বের পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিফলতার পর ইসলামই একমাত্র অর্থব্যবস্থা যা বর্তমান সময়ের সমস্যা মোকাবেলা করে সুন্দর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা উপহার দিতে পারে। কারণ ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা একটি অনন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যার অনুসরণ বর্তমান বিশ্বের চিত্র একেবারেই পাল্টে দিতে পারে। যার বাস্তব প্রমাণ মদীনা রাষ্ট্র, চার খলিফার শাসন, খলিফা আবদুল আজিযের শাসন। মদীনা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাজিক ব্যবস্থা এত সুষ্ঠু ছিল যে, সকল ক্ষেত্রে মানুষের জীবনে নিরাপত্তা বিরাজ করত। যাকাতের অর্থ নেওয়ার মত লোক তখন খুঁজে পাওয়া যেত না। কোন নারী রাষ্ট্রের এক অংশ থেকে আরেক অংশে নির্ভয়ে যে কোন সময় চলাচল করতে পারত, যা আজকের বিশ্বে বিরল ঘটনা। পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারীদের জীবন কতটা নিরাপত্তাহীন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও অবস্থা তেমন সুবিধেজনক নয়। বাংলাদেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞ মহল অবশ্যই অবগত আছেন। এর জন্য দায়ী হচ্ছে মানুষের নৈতিকতার অভাব-যার শিক্ষা ইসলাম পরিপূর্ণভাবেই দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ হতে হবে পরিপূর্ণভাবে এবং মুসলিম হতে হবে প্রকৃত অর্থে মুসলিম। তাহলেই শুধু এ অবস্থা হতে উত্তরণ হতে পারে।

বর্তমান সময়ে পৃথিবী নৈতিক অধঃপতনের যে চূড়ান্ত সময় অতিক্রম করছে বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশ তাতে সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা অতীব জরুরী। আর এক্ষেত্রে নৈতিক উন্নয়ন অগ্রগণ্য। নৈতিক উন্নয়ন ছাড়া প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন ইসলাম নির্দেশিত পথে জীবন-যাপন (বিশেষ করে মুসলিমদের)। ইসলাম এজন্য জরুরী যে, আল্লাহ মনোনীত একমাত্র ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। যুগে যুগে আল্লাহ্‌র নিকট হতে যত ধর্মই এসেছে সবগুলোর নাম ছিল ইসলাম এবং এর অনুসারীরা সবাই ছিলেন মুসলিম। কিন্তু এসব ধর্মের মধ্যে যখন বিকৃতি দেখা দেয় তখন সেসব ধর্ম বিভিন্ন নাম ধারণ করে। যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীরা নাম ধারণ করেছে খ্রিস্টান, মূসা (আ.)-এর অনুসারীরা নাম ধারণ করেছে ইয়াহুদী।

একটি ইলেকট্রনিক্স এর আবিষ্কারক কিংবা তৈরিকারক যেমন সে জিনিষটির সার্বিক বিষয়ে বুঝে এবং কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে এটি ভাল থাকবে তা তার নখদর্পণে থাকে তেমন মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ মানুষের কিসে কল্যাণ আর কিসে অকল্যাণ তা জেনেই মানব জাতির পথ প্রদর্শণের জন্য আল কুরআন নাযিল করেছেন এবং যুগে যুগে নবী রসূল পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমাদের যে কোন সমস্যায় আমরা কুরআন ও হাদীসে রসূল অনুসরণ করব- এটাই ইসলামের দাবী।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্রের প্রয়োজন এটাকে ইসলাম অস্বীকার করে না। গণতন্ত্র সম্পর্কে সর্বজনগ্রাহ্য এবং সমাদৃত সংজ্ঞা– Government of the people, by the people and for the people এর পূর্ণরূপ হচ্ছে That this nation under God shall have a new birth of freedom and that government of the people, by the people for the people shall not perish from the earth অর্থাৎ অব্রাহাম লিংকন এর এই বিখ্যাত ভাষণ থেকে বিশ্বাস ভিত্তিক গণতন্ত্রের (Faith based democracy) প্রত্যয়টি পাই। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নির্ধারক বিষয়সমূহ ও ইসলাম নির্দেশিত পথেই উন্নয়ন করা সম্ভব। প্রকৃত উন্নয়ন ইসলাম নির্দেশিত পথে যেভাবে হবে অন্য কোন পথে সেভাবে সম্ভব নয়। যদি সম্ভব হতো তাহলে বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের এ যুগে মানুষ এত চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকত না।

সুতরাং সমগ্র বিশ্বে বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলিতে বিরাজমান বর্তমান বৈষম্য এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ন্যায়বাদী উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে বাজার ব্যবস্থা ও সামাজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা হচ্ছে ঐ দেশগুলির অর্থনীতিকে ইসলামীকরণ। বর্তমান বৈষম্য ইসলামীকরণের ফলে শুধু বিদূরিত হবে না বরং ইসলামী শরীয়তের লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখবে। ব্যক্তি-স্বার্থ, ব্যক্তিগত সম্পদের অধিকারী হওয়া এবং বাজার নির্ধারিত মূল্য ইত্যাদি বিষয়গুলি তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অর্থনীতির এসব উপাদান অন্যান্য বিষয়গুলোর প্রভাবে অধিকতর মানবিক হয়ে উঠবে।

এসবের মধ্যে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার ধারণা মানুষের স্বার্থকে ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়া থেকে পরকালের অনন্ত জীবন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে। এ ধারণাটি ব্যক্তিস্বার্থকে সমাজকল্যাণের আওতায় লালন করতে ব্যক্তিকে উৎসাহিত করে। এসব কিছু নৈতিক স্বচ্ছতার সাথে একত্রিত হয়ে ব্যক্তি ও সরকারের পণ্য ক্রয়ের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করবে অর্থাৎ অসাহুত ভোগ থেকে বিরত রাখবে। ফলে প্রচুর সম্পদ ভোগ-ব্যয়ের হাত থেকে বেঁচে যাবে। বাজার মূল্য নির্ধারিত হওয়ার ব্যাপারে যখন স্বচ্ছতা চলে আসবে তখন প্রচুর সম্পদ উদ্বৃত্ত হয়ে পড়বে যা দিয়ে সামাজিক সাধারণ চাহিদা পূরণ তো করা যাবেই এমন কি বর্ধিত হারে সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও রপ্তানি করা যাবে। প্রকৃত চাহিদা ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সম্পদের ইনসাফপূর্ণ বন্টনের ফলে উন্নততর দক্ষতা সৃষ্টির জন্য অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া বর্ধিত সরবরাহ এবং নিম্ন মূল্য নিশ্চিত।

ভূমি সংস্কার এবং ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে এবং ইসলামী শিক্ষার আলোকে সনাতনী অর্থ ব্যবস্থার পুনর্গঠনের মাধ্যমে সম্পদ ও ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করা থেকে বিরত রাখা, আত্মকর্মসংস্থানমূলক সুযোগ বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্যতা হ্রাস করা যেতে পারে। ইনসাফপূর্ণ উপায়ে সম্পদ বিতরণ এবং অভাব পূরণের

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানব সম্পদের অধিকতর জাগিয়ে তোলা যাবে। মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাওয়া এবং বিনিময় হারের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উন্নয়ন এবং কল্যাণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান রাখবে।

এসব কিছুর পরও গরীবের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষ মনযোগ দিতে হবে। তবে কিছু ভর্তুকি দেওয়ার মাধ্যমে গরীবের স্বার্থ রক্ষা করা যাবে না। বরং সংগঠিত উপায়ে নিবিড়ভাবে সরকার ও সামাজিক সংস্থাগুলো থেকে ত্রাণ কার্যক্রম গরীবের মধ্যে পরিচালনা করতে হবে। এই ত্রাণ কর্মসূচির আর্থিক উৎস হবে যাকাত, দান-খয়রাত এবং বাজেটে সম্ভব সর্বোচ্চ পরিমাণে বরাদ্ধকৃত অর্থ।

মুসলিম সরকারগুলো দূর্ভাগ্যবশত ইসলামকে শুধুমাত্র একটি শ্লোগান হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। ইসলাম অর্থনীতি ও সামাজিক কল্যাণে যে অবদান রাখতে পারে তার কোন কিছুই ঐ সরকারগুলো কাজে লাগাতে পারেনি। প্রফেসর খুরশীদ আহমদ তাই ঠিকই বলেছেন যে, মুসলিম দেশের সরকারগুলোর ইসলাম থেকে উন্নয়ন ধারণা লাভ করে তা উন্নয়ন অর্থনীতিতে কাজে লাগানোর কোন লক্ষণ এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতির পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও সমন্বয় সাধন একটি দূরূহ ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। মুসলিম দেশের সরকারগুলো যত তাড়াতাড়ি অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও সমন্বয় সাধনের কাজ শুরু করবে ততই তাদের জন্য ও মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। সকল মুসলিম দেশের সকল সমস্যার সমাধান হিসেবে ইসলামীকরণকে ব্যবহার করা যাবে না। শতাব্দীর পুরনো জঞ্জাল, নৈতিক অবক্ষয়, দুঃশাসন, ভ্রান্ত নীতির অনুসরণ, আন্তর্জাতিক অর্থনীতির বিনিময় হারের ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিনের অস্থিরতা দূর হতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে।

এ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল একথা প্রমাণ করা যে, ইসলাম ধর্ম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা কিনা। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং ইসলামী উন্নয়নের ধারণা বিশ্লেষণ, ঐতিহাসিক মদীনা সনদের তাৎপর্য, মদীনা রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে একথা প্রমাণ করা যায় যে, ইসলাম ধর্ম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা নয় বরং সহায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Madina Charter

1. This is a document from Muhammad the Prophet (May Allah bless him and grant him peace) governing relations between the Believers i.e. Muslims of Quraysh and yath rib and those who followed then and worked hard with them. They form one nation Ummah.
2. The Quraysh Mohajireen will continue to pay blood money according to their present custom.
3. In case of war with any body they will redeem their prisoners with kindness and justice common among Believers.
4. The Bani Awf will decide the blood money within themselves according to their existing custom.
5. In case of war with any body all partise other than Muslim will redeem their prisoners with kindness and justice according to practice among Believers and not in accordance with pre-Islamic notions.
6. The Bani Saeeda the Bani Harith the Bani Jusham and the Bani Najjar will be governed on the lines of the above(principles)
7. The Bani Amr Bani Awf Bani Harith the Banc Jusham and the Bani Najjar will be governed in the same manner.
8. Believers will not fail to redeem their prisoners they will pay blood money on their behalf. It will be a common responsibility of the Ummat and not of the family of the prisoners to pay blood money.
9. A Believer will not make the freedman of another Believer as his ally against the wishes of the other Believers.
10. The Believers who fear Allah will oppose the rebellious elements and those that encourage injustice or sin or enmity or corruption among Believers.
11. If anyone is guilty of any such act all the Believers will oppose him even if he be the son of any one of them.
12. A Believer will not kill another Believer for the sake of an un-Believer.(i.e. even though the un-Believer is his close relative).
13. No Believer will help an un-Believer against a Believer.
14. Protection (when given) in the Name of Allah will be common. The weakest among Believers may give protection (In the name of Allah) and it will be binding on all believers.
15. Believers are all friends to each other to the exclusion of all others.
16. Those jews Who follow The Believers will be helped and Will be treated with equality.(Social, legal And economic equality is promised to All loyal citizens of the State)
17. No jew will be wrongrd for being a jew.
18. The enemies of The jews Who follow us Will not be helped.
19. The peace of The Believers (of the State of Madinah) cannot be divided. (it is either peace or War for All. It cannot be that a part of The population is At war with the outsiders and a part is At peace).
20. No Separate peace will be Made by anyone When Belivers Are fighting in The path of Allah.
21. Conditions of peace and war and the accompanying case or hardships must be fair and equitable to all citizens alike.
22. When going out on expeditions a rider must take his fellow member of the army -share his ride.
23. The Believers must avenge the blood of one another when fighting in the path of Allah (This clause was to remind those in front of whom there may be less severe fighting that the cause was common to all. This also meant that although each battle appeared a separate entity it was in fact a part of the war, which affected all Muslims equally).
24. The Believers (because they fear Allah) are better in showing steadfastness and as a result receive guidance from Allah in this respect. Others must also aspire to come up to the same standard of steadfastness.
25. No un-Believer will be permitted to take the property of the Quraysh (the enemy) under his protection. Enemy property must be surrendered to the State.
26. No un-Believer will intervene in favour of a Quraysh, (because the Qhrash having declared war are the enemy).
27. If any un-believer kills a Believer, without good cause , he shall be killed in return, unless the next of kin are satisfied (as it creates law and order problems and weakens the defence of the State). All Believers shall be against such a wrong-doer.No Believer will be allowed to shelter such a man.
28. When you differ on anything (regarding this Doeument)the matter shall be referred to Allah and Muhammad (may Allah bless him and grant him peace).

Dhaka University Institutional Repository

29. The jews will contribute towards the war when fighting alongside the Believers.
30. The jews of Bani Awl will be treated as one community with the Believers. The jews have their religion. This will also apply to their freedmen. The exception will be those who act unjustly and sinfully. By so doing they wrong themselves and their families.
31. The same applies to jews of Bani Al-Najjar, Bani Al Harith, Bani Saeeda, Bani jusham, Bani Al Aws, Thaalba, and the jaffna,(a clan of the Bani Thaalba) and the Bani Al Shutayba.
32. Loyalty gives protection against treachery.(Loyal people are protected by their friends against treachery. As long as a person remains loyal to the State he is not likely to succumb to the ideas of being treacherous. He protects himself against weakness).
33. The freedmen of Thaalba will be afforded the same status as Thaalba themselves. This status is for fair dealings and full justice as a right and equal responsibility for military service.
34. Those in alliance with the jews will be given the same treatment as the jews.
35. No one (no tribe which is party to the pact) shall go to war except with the permission of Muhammad (may Allah bless him and grant him peace).if any wrong has been done to any person or party it may be avenged.
36. Any one who kills another without warning (there being no just cause for it) amount to his staying himself and his household, unless the killing was done due to a wrong being done to him.
37. The jews must bear their own expenses (in War) and the Muslims bear their expenses.
38. If any one attacks anyone who is a party to this pact the other must come to his help.
39. They (parties to this pact) must seek mutual advice and consultation.
40. Loyalty gives protection against treachery. Those who avoid mutual consultation do so because of lack of sincerity and loyalty.
41. A man will not be made liable for misdeeds of his ally.
42. Anyone (any individual or party) who is wronged must be helped.
43. The jews must pay (for war) with the Muslims. (the clause appears to be for occasions when jews are not taking party in the war. clause 37 deals with occasions when they are taking part in war).
44. Yathrib will be Sanctuary for the people of this Pact
45. A stranger (individual) who has been given protection (by anyone party to this pact) will be treated as his host (who has given him protection) while (he is) doing no harm and is not committing any crime. Those given protection but indulging in anti-state activities will be liable to punishment.
46. A woman will be given protection only with the consent for her family (Guardian). (a good precaution to avoid inter-conflicts).
47. In case of any dispute or controversy, which may result in trouble the matter must be referred to Allah and Muhammed (may Allah bless him and grant him peace), The prophet (may Allah bless him and grant him peace) of Allah will accept anything in this document, which is for (bringing about) piety and goodness.
48. Quraysh and their allies will not be given protection.
49. Tha parties to this pack are bound to help each other in the event of an attack on yathrid.
50. If they (the parties to the pact other than the Muslims)are called upon to make and maintain peace(within the State)they must do so. If a similar demand (of making and maintaining peace)is made on the Muslims, it must be carried out, except when the Muslims are already engaged in a war in the path if Allah.(so that no secret ally of the enemy can aid the enemy by calling upon Muslims to end hostilities under this clause).
51. Everyone (individual) will have his share(of treatment)in accordance with what party he belongs to. Individual must benefit or suffer for the good or bad deed of the group they belong to. Without such a rule party affiliations and discipline cannot be maintained.
52. The jews of al-Aws, Including their freedmen. have the same standing, as other parties to the pact. as long as they are loyal to the pact. Loyalty is a protection against treachery.
53. Anyone who acts loyally or otherwise does it for his own good (or loss).
54. Allah approves this Document.
55. This document will not(be employed to)protect one who is unjust or commits a crime (against other parties of the pact).
56. whether an individual goes out to fight(in accordance with the terms of this pact) or remains in his home, he will be safe unless he has committed a crime or is a sinner.(i.e.No one will be punished in his individual capacity for not having gone out to fight in accordance with the terms of this pact).
57. Allah is the protector of the good people and those who fear Allah, and Mohammad (may Allah bless him and grant him peace) is the Messenger of Allah (He guarantees protection for those who are good and fear Allah).

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্ট
উন্নয়নঃ একটি ইসলামী ধরণ
কিছু উপাদান এবং একটি মাপকাঠি

ইসলামে উন্নয়ন তখনই শুধু অর্জিত হবে যখন ইসলামী রাষ্ট্র বাস্তবে থাকবে। চিত্র ২.১ দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামী আদর্শ রাষ্ট্র উন্নয়নের মাপকাঠিতে সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে যদি তা ইসলাম সম্মত হয়। বিদ্যমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর রীতিনীতি ইসলামী রাষ্ট্রের যত কাছাকাছি হবে, তারা ততবেশী উন্নত হবে এবং ফলত উন্নয়নের মাপকাঠিতে তাঁরা উঁচু স্থানে অবস্থান করবে এবং অন্যথায় বিপরীত ঘটনাটি ঘটবে, যা চিত্রে দেখানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অ-নৈসলামিক রাষ্ট্রকে স্থান দেয়া হয়েছে মাপকাঠির সর্বনিম্নে।

চিত্রে কলাম ১-এ বর্ণনা করা হয়েছে বিভিন্ন বিষয়গুলো বা উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্যাগুলো। এ শ্রেণীতে রয়েছে একটি বিদ্যমান মুসলিম রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনার অধীন উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো। আদর্শ, মানুষ ও উন্নয়ন, এবং রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক, ও প্রশাসনিক উন্নয়নকে এখানে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যা এ গবেষণায় আলোচিত হয়েছে, তবে বিশেষত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর ব্যাপক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই রাজনৈতিক উন্নয়ন, যা এ অধ্যায়ের মূল বিষয় তা বিবেচিত হয়েছে একটি প্রধান বিষয় বা সমস্যার ক্ষেত্র হিসেবে, যার মধ্যে থাকতে পারে ব্যাপক উপ-বিষয় ও সমস্যাবলী যা রাজনৈতিকভাবে উন্নয়নশীল মুসলিম বিশ্বের অঞ্চলগুলোর সাথে সম্পর্কিত। এ কলামের তালিকাটি হতে পারে অসীম, যা হোক, উন্নয়নের সেসব বিষয়গুলো এ গবেষণায় পরীক্ষা করা হয়েছে যা খুবই প্রাসঙ্গিক।

চিত্র: ২.১ ইসলামী উন্নয়নের উপাদানসমূহ

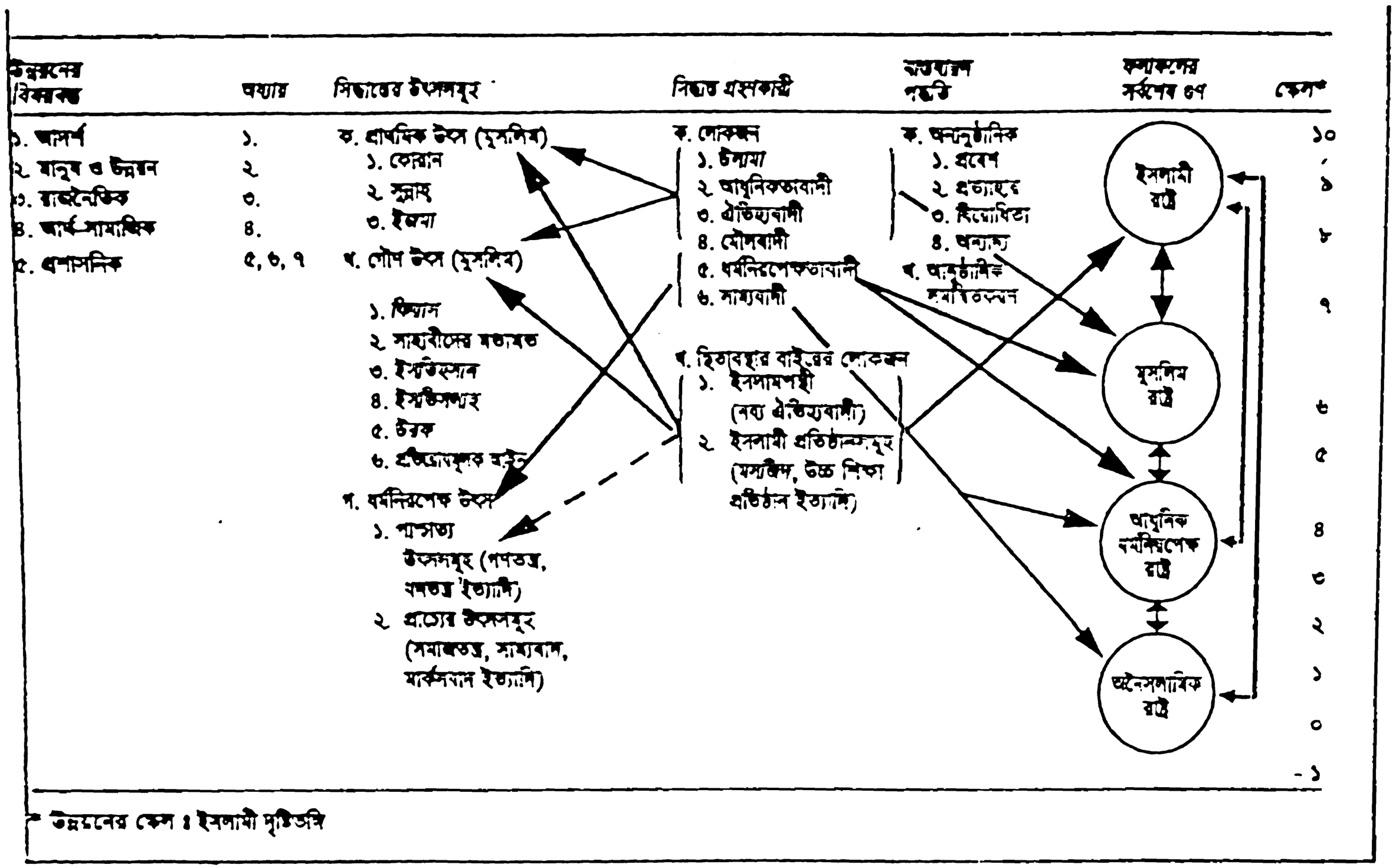

* উন্নয়নের কেল : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ২.২ সুষ্ঠু প্রশাসন ও সুস্থ সমাজ গঠনের মৌল নীতিমালা

সুষ্ঠু প্রশাসন ১৪টি নীতিমালার উপর নির্ভর করে*	সুস্থ সমাজ গঠনে ইসলামের ১৪টি মৌল নীতিমালা*
১. শ্রম বিভাগ (এতে বিশেষায়ণকে স্বাভাবিক নিয়মের অধীনে করা হয়)	১. তাওহীদ বা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও আনুগত্য
২. কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব (দায়িত্ব কর্তৃত্বের পরিপূরক)	২. বিবাহ ও পরিবার হবে সমাজ গঠনের ভিত্তি এবং সন্তানের প্রতি যেমন পিতা-মাতার দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা সন্তানের কর্তব্য
৩. শৃঙ্খলা (তা একজন নেতা সৃষ্টি করেন)	৩. সমাজের অভাবগ্রস্থ, ইয়াতিম ও আত্মীয় স্বজনদের হক বা প্রাপ্য অংশ যথাযথভাবে পরিশোধ করে তাদেরকে সাহায্য করা।
৪. আদেশের ঐক্য (মানুষ দ্বৈত আদেশ পালন করতে পারে না)	৪. ব্যভিচার ও অশ্লীলতার সংস্পর্শ পরিহার করা।
৫. নির্দেশের ঐক্য (একই ধরনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক গুচ্ছ কাজকে একটি খাত এবং একক পরিকল্পনার অধীনে আনায়ন)	৫. অপব্যবহার পরিহার করা।
৬. ব্যক্তি স্বার্থকে সাধারণ স্বার্থের অধীনে স্থাপন।	৬. সমাজের গরীব-দুঃখীদের সাথে বিনয়ের সাথে আচরণ করা।
৭. পারিশ্রমিক (তা হবে ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টার জন্য পুরস্কারস্বরূপ)	৭. অন্যায়ভাবে প্রাণহানি বা ঘটানো।
৮. কেন্দ্রীয়করণ (কেন্দ্রীকরণ স্বাভাবিব নিয়মের অধীন)	৮. অন্যায়ভাবে ইয়াতিমদের বা পিতৃহীনের ধন-সম্পত্তি হস্তগত বা আত্মসাৎ না করা।
৯. পাদসোপান (কর্তৃত্ব পর্যায়, দলভিত্তিক কর্ম সম্পাদন নীতি)	৯. কৃপণতা বা অমিতব্যয়িতা পরিহার করা।
১০. আদেশ (প্রত্যেকের জন্য স্থান সুনির্দিষ্টকরণ)	১০. ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে পালন করা।
১১. সমদর্শিতা (তা ন্যায়বিচার এবং দয়া দুয়েরই ফলশ্রুতি)	১১. পারস্পরিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে ন্যায় ও সততার নীতি অনুসরণ করা।
১২. কর্মীদের কাজের মেয়াদের স্থিতিশীলতা	১২. অভাবের কারণে সন্তান হত্যা না করা।
১৩. উদ্যোগ (তা ব্যবসার জন্য শক্তির উৎস)	১৩. সামাজিক আচরণে অহংকার পরিহার করে বিনয়ী হওয়া।
১৪. দলচেতনা (একতাই বল)	১৪. কোন বিষয়ে পুংখানুপুংখ যাচাই না করে আন্দাজের উপর ভিত্তি করে কথা না বলা।
*Henri Fayol, General and Industrial Management (London : Issac Pitman & Sons Lrtd. 1949), P.97.	* আল-কুরআন: সূরা বনী ইসরাইলের ২২ থেকে ৩৭ নং আয়াত দ্রষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট: ৩০ মুসলিম দেশের আর্থ-সামাজিক সংক্ষিপ্তসার

সারণী-২.৩ ৩০ মুসলিম দেশের আর্থ-সামাজিক সংক্ষিপ্তসার মৌলিক নির্দেশক

দেশ	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)		এলাকা (হাজার বর্গকিলোমিটার)	মাথাপিছু জাতীয় আয় (ইউ. এস. ডলার) ১৯৮৮	বয়স্ক সাক্ষরতার হার	
	মিড-১৯৮৮	প্রজেকটেড ২০০০			মোট ১৯৮৫	নারী ১৯৮৫
চাদ	৫.৪	৭	১২৮৪	১৬০	৭৫	৮৯
বাংলাদেশ	১০৮.৯	১৪৫	১৪৪	১৭০	৬৭	৭৮
সোমালিয়া	৫.৯	৯	৬৩৮	১৭০	৮৮	৮৯
মালে	৮.০	১১	১.২৪০	২৩০	৮৩	৫৫
উগান্ডা	১৬.২	২৪	২৩৬	২৮০	৪৩	৬৯
নাইজেরিয়া	১১০.১	১৫৯	৯২৪	২৯০	৫৮	৯১
নাইজার	৭.৩	১১	১২৬৭	৩০০	৮৬	৮১
পাকিস্তান	১০৬.৩	১৫৪	৭৯৬	৩৫০	৭০	৭৫
দক্ষিণ ইয়েমেন	২.৪	৩	৩৩৩	৪৩০	৫৯	৯৭
উত্তর ইয়েমেন	৮.৫	১৩	১৯৫	৬৪০	৮৬	৩৫
ইন্দোনেশিয়া	১৭৪.৮	২১৩	১৯০৫	৪৪০	২৬	-
মৌরিতানিয়া	১.৯	৩	১০২৬	৪৮০	-	-
সুদান	২৩.৮	৩৩	২৫০৬	৪৮০	-	-
আফগানিস্তান	-	-	৬৫২	-	-	৭০
মিশর	৫০.২	৬৬	১০০১	৬৬০	৫৬	৭৮
মরক্কো	২৪.০	৩২	৪৪৭	৮৩০	৬৭	৫৯
তিউনেসিয়া	৭.৮	১০	১৬৪	১২৩০	৪৬	৩৮
তুরস্ক	৫৩.৮	৬৮	৭৭৯	১২৮০	২৬	৩৭
জর্ডান	১.৯	৬	৮৯	১৫০০	২৫	৫৭
সিরিয়া	১১.৬	১৮	১৮৫	১৬৮০	৪০	৩৪
মালয়েশিয়া	১৬.৯	২২	৩৩০	১৯৪০	২৭	-
লেবানন	-	-	১০	-	-	৬৩
আলজেরিয়া	২৩.৮	৩৩	২৩৮২	২৩৬০	৫০	-
ওমান	১.৪	২	২১২	৫০০০	-	-
লিবিয়া	৪.২	৬	১৭৬০	৫৪২০	-	৬১
ইরান	৪৮.৬	৭০	১৬৪৮	-	৪৯	১৩
ইরাক	১৭.৬	২৬	৪৩৮	-	১১	-
সৌদি আরব	১৪.০	-	২১৫০	৬২০০	-	৩৭
কুয়েত	২.০	৩	১৮	১৩৪০০	৩০	-
ইউ.এ.ই	১.৮	২	৮৪	১৫৭৭০	-	-

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-২.৪ ৩০ মুসলিম দেশের আর্থ-সামাজিক সংক্ষিপ্তসার উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি (১৯৮০-৮৮)

দেশ	মোট জাতীয় আয় (মিলিয়ন ইউএস ডলার) ১৯৮৮	গড় বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি হার (%) ১৯৮০-৮৮				
		মোট জাতীয় আয়	কৃষি	শ্রমশিল্প	শিল্পদ্রব্য	সেবা
চাদ	৯২০	৩.৯	২.৬	৭৭	-	৪.২
বাংলাদেশ	১৯৩২০	৩.৭	২.১	৪.৯	২.৪	৫.২
সোমালিয়া	৯৭০	৩.২	৩.৯	২.৩	-০.১	১.২
মালে	১৯৪০	৩.২	০.৩	৮.১	-	৫.৮
উগান্ডা	৩৯৫০	১.৪	০.৩	৬.৪	২.৩	৩.৪
নাইজেরিয়া	২৯৩৭০	-১.১	১.০	-৩.২	-২.৯	-০.৪
নাইজার	২৪০০	-১.২	২.৮	-৪.৩	-	-৮.০
পাকিস্তান	৩৪০৫০	৬.৫	৩.৩	২.৮	৪.৬	৫.৫
দক্ষিণ ইয়েমেন	৮৪০	-	-	-	-	-৬.২
উত্তর ইয়েমেন	৫৯১০	৬.৫	২.৯	১১.৫	১২.৮	৬.৪
ইন্দোনেশিয়া	৮৩২২০	৫.১	৩.১	৫.১	১৩.১	-০.৫
মৌরিতানিয়া	৯০০	১.৬	১.৫	৪.৯	-	২.০
সুদান	১১২৪০	২.৫	২.৭	৩.৬	৫.০	-
আফগানিস্তান	(১৯৫৬) ৬০০	-	-	-	-	৭.৩
মিশর	৩৪৩৩০	৫.৭	২.৬	৫.১	৫.৬	৪.২
মরক্কো	২১৯৯০	৪.২	৬.৬	২.৪	৪.২	৪.৪
তিউনেসিয়া	৮৭৫০	৩.৪	২.৪	২.৪	৬.০	৫.১
তুরস্ক	৬৪৩৬০	৫.৩	৩.৬	৬.৭	৭.৯	৪.৪
জর্ডান	৩৯০০	৪.২	৬.০	৩.৬	৩.৪	০.২
সিরিয়া	১৪৯৫০	০.৫	০.৫	১.৪	-	৩.৬
মালয়েশিয়া	৩৪৬৮০	৪.৬	৩.৭	৬.১	৭.৩	-
লেবানন	(১৯৬৫) ১১৫০	-	-	-	-	২.৭
আলজেরিয়া	৫১৯০০	৩.৫	৫.৬	৩.৮	৬.১	১২.২
ওমান	৮১৫০	১২.৭	৯.৪	১৫.১	৩৭.৯	১৫.৫
লিবিয়া	১৫০০	৪.২	১০.৭	১.২	১৩.৭	১৩.৬
ইরান	(১৯৬৫) ৬১৭০	৬.২	৪.৫	২.৪	১০.০	-
ইরাক	(১৯৬৫) ২৪৩০	-	-	-	-	২.৬
সৌদি আরব	৭২৬২০	-৩.৩	১৫.২	-৬.০	৭.৯	-০.৯
কুয়েত	১৯৯৭০	-১.১	২৩.৬	-২.৩	১.৪	৩.৭
ইউ.এ.ই	২৩৮৫০	-৪.৫	৯.৩	-৮.৭	২.৭	

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ২.৫ ৩০ মুসলিম দেশের আর্থ-সামাজিক সংক্ষিপ্তসার উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি (১৯৮৬-৮৮)

দেশ	মূল্য সংযোজন (মিলিয়ন ইউএস ডলার)		মাথা পিছু আয় (১৯৮৬-৮৮)		
	শিল্প দ্রব্য	কৃষি (১৯৮৮)	সিরিয়াস আমদানী (মিলিয়ন টন)	দৈনিক ক্যালরি যোগান	খাদ্য উৎপাদনের গর সূচক সংখ্যা ১৯৭+৮১ = ১০০
চাদ	১০৬	৪৩০	৬১	১৭১৭	১০৩
বাংলাদেশ	১৩১৩	৮৮৮২	৩০১০	১৯২৭	৯২
সোমালিয়া	৫১	৩৬৩	২৩৬	২১৩৮	১০০
মালে	১০০	৮৫২	১০৯	২০৭৩	৯৭
উগান্ডা	১৬২	২৮৫৯	২৮	২৩৪৪	১২১
নাইজেরিয়া	৫১৯৬	১০১০৫	৩৩৩	২১৪৬	১০৩
নাইজার	১৮৯	৮৬৬	১৫১	২৪৩২	৮৩
পাকিস্তান	৫০০১	৮৯৩৫	৬০২	২৩১৫	১০৭
দক্ষিণ ইয়েমেন	-	১৩২	৪৫৯	২২৯৮	৮৫
উত্তর ইয়েমেন	৫৭৮	১৩৮৭	৭৫৪	২৩১৮	১১৮
ইন্দোনেশিয়া	১২৮৭৬	২০০৫৫	১৭০২	২৫৭৯	১১৭
মৌরিতানিয়া	(১৯৭০) ১০	৩৩৯	২১৯	২৩২২	৮৯
সুদান	১১১১	৩৭১৬	৭০২	২২০৪	৮৯
আফগানিস্তান	-	-	২৩৬	-	-
মিশর	৪২৪৪	৭২৫৭	৮৪৭৯	৩৩৪২	১১১
মরক্কো	৩৩৮৯	৩৭৭০	১৬৪৩	২৯১৫	১০৬
টিউনেসিয়া	১২৬৫	১১৮৭	২১১৬	২৯৯৪	১১১
তুরস্ক	১৫৮৬৩	১১১২৫	৩৮০	৩২২৯	৯৮
জর্ডান	৫৫২	৩৭৭	৮৭৪	২৯৯১	১১১
সিরিয়া	-	৫৭২৮	১০৪৪	৩২৬০	৯৩
মালয়েশিয়া	(১৯৭০) ৫০০	(১৯৭০) ১০৯৮	২৩৮৭	২৭৩০	১০৬
লেবানন	-	(১৯৭০) ১৩৬	৫৩৭	-	-
আলজেরিয়া	৭১৯৬	৬৫৪৬	৬১৩০	২৭১৫	১০৬
ওমান	৪৬৪	(১৯৭০) ৪০	২৯৩	-	-
লিবিয়া	(১৯৭০) ৮১	(১৯৭০) ৯৩	১৪৩৫	৩৬০১	১১৯
ইরান	(১৯৭০) ১৫০১	(১৯৭০) ২১২০	৪৬৪৪	৩৩১৩	৯৯
ইরাক	(১৯৭০) ৩২৫	(১৯৭০) ৫৭৯	৪৪৪২	২৯৩২	১০৫
সৌদি আরব	৬০৮৫	৫৫২৬	৫১৭৯	৩০০৪	-
কুয়েত	১৯০২	(১৯৭০) ০৮	৪১৭	৩০২১	-
ইউ.এ.ই	২১৫৫	৪৫৩	৪৫৮	৩৭৩৩	-

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-২.৬ ৩০ মুসলিম দেশের আর্থ-সামাজিক সংক্ষিপ্তসার পণ্য দ্রব্যের ব্যবসা

দেশ	পণ্যদ্রব্যের ব্যবসা ১৯৮৮ (ইউএস ডলার)			বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধির হার (%)			
	রপ্তানী	আমদানী		রপ্তানী		আমদানী	
		মোট	খাদ্য (%)	১৯৬৫-৮০	১৯৮০-৮৮	১৯৬৫-৮০	১৯৮০-৮৮
চাদ	১৪৮	৩৬৬	-	-	-	-	-
বাংলাদেশ	১২৩১	২৯৮৭	২৩	-	৬.১	-	৩.৩
সোমালিয়া	৫৮	৩৫৪	২২	৩.৮	-৯.৭	৫.৮	-৪.১
মালে	২৫৫	৫১৩	১৩	১১.০	৭.০	৬.২	৩.৭
উগান্ডা	২৯৮	৫১৮	৬	-৩.৯	২.৬	-৫.৩	৪.৬
নাইজেরিয়া	৭৩৯০	৬৩২৪	১৮	১১.৪	-৩.৬	১৫.২	-১৩.৭
নাইজার	৩৬৯	৪৩০	২১	১২.৮	-৪.৯	৬.৬	-৪.২
পাকিস্তান	৪৩৬২	৭৫২১	১৪	৪.৩	৮.৪	০.৪	৩.৮
দক্ষিণ ইয়েমেন	৮০	৫৯৮	১৬	-১৩.৭	১.৯	-৭.৫	৪.৪
উত্তর ইয়েমেন	৮৫৩	১৩১০	২৮	২.৪	৩৫.৬	২৩.৩	-১০.০
ইন্দোনেশিয়া	১৯৬৭৭	১৫৭৩২	৩	৯.৬	২.৯	১৪.২	-২.১
মৌরিতানিয়া	৪৩৩	৩৫৩	২১	২.৭	৯.৭	৫.৪	২.৪
সুদান	৪৮৬	১২২৩	৭	-০.৩	২.৭	২.৩	-৭.৯
আফগানিস্তান	-	-	-	-	-	-	-
মিশর	৪৪৯৯	১০৭৭১	১৯	২.৭	৬.২	৬.০	১.৫
মরক্কো	৩৬২৪	৪৮১৮	১২	৩.৭	৫.০	৬.৫	১.৮
তিউনেশিয়া	২৩৯৭	৩৬৯২	১৮	১০.৮	৩.০	১০.৪	-১.৬
তুরস্ক	১১,৬৬২	১৪৩৪০	২	৫.৫	১৫.৩	৭.৭	১০.৩
জর্ডান	৮৭৫	২৭৫১	১৯	১৩.৭	৬.৫	৯.৭	০.৩
সিরিয়া	১৩৪৫	২২২৩	১৭	১১.৪	-০.৫	৮.৫	-৪.২
মালয়েশিয়া	২০৮৪৮	১৬৫৮৪	১৫	৪.৪	৯.৪	২.৯	০.৪
লেবানন	-	-	-	-	-	-	-
আলজেরিয়া	৭৬৭৪	৭৪৩২	৩০	১.৫	৩.৪	১৩.০	-৫.৯
ওমান	৩৯৪১	১৮২২	১৫	-	-	-	-
লিবিয়া	৫৬৪০	৬৩৮৬	১৫	৩.৩	-৫.৪	১৫.৮	-১৪.৮
ইরান	-	৯৪৫৪	-	-	-	-	-
ইরাক	৯০১৪	১০২৬৮	-	-	-	-	-
সৌদি আরব	২৩১৩৮	২০৪৬৫	১৭	৮.৮	-১৬.৩	২৫.৯	-৯.৩
কুয়েত	৭১৬০	৬৩৪৮	১৭	-১.৯	-২.৯	১১.৮	-৫.৫
ইউ.এ.ই	১২০০০	৭২২৬	৪	১০.৯	০.১	২০.৫	-৭.১

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-২.৭ ৩০ মুসলিম দেশের আর্থ-সামাজিক সংক্ষিপ্তসার গৃহীত উন্নয়ন অনুদান এবং বহিঃঋণ

দেশ	গৃহীত অনুদান (১৯৮৮)		বহিঃ ঋণ (১৯৮৮) ইউএস ডলার		ঋণ সুবিধার হার ১৯৮৮	
	সকল উৎস থেকে মোট প্রদত্ত অর্থ (মিলিয়ন ইউএস ডলার)	মোট জাতীয় আয়ের শতকরা	মোট	খন্ডকালিন	মোট জাতীয় আয়	রপ্তানী
চাদ	২৬৪	২৮.৮	৩৪৬	২৯.	০.৭	২.৭
বাংলাদেশ	১৫৯২	৮.২	১০২১৯	৫০	১.৬	২০.৫
সোমালিয়া	৪৩৩	৪২.৯	২১০৩৫	১১৬	০.৪	৪.৯
মালে	৪২৭	২২.০	২০৬৭	৬৫	২.৫	১৪.২
উগান্ডা	৩৫৯	৮.৪	১৯২৫	২৩৫	১.০	১৪.০
নাইজেরিয়া	১২০	০.৪	৩০১৭১৮	১৮৫২	৬.৬	২৪.২
নাইজার	৩৭১	১৫.৫	১৭৪২	১০৫	৩.৬	২১.১
পাকিস্তান	৭৬	৭.২	২০৯৩	১১৮	১০.৮	৪৬.৫
দক্ষিণ ইয়েমেন	২২৩	৩.৮	২৯৪৮	৫০৭	৩৪	১৬.০
উত্তর ইয়েমেন	১৪০৮	৩.৭	১৭০১০	২৪২৫	৩.৫	২৩.৫
ইন্দোনেশিয়া	১৬৩২	২.১	৫২৬০০	৬৩২২	৯.৯	৩৪.১
মৌরিতানিয়া	১৮৪	১৮.৪	২০৭৬	১৮৩	১১.৯	২১.৬
সুদান	৯১৮	৭.৮	১১৮৫৩	২৫৩০	০.৬	৯.৫
আফগানিস্তান	৭২	-	-	-	-	-
মিশর	১৫৩৭	৪.৩	৪৯৯৭০	৬৫২২	৩.৭	১৩.৯
মরক্কো	৪৮২	২.২	১৯৯২৩	২০০	৬.৪	২৪.৮
তিউনেসিয়া	৩১৬	৩.২	৬৬৭২	২৭৫	১০.৯	২৪.২
তুরস্ক	৩০৭	০.৪	৩৯৫৯২	৭৭০৪	৮.৯	৩৪.১
জর্ডান	৪২৫	৯.৩	৫৫৩২	১৫২৯	১৯.৬	৩১.৯
সিরিয়া	১৯১	১.৩	৪৮৯০	১২০৫	২.৬	২১.১
মালয়েশিয়া	১০৪	০.৩	২০৫৪১	২১০০	১৩.০	১৭.৫
লেবানন	১৪১	-	৪৯৯	২৭০	-	-
আলজেরিয়া	১৭১	০.৩	২৪৮৫০	১৬২১	১২.৭	৭৭.০
ওমান	১	-	২৯৪০	৪৫২	৭.৪	-
লিবিয়া	৬	-	-	-	-	-
ইরান	৮২	-	-	-	-	-
ইরাক	১০	-	-	-	-	-
সৌদি আরব	১৯	০.০	-	-	-	-
কুয়েত	৬	০.০	-	-	-	-
ইউ.এ.ই	-১২	-০.১	-	-	-	-

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ২.৮ ৩০ মুসলিম দেশের আর্থ-সামাজিক সংক্ষিপ্তসার কেন্দ্রীয় সরকারের খরচ

দেশ	মোট শতকরা হার							
	সামরিক খাত		শিক্ষা		স্বাস্থ্য		সেবা	
	১৯৭২	১৯৮৮	১৯৯২	১৯৮৮	১৯৭২	১৯৮৮	১৯৭২	১৯৮৮
চাদ	২৪.৬	-	১৪.৮	-	৪.৪	-	২১.৮	-
বাংলাদেশ	৫.১	-	১৪.৮	-	৫.০	-	৩৯.৯	-
সোমালিয়া	২৩.৩	-	৫.৫	-	৭.২	-	২১.৬	-
মালে	-	৮.৪	-	৯.৮	-	২.৬	-	১৮.৪
উগান্ডা	২৩.১	২৬.৩	১৫.৩	১৫.০	৫.৩	২.৪	১২.৪	১৪.৮
নাইজেরিয়া	৪০.২	২.৪	৪.৫	২.৪	৩.৬	০.৮	১৯.৬	৩৫.৯
নাইজার	-	-	-	-	-	-	-	-
পাকিস্তান	৩৯.৯	২৯.৫	১.২	২.৬	১.১	০.৯	২১.৪	৩৪.৫
দক্ষিণ ইয়েমেন	-	-	-	-	-	-	-	-
উত্তর ইয়েমেন	৩৩.৮	৩১.২	৪.০	১৭.৬	২.৯	৩.৬	০.৯	৬.৩
ইন্দোনেশিয়া	১৮.৬	৮.৩	৭.৮	১০.০	১.৪	১.৮	৩০.৫	-
মৌরিতানিয়া	-	-	-	-	-	-	-	-
সুদান	২৪.১	-	৯.৩	-	৫.৪	-	১৫.৮	-
আফগানিস্তান	-	-	-	-	-	-	-	-
মিশর	-	-	-	-	-	-	-	-
মরক্কো	২৩.৩	১৫.১	১৯.২	১৭.০	৪.৮	৩.০	২৫.৬	২১.৪
তিউনেসিয়া	৪.৯	৫.৭	৩০.৫	১৪.৬	৭.৪	৫.৯	২৩.৩	২৪.৪
তুরস্ক	১৫.৫	১০.৪	১৮.১	১২.৭	৩.২	২.৪	৪২.০	২২.১
জর্ডান	৩৩.৫	২৬.৫	৯.৪	১৩.০	৩.৮	৫.৪	২৬.৬	১৫.৭
সিরিয়া	৩৭.২	৪০.০	১১.৩	১০.৪	১.৪	১.৫	৩৯.৯	২৫.০
মালয়েশিয়া	১৮.৫	-	২৩.৪	-	৬.৮	-	১৪.২	-
লেবানন	-	-	-	-	-	-	-	-
আলজেরিয়া	-	-	-	-	-	-	-	-
ওমান	৩৯.৩	৩৮.২	৩.৭	১০.৭	৫.৪	৪.৮	২৪.৪	১২.৯
লিবিয়া	-	-	-	-	-	-	-	-
ইরান	২৪.১	১৪.২	১০.৪	১৯.৬	৩.৬	৬.০	৩০.৬	১৫.৭
ইরাক	-	-	-	-	-	-	-	-
সৌদি আরব	-	-	-	-	-	-	-	-
কুয়েত	৮.৪	১৩.৯	১৫.০	১৪.২	৫.৫	৭.৭	১৬.৬	১৮.১
ইউ.এ.ই	২৪.৪	-	১৬.৫	-	৪.৩	-	১৮.৩	-

Dhaka University Institutional Repository

সারণী: ৬.১ ইসলামী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি

প্রশ্ন	উত্তর	
	বাস্তবতা	(সামাজিক বাস্তবতা)
১. আমরা কোথা থেকে এসেছি?	১. আল্লাহ্	১. একটি বিশেষ জাতি, ভাষাগোষ্ঠী, নৃতাত্ত্বিক বা জাতিগত গোষ্ঠী থেকে।
২। আমরা কে?	২. আবদুল্লাহ্ (আল্লাহ্র দাস)। প্রতিনিধি	২. আমি একজন রাজা, রাষ্ট্রপতি, চিকিৎসক, প্রকৌশলী অথবা কেউ না।
৩. আমরা এখানে কেন এসেছি?	৩. আল্লাহ্র দাসত্ব ও ইবাদত করতে	৩. এটি একান্ত ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ব্যাপার, এটি দার্শনিকদের বিষয়।
৪. আমরা কোথায় যাচ্ছি?	৪. বিচার দিবসের দিকে	৪. এখানে পরকাল থাকতেও পারে। যখন আমি সেখানে পৌঁছাব তখন দুঃখিত হবো।
৫. এ সৃষ্টি কার প্রতি নত?	৫. আল্লাহ্	৫. জাতির প্রতি; সম্পদশালীদের প্রতি; বৃহৎ কর্পোরেশন বা মাফিয়াদের প্রতি।
৬. আল্লাহ্ সৃষ্টির মধ্যে কোন সীমারেখাগুলো টানা?	৬. গ্রহরাজি, সাত বেহেস্ত, মহাসাগর, পর্বতরাজি, মহাদেশ ও নদীনালা	৬. মানচিত্রে বিদ্যমান শহর, নগর, রাষ্ট্র ও জাতিগুলোর সীমানা।

উৎস: নূর, আবদুন, লোক প্রশাসন সংগঠন, প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা, বি আই আই টি, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০০৬.

মানুষের জীবন বিকাশের পর্যায়ক্রম

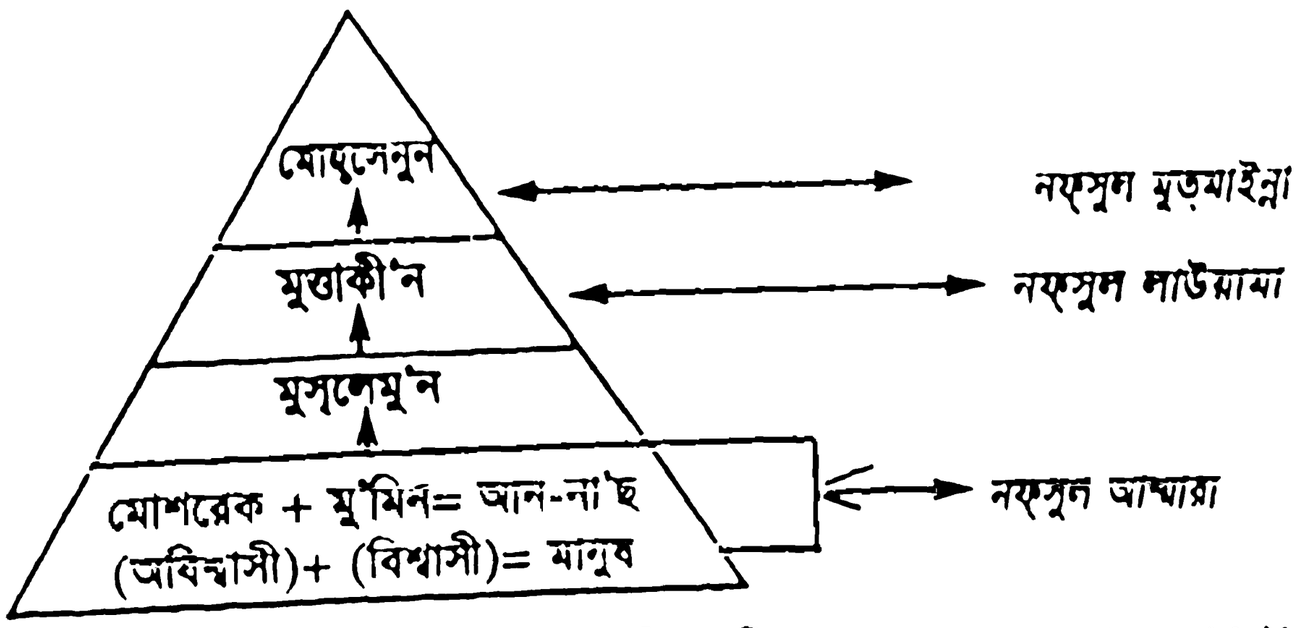

উৎস: *আল-কুরআন*, আল্লামা ইউসুফ আলী অনূদিত, ২৪ ঃ ৬২; ২৬ ঃ ৯০ ; ২ঃ ১৮৯; ৩ঃ১৪৪ এবং ২৩ঃ ১-১১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার ভূমিকা

জীবন বিকাশের পর্যায়ক্রম		মানুষের তাড়নার/ চেতনার পদবিন্যাস	শিক্ষাক্রম	
পর্যায়ক্রম	নাম		উদ্দেশ্য	শিক্ষা সম্পর্কিত কুরআনের নির্দেশাবলী
প্রাথমিক পর্যায়	নফসে আম্মারা (প্রবৃত্তির তাড়না)	জৈবিক তাড়না (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানও চিকিৎসা ইত্যাদি)	বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞান/দক্ষতা অর্জন	২।২৯; ১৫।১৯-২০।১২। ১৬।১২-১৪।৩১।২০; ৪।৩২-৩৩।২২।৬৫ ৪৫।১২-১৩।২।২৬৯। ৬২।১০।৫৩।৩
দ্বিতীয় বা মাধ্যমিক পর্যায়	নফসে লাউয়ামা (আত্ম জিজ্ঞাসা)	মানসিক চেতনা বা বিবেকবোধ (জীবন ও জগৎ এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কিত অনুসন্ধিৎসা)	চিরন্তন সত্যের উপলব্ধি	২।১৬৪।৩।১৯০।১৯১ ২৯।২০।২২।৫-৬; ১৬।৭৮।
তৃতীয় ও সর্বোচ্চ পর্যায়	নফসে মুতমাইন্না (আত্ম সন্তুষ্টি)	আত্মিক সচেতনতা (দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত)	আত্মিক বা মানবিক গুণাবলীর বিকাশ	২। ৩০; ৭। ২৯; ১৬।৯০; ৩।১১০; ৯৮।৭-৮।৫৭।২৫ ২।২৮১।

উৎস: উপরিউক্ত টেবিলটি লেখক কর্তৃক মানুষের আচরণ সম্পর্কিত আধুনিক মনোবিজ্ঞানী Abraham H. Maslow এবং কুরআনের বর্ণনা কাঠামোর উপর ভিত্তি করে তৈরীকৃত। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, Second Edition (New York : Harper and Row, 1970) এবং *The Holy Qur'an* translation and commentary by A. Yusuf Ali (Britwood Maryland: Amana Corp., 1983).

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বের অপরাপর জাতিসমূহের তুলনায় মুসলমানদের অবস্থান চিত্র

শিক্ষার হার / বিশেষ জাতি সমূহ	২০-২৪ বৎসর বয়সের উচ্চ শিক্ষার্থীদের শতকরা হার	বৈজ্ঞানিক প্রকৌশলীর হার (দশ লাখের মধ্যে)
বিশ্বের সকল জাতি	১৩	৭,১২৭
শিল্পোন্নত জাতিসমূহ	৩৫	১৩,৮২৪
তৃতীয় বিশ্বের জাতি	১১	৬,৬৯১
মুসলিম জাতি সমূহ	৬	৩,৫৯৩

উৎস : Ghulam M. Haniff, *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের জাতিসমূহের তুলনায় মুসলমানদের শিক্ষার হার

শিক্ষার হার / বিশেষ জাতি সমূহ	শিক্ষার হার	বিদ্যালয়ে ৩-১৯ বৎসর বয়সের শিক্ষার্থীদের শতকরা হার	২৫বৎসর বয়সের উর্ধ্বে যারা কখনও বিদ্যালয়ে যায়নি তাদের শতকরা হার
সকল জাতি	৬৫	৫৮	৬১
শিল্পোন্নত জাতিসমূহ	৯৮	৭৬	৩
তৃতীয় বিশ্বের জাতি সমূহ	৫৯	৫১	৬৪
মুসলিম জাতি সমূহ	৩৮	৪৩	৭৭

উৎস : Ghulam M.Haniff, " Muslim Development at Risk :The Crisis of Human Resources," in *The American Journal of Islamic Social Sciences* VOL.9, No.4, Winter 1992.

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

ইসলামী পাণ্ডুলিপি

নিম্নের সরণীতে ১৫টি পাণ্ডুলিপির তালিকা রয়েছে, যা মুহাম্মদ আল-ব্যুরে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন, তার দশটি মিশরের কায়রোতে এবং পাঁচটি তুর্কীর ইস্তাম্বুলে। সারণীতে ঐ পাণ্ডুলিপিগুলোর লেখকের নাম, নাম্বার এবং পাণ্ডুলিপির অবস্থান এবং এটি কখন লেখা হয়েছিল বা কোথায় লেখক বসবাস করতেন সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য দেয়া হয়েছে। উক্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর শিরোনাম অনুবাদের কোন প্রচেষ্টাই নেয়া হয়নি।

A. *পাণ্ডুলিপিসমূহ যা লেখক কর্তৃক মিশরের কায়রো-র Dar al- Kutub এ পরীক্ষিত*

লেখক	শিরোনাম	MS #	প্লেট/পৃষ্ঠা	মন্তব্য
১. মাহমুদ ইবনে আস-শেখ ইসমাইল আল-খাইরবাইতি	আদ- দুররাহ আল-গাররাহ ফি নসিহত আস-সালাতিন ওয়াল কুদাহ ওয়াল-উমরা	B ২৩২৯২	৬২ প্লেট	লিখিত ৮৪৩/১৪৩৯
২. এম.এম.এ.আল-কুরাইশী ইবনে আল-উখুওয়াহ্	মা'আলিম আল-কুরবাহ ফি আহকাম আল-হিসবাহ	Y ৬৭৯০	১৫০ প্লেট	লিখিত ৭৭১/১৩৬৯
৩. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল-কাফিজি আল-হানাফি	সাইফ আল-মুলুক ওয়াল হুক্কাম	B ২৪২৬৩	৫১ প্লেট	লিখিত ৮৭০/১৪৬৫
৪. এম.ডি. ইবনে মুস্তফা ইবনে হাবিব আল-আরদারুশী, দাদ্দাহ আফান্দী নামে পরিচিত	আস্-সিয়াসাহ আস-শরীয়াহ্	তাইমুর ২৯	২৭ পৃষ্ঠা	d. ১১৪৬/ ১৭৩৩
৫. আল-হাকিম	সিয়াসাত আল-মুলুক	আদাব ৯৭৬১	৪৪ প্লেট	লিখিত ১২২৫/১৮১০
৬. Anonymous	সিয়াসাত আল-মুলুক	তাসাওয়াফ তালাত ১৩৮৬	৮৭ পৃষ্ঠা	

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]	লেখক	শিরোনাম	MS #	প্লেট/পৃষ্ঠা	মন্তব্য
	[illegible] দিন এম.বি. আবদুল [illegible] ইবনে হুরাইজ আদ-[illegible]	সায়ের আস-সালিক ফি আসনা আল-মামালিক	তাসাওয়াফ ৮৫৯	১৭৬ প্লেট	লিখিত ৭৫২/১৩৫১ – ৮২৯/১৪২৯
[illegible].	[illegible] বি. উমর বি. আলী বি. [illegible] আদ-দীন আল-আবু [illegible]. ইবনে আল বানুনু নামে [illegible]	আস-সির আস-সাফি ফি মানাকিব আস-সুলতান আল-হানাফি	তারিখ ১৫৪	১৭৫ প্লেট	৫ এর অধিক কপি লিখিত ১০৭৪/১৬৬৪
৯.	[illegible] বি. আল-ওয়ালিদ বি. এম. বি. [illegible] আল-কুরাইশী আল-[illegible] আল-আন্দালুসী, ইবনে [illegible] রান্দাকাহ্ নামে পরিচিত।	সিরাজ আল-মুলুক	তারিখ ৪১৪ বা B -৩২৫৬৭	২২৫ প্লেট	৪ এর অধিক কপি লিখিত ৪৫১/১০৫৯ – ৫২০/১১২৬
১০.	[illegible] বি. মুহাম্মদ বি. আবি [illegible]-রাবী'	সুলুক আল-মালিক ফি তাদবীর আল মামালিক	হিকমাহ্/ ফালসাফাহ ৪৭৭	২২ প্লেট	২১৮/৮৩৩ –১৭২/৮৮৫

সূত্রঃ মুহাম্মদ আল-ব্যুরে কর্তৃক সংগৃহিত। যা তাঁর গ্রন্থ 'প্রাশাসনিক উন্নয়ন ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি' গ্রন্থে উল্লিখিত আমির মুহাম্মদ নসরুল্লাহ্ অনূদিত, বি.আই.আই.টি, ঢাকা, ডিসেম্বর, ২০০৭, পৃ. ৪২০-২২।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

Meir, G. M. and Boldwin, *Economic Development*, Theory, History, Policy.

B. Okun and R.W. Richardson (ed) *Studies in Economic Development*

Easton David, *`A Framework for political Analysis, Engleweed cliffs*: NT: Prentice Hall, 1965.

Finkle and Gablel (eds) *Political Development and Social Change*, New York, Johr wiley and sons, inc. 1966.

Al-Buraey, Dr. Muhammad, *Administrative Development: An Islamic Perspective*, Dcc. 2007

Esposito, John L. '*Islam and Politics*' (New york, Syracuse University Press, 1991)

Abusulyaman Dr, Abdul Hamid Ahmad, *Crisis in the Muslim Mind*

Ameer Ali, Syed, *A short History of the Saracen.*

Khan, Muhammad Akram, *Islamic Economics*: The state of the Art.

Ahmad, Muhammad shafiq, '*Right to own property' and security of property in Islamic Law*, Islam and the Modern Age. Volume xxxv No. 1 February 2004. Editor: Akhtarul Wasey.

Sirageldin Ismail, *Elimination of Proverty: Challenges and Islamic* Strategies Islamic Economic studies. Vol. 8 No. 1, Rajab 1421 (October, 2000)

Hofmann, Murad wilfried, *Governing Under Islam and the islamic political system*. American Journal of Islamic Social Science Volume 18 Summer 2001, Number-3.

Dhaka University Institutional Repository

Moqsood, Ruqaiyyah waris, "*Islam and the Discovery of Freedom*" (By Rose wilder Lane)

Khan, M.A. Muqtedar, *Islamic Democracy and Moderate Muslims: The straight Path Runs through the Middle.* American Journal of Islamic social Scienees. Vollume 22; winter 2005.

Chapra, M. Umer, '*The Nature of Riba in Islam*, Journal of islamic Economics and Finance, Volume-2, Number-1, January-June, 2006.

Exposito, John L, *Islam: The straight Path* (New York: Oxford University Press, 1988)

Rostow, W.W, *The stage of Economic Growth and Rostow Published The Economics Take off into sustained growth* (London, Macmilan, 1965)

Exposito, John L, *Islam in Asia : Religion, Politics and Society* (N. Y. Oxford University Press, 1987)

Maududi, *A. The family law of Islam* (Lahore 1968)

Exposito, John L, *Islam, Gender and Social Change*, with Yvonne Y. Haddad (ibid., 1998)

Hitti, Philip, *History of the Arabs* (London, st. Martin's Press, 1915)

Exposito, John L, *Women in Muslim Family Law* (ibid., 1982)

Levy, Reuben: *The social Structure of Islam*, (London, Cambridge University press, 1971)

Pye, Lucian W, *Aspects of Political Development*; Boston, Little Brown 1966.

Exposito, John L, *Islam in Transition : Muslim Perspectives*, with John J. Donohue (ibid., 1982)

Dhaka University Institutional Repository

Chapra, Dr. M Umer, *Islam and the Economic Challenges*, Islamic Froundation, Lester U.K. and The international institute of Islamic Thought Hernden, U.S.A.

Exposito, John L, *Islam and Development: Religion and Sociopolitical Change* (Syracuse, N. Y. : Syracuse University Press, 1980)

Marx, Karl and Angles, Friedrich "*Communist Manifesto (1848) and other writings*, New York. 1952.

Exposito, John L, *Voices of Resurgent Islam* (New York: Oxford University Press, 1983)

Lincoln, Abraham, *Gettysburg Address,* 1864

Paul A. Banna and Paul M. Sweezy-Monopoly Capital.

Maniruzzaman, Talukder, *Military withdrawal from Politics : A Comparative study*, 1987...., The Politics of Develop met: The case of Pakistan 1947-1958, Dhaka, 1980.

মোতেন, আবদুল রশিদ, '*রাষ্ট্রবিজ্ঞান: ইসলামী প্রেক্ষিত*, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ঢাকা, ২০০৮'।

ভূঁইয়া, মোঃ আবদুল ওদুদ, সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখা, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, আগস্ট, ১৯৯৪।

আবূ সুলায়মান, ড. আবদুল হামীদ আহমদ, '*ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ* বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০১।

ইসলাম, সৈয়দ আমীরুল, '*বাংলাদেশ ও ইসলাম*'

Dhaka University Institutional Repository

খাদসুরী, মাজিদ, *দি ইসলামী কনসেপশন অব জাস্টিস*, (বাল্টিমোর জনস হোপকিনস ইউনিভার্সিটি, ১৯৮৭)।

ফাতহুল বারী, খণ্ড ১-১২, মুস্তফা আল হালাবী, কায়রো।

সহীহ্ মুসলিম, খণ্ড ১-৭, ইমাম মুসলিমের আল জামে আস্ সহীহ, ইস্তাম্বুল, তাবি।

করিম, আবদুল, '*মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, গবেষণা সংকলন, ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।

আল-ব্যুরে, মুহাম্মদ রচিত ও নাসরুল্লাহ্, আমির মুহাম্মদ অনূদিত '*প্রশাসনিক উন্নয়ন ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি*' বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০৭।

আহমেদ, এমাজ উদ্দিন, '*তুলনামূলক রাজনীতি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ*, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৯৯১।

নায়েক, জাকির, *জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ-৪ ইসলামে নারীর অধিকার*, পিস পাবলিকেশন, ঢাকা।

নূর আবদুর '*লোক-প্রশাসন সংগঠন, প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা*, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০০৬।

আল-হামরা, প্রকৌশলী হালিমা, *নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলাম*।

বাদাবী, , ড. জামাল আল রচিত মাহমুদ ডা. আবু খলদুন আল ও মাহমুদ, ড. শারমিন ইসলাম, অনূদিত *ইসলামী শিক্ষা সিরিজ*, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট ঢাকা, অক্টোবর, ২০০৯।

সাফী, লুই এম, "*ইসলাম, যুদ্ধ ও শান্তি*, আজিজ, মুহাম্মদ আবদুল সম্পাদিত, সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট ঢাকা, আগষ্ট, ২০০০

বারলাস, আসমা "*জিহাদ, ধর্মযুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদ অপব্যাখ্যার রাজনীতি*, "আজিজ মুহাম্মদ আবদুল, সম্পাদিত সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম' প্রাগুক্ত।

কুতুব, মুহাম্মদ, '*ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম*' আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, আগষ্ট, ২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

ওক্কাহ, আবদুল হালীম আবু রচিত, '*রসূলের স. এর যুগে নারী স্বাধীনতা*, তালিব, আবদুল মান্নান সম্পাদিত, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ঢাকা, নভেম্বর, ২০০২।

'আতি, হামমুদাহ আবদাল রচিত, রহমান, মুহাম্মদ হাবীবুর অনূদিত ও সম্পাদিত '*ইসলাম একমাত্র জীবন বিধান*' খায়রুন প্রকাশনী, আগস্ট, ১৯৯৪।

মুগনী, ড. আবদুর রচিত, সরকার, নুরুল ইসলাম অনূদিত '*ইসলাম ও সন্ত্রাস*', আজিজ মুহাম্মদ আবদুল সম্পাদিত '*সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত।

আহমেদ খুরশীদ "*ইসলামী ব্যবস্থার উন্নয়ন কৌশল ভাবনা*" আহমদ, ড. মাহমুদ সম্পাদিত '*ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা সামাজিক প্রেক্ষাপট*, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ঢাকা, জুন, ২০০৩।

নকভী, সাইয়েদ নওয়াব হায়দার, '*অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী পদ্ধতি*' আহমদ, ড. মাহমুদ সম্পাদিত ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা সামাজিক প্রেক্ষাপট, প্রাগুক্ত।

চৌধুরী, মুহম্মদ আবদুল মান্নান ও চৌধুরী, তৌহিদুল করিম "*উচ্চতর উন্নয়ন অর্থনীতি ও পরিকল্পনা*," চট্টগ্রাম, নভেম্বর, ১৯৮৩।

চাপরা, এম. উমর, '*ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*' অনূদিত আহমদ, ড. মাহমুদ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ঢাকা, ২০০০।

ইয়াসীন, শাহজাহান শাকারচি, '*ইসলামী সমাজে নারী, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত অধিকার*, আহমদ, ড. মাহমুদ 'ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা সামাজিক প্রেক্ষাপট, প্রাগুক্ত।

মওদুদী, এ. '*ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ*' আধুনিক প্রকশানী, ঢাকা, ২০০৩

মওদুদী, এ, '*পুঁজিবাদ বনাম ইসলাম*' প্রাগুক্ত।

কায়সী, মারওয়ান ইব্রাহীম, *মোরালস এ্যান্ড মেনারস ইন ইসলাম: গাইড টু ইসলামিক আদম*। লেস্টার ইউকে: দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬।

নূরুযযামান, মুহাম্মদ '*ইতিহাসের কষ্টিপাথরে ইসলাম রাজনীতি*' ঢাকা, ফেব্রুয়ারী-২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

মজুমদার ড. রমেশ চন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস প্রাচীন ও মধ্যযুগ*, ১ম ও ২য় খণ্ড।

রহীম এম. এ. '*বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, *আকরম খাঁ মোহাম্মদ মোসলেম বঙ্গের ইতিহাস*।

ইউনুস, মোহাম্মদ, '*দি পুওরস এজ দি ইঞ্জিন অব ডেভেলপমেন্ট* দি ওয়াশিংটন কোয়াটারলী, হেমন্ত ১৯৮৭,

ইকনোমিক ইমপ্যাকট, ২ (১৯৮৮)

সুমেকার, *স্মল ইজ বিউটিফুল*, লন্ডন : ব্লাভ এন্ড ব্রিগচ, ১৯৭৩।

রিপোর্ট অবদি সিলেক্ট কমিটি অন হাংগার (১৯৮৬)

চাপড়া, এম. ইউ, টুয়ার্ডস এ জাসট মনিটারী সিস্টেম, প্রাগুক্ত।

মিরডাল, গুনার '*এশিয়ান ড্রামা* (নিউ ইয়র্ক : দি টুয়াল্টিথ সেঞ্চুরি ফান্ড, ১৯৬৮) খন্ড-২

সোলায়মান, আবদুল হামিদ, *Islamization of Knowlege with special Reference to political science*, American Journal of Islamic Social Sicncc, ভলিউম-২, সংখ্যা-২, ১৯৮৫।

জার্ণাল, সাময়িকী ও দৈনিক পত্রিকা

❖ জার্ণাল

El Sheikh, Sirat-al Mustaqim and Hikma: A Quranic view of socioeconomic Behaviour, Economic Discourse and Method. Journal Islam and the Modern Age, Volume xxxv No.1 February, 2004

Khan, M.A. Muqtedar, 'Islamic Democracy and Moderate Muslims : The straight path Runs through the Middle. American Journal of Islamic Social Science Volume 22, Winter 2005, Number 3

Dhaka University Institutional Repository

❖ পত্রিকা

বানু, ড. ইউ. এ. বি. রাজিয়া আকতার, *মহিলারা দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম* ভোরের কাগজ, ২৫ নভেম্বর, ১৯৯৪।

চমস্কি, নোয়াম, বিশ্বায়ন ও উন্নয়নশীল দেশ, দৈনিক ইত্তেফাক, ২০০৬।

আন্তর্জাতিক সংবাদ, ইউরোর বর্তমান অবস্থা, দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ মে ২০১০।

বানু, ড. ইউ. এ. বি. রাজিয়া আকতার, '*নারীর অধিকার বাস্তবায়নে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা*' দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ মে, ১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

Hashim, Rosnani, Islamization of Curriculum' ibid., Volume 10, Summer 1999, Number 2

Hofman, Murad wilfried, 'Governing under islamic political system' ibid., Vollume 18, Summes Zool Number 3

Bhuiyan, Md. Shafiul Alam, "The Fundamental Principles of Islamic Political System: A Brief Overview," Bangladesh Journal of Islamic Thought, Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT) Vollume 5, Number 6, January-June 2009.

Bartkus, James R. & Hassan, M. Kabir 'Ibn Khaldun and Adam smith: Parallels in Contributions to Modern Economic Thought.

বানু, ইউ. এ. বি. রাজিয়া, আকতার 'সংবিধান ও ধর্মে বাংলাদেশে মুসলিম নারীর অধিকার ও মর্যাদা একটি পর্যালোচনা' বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, দ্বাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৪।

বেবেল, আগষ্ট, নারী : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, কলকাতা, গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯০।

চৌধুরী এজাজুল হক, "স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন" উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপ স্টুওয়ার্ডস ডেভেলাপমেন্ট, চতুর্থ বর্ষ, চতুর্দশ সংখ্য ১৯৯৮।

ভাসিন কমলা, 'প্রচলিত উন্নয়ন বনাম টেকসই উন্নয়ন' উন্নয়ন পদক্ষেপ স্টেপ স্টুওয়ার্ডস, চতুর্থ বর্ষ, চতুর্দশ সংখ্যা, ১৯৯৮।

❖ সাময়িকী

ইসলাম, মুহাম্মদ নূরুল, 'একটি মুসলিম দেশের কাংখিত উন্নয়ন কৌশল' মাসিক পৃথিবী, অক্টোবর, ২০০৮

সেমিনার পেপার, ইসলাম, মুহাম্মদ নূরুল, 'পুঁজিবাদী শোষণের নানা কৌশল, প্রাগুক্ত, ফেব্রুয়ারী, ২০০৮।

রহমান, শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর 'যাকাত : মূলনীতি ও বর্তমান প্রেক্ষাপট' প্রাগুক্ত, সেপ্টেম্বর, ২০০৮।